ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইসলামী ফিক্‌হের পটভূমি ও বিন্যাস

মুহাম্মদ তাকী আমীনী

আবদুল মান্নান তালিব অনূদিত

Disclaimer
This Copy is Prepared for
Research Purpose Only

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইসলামী ফিক্‌হের পটভূমি ও বিন্যাস
মূল ঃ মুহাম্মদ তাকী আমীনী
আবদুল মান্নান তালিব অনূদিত

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ২৪৮
ইফাবা প্রকাশনা ঃ ২১৬৭
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ৩৪০.৫৯
ISBN : 984-06-0816-9

প্রকাশকাল
মহররম ঃ ১৪২৫
ফাল্গুন ঃ ১৪১০
ফেব্রুযারি ঃ ২০০৪

প্রকাশক
শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকল্পন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৯১৩৩৩৯৪

কম্পিউটার কম্পোজ
নিউ হাইটেক কম্পিউটার
জি, পি, ক-৩৮, মহাখালী, ঢাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মেসার্স তাওয়াক্কাল প্রেস
৮৭/১, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০

মূল্য ঃ ৬০.০০ (ষাট) টাকা মাত্র।

Islami Fikher Potobhumi-o-Binnas : Written by Muhammad Taki Amini in Urdu and translated into Bangla by Abdul Mannan Talib and published by Director, Translation and Compilation Deptt., Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. February 2004

Web Site : www.islamicfoundation-bd.org
E-mail : info@islamicfoundation-bd.org

Price : Tk 60.00; US Dollar 2.40

মহাপরিচালকের কথা

ইসলামী বিধি-বিধানের বিভিন্ন দিক ও প্রকারভেদ এর আলোচনা নিয়ে যে বিষয় বা শাস্ত্র গড়ে উঠেছে তা হচ্ছে ফিকাহ্। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে এসে এ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ শুরু হয়। ফিকাহ্র আলোচ্য সূচী হচ্ছে–

১. কুরআনের বিধানাবলী,

২. হাদীসের বিধানাবলী,

৩. ইজমা এবং কিয়াস।

কুরআন এবং হাদীসের বিষয় ইজমা এবং কিয়াস অপেক্ষা অধিকতর স্পষ্ট। এ জন্য এখানে মতপার্থক্য করার অবকাশ কিছুটা কম। ইজমা ও কিয়াসে ভিন্নমত প্রকাশ করার সুযোগ আছে। এ জন্য এ নিয়ে আলোচনার একটি নীতিমালা প্রয়োজন হয়। এভাবে কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস থেকে বিধানাবলী বাছাই করার জন্য যে নিয়মনীতি তৈরী করা হয়েছে–তাই হচ্ছে উসূলে ফিকাহ্।

বাংলা ভাষায় উসূলে ফিকাহ্র উপর মৌলিকভাবে কোন বই রচিত হয়নি। মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্য কিছু পাঠ্য বই থাকলেও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণে উসূলে ফিকাহ্র কোন বই বাংলায় অনূদিত হয়নি।

ইসলামের বিধান যেহেতু সব যুগ ও সব ভূ-খণ্ডে প্রযোজ্য, এ জন্য সময় ও প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বিধি-বিধানের সংস্কার প্রয়োজন হতে পারে। এ ক্ষেত্রে উসূলে ফিকাহ্ জানা একটি জরুরী বিষয়। বিশেষ করে বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের প্রেক্ষাপটে ইসলামী বিধানের কিছু কিছু ক্ষেত্রে গবেষণা বা কিয়াসের প্রয়োজন রয়েছে। এ ক্ষেত্রে ইজমা ও কিয়াসের নীতিমালা জানার জন্য এ ধরনের বই প্রয়োজন।

মূল বইটি উর্দূতে রচনা করেছেন ভারতের আজমীরের বিখ্যাত আলিম মাওলানা মুহাম্মদ তাকী আমিনী। অনুবাদ করেছেন প্রখ্যাত

আলিম সাহিত্যিক জনাব আবদুল মান্নান তালিব, সম্পাদনা করেছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ পণ্ডিত অধ্যাপক আহমদ হোসাইন। এ বইটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করি। লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক সকলকেই আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

আল্লাহ্ তা'আলা যুগের চাহিদা পূরণে ইসলামী বিধানাবলীকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করার তাওফীক দিন। আমীন!

এ. জেড, এম. শামসুল আলম

পরিচালক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

ইসলামী শরীআতে কুরআন ও হাদীসের পরেই ফিকাহ্‌র স্থান। কুরআন ও হাদীসের বিধানাবলীর আলোকে রচিত 'ফিকাহ্ শাস্ত্র' ইসলামের মৌলিক নিয়ম-নীতির সাথে সম্পৃক্ত। কালের পরিক্রমায় আধুনিক বিশ্বে যুগ জিজ্ঞাসার প্রয়োগিক সমস্যা সমাধানে ফিকাহ্ শাস্ত্রের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ 'ফিকাহ্ শাস্ত্রের পটভূমি ও বিন্যাস' শীর্ষক গ্রন্থটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

আল্লামা তাকী আমিনী রচিত মূল উর্দূ বইটি বাংলা ভাষায় তরজমা করেছেন জনাব আবদুল মান্নান তালিব এবং সম্পাদনা করেছেন অধ্যাপক আহমদ হোসাইন। প্রুফ দেখার মত কষ্টসাধ্য কাজ করেছেন মাওলানা গোলাম সোবহান সিদ্দিকী। প্রথম প্রকাশহেতু যথেষ্ঠ সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও মুদ্রণজনিত ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। বিজ্ঞ পাঠকের দৃষ্টিতে এ ধরনের কোন কিছু নযরে পড়লে আমাদেরকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ রইল; যাতে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধিত করা সম্ভব হয়।

শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

অনুবাদকের কথা

ইসলামী শরী'আতের চৌহদ্দীর মধ্যে ইসলামী ফিক্‌হ ও উসূলে ফিক্‌হের উৎপত্তি ও বিকাশ ইসলামের সত্যতারই একটি প্রমাণ পেশ করে। ইহুদী রাব্বীগণ তাওরাতের বিধানগুলোর অনর্থক যেসব চুলচেরা বিশ্লেষণ করে তাওরাতকে বাস্তবে অকার্যকর করার তৎপরতা চালিয়েছিলেন, কুরআন মজীদ যার নিন্দায় মুখর, মূলত ইসলামী ফিক্‌হ ও উসূলে ফিক্‌হের বিকাশের পেছনে তেমন কোন তৎপরতা দৃষ্ট হয় না। বরং বিপরীতপক্ষে বলা যায়, কুরআন ও সুন্নাহর বিধানসমূহ বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যই এর পেছনে সর্বক্ষণ সক্রিয় রয়েছে। তাছাড়া যে বিধান প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে দুনিয়ার সব এলাকার বহু মানুষের একমাত্র সত্য ও সঠিক জীবন বিধান হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে, তাকে অতীত শতাব্দীগুলোতে যেমন, তেমনি অবশ্যি সব যুগে মানুষের সব ধরনের সমস্যার সমাধান পেশ করার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে।

ফিক্‌হ ও উসূলে ফিক্‌হের বিকাশ কুরআন ও সুন্নাহর সম্প্রসারণের আর এক নাম। এ বিকাশই চৌদ্দশো বছর পরেও কুরআন ও সুন্নাহর বিধানকে মানব জীবনে প্রয়োগের ধারা অব্যাহত রেখেছে। বিগত কয়েকশো বছর থেকে ফিক্‌হে ইসলামীর মৌলিক ইজতিহাদের ধারা বিশুষ্ক রয়ে গেছে। বিশেষ করে গত দু-তিনশো বছরে এই ধারার উপধারাগুলিও শুকিয়ে মরা ও মজা নদীর রূপ নিয়েছে। কিন্তু এই মরা ও মজা নদীতে আজ জোয়ারের প্রয়োজন। বিশ্বব্যাপী ইসলামী পুনর্জাগরণ এবং দেশে দেশে ইসলামকে একটি সচল ও গতিশীল জীবন বিধান হিসাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য মুসলিমগণ আজ সক্রিয়। কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে আসার আগ্রহ তাদের মধ্যে দিনের পর দিন প্রবলতর হচ্ছে। ইসলামী জীবন বিধানের অনুশীলন ক্ষেত্রে কয়েক শতাব্দী যাবৎ অনুসৃত কার্যক্রম সম্পর্কে মিল্লাতে ইসলামীর সদস্যদের উপলব্ধি থাকা প্রয়োজন। অতীতের এই কার্যক্রমই মিল্লাতের বর্তমান মূলধন।

অতীতে ইসলামী ফিক্‌হের বিকাশ ধারা বিশেষ করে এই বহমান ধারা প্রসূত বিপুল ও বিচিত্র উপাদান-উপকরণের সাথে বাংলাভাষী পাঠক সমাজের বলতে গেলে এ পর্যন্ত পরিচয়ই ঘটেনি। অথচ এদের সংখ্যা বিশ্ব মুসলিম জনগোষ্ঠির এক দশমাংশের কম নয়। একদিকে এই অনবহিতি, অপর দিকে অনৈসলামী জীবন ধারার সয়লাব এই বিপুল জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠার কথা আতঙ্কের সৃষ্টি করে। কাজেই বাংলাদেশে ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করতে হলে বাংলাভাষী পাঠকের সামনে অবশ্যি ইসলামী ফিক্‌হের অতীত ইতিহাস ও তার

বিস্তারিত রূপ তুলে ধরতে হবে। এ বইটি এ ব্যাপারে একটি মাইলফলকের কাজ করবে বলে মনে করি। আশা করি এ বইটি পড়ার পর একজন অনুসন্ধিৎসু পাঠক অনুভব করতে পারবেন যে, কুরআন ও সুন্নাহ ইসলামী শরীয়াতের এমন দু'টি প্রস্রবণ, যার বারিধারা কোনদিন শেষ হবে না, ব্যাহতও হবে না। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি যদি (কুরআন ও সুন্নাহর উৎস থেকে) সঠিক পথনির্দেশনা লাভ করতে পারে, তাহলে জীবন ক্ষেত্রে এমন কোন সমস্যার উদ্ভব হবে না, যার সমাধান করে সে জীবনে শান্তি, শৃংখলা ও ইনসাফকে সুনিশ্চিত করতে পারবে না।

মূল লেখক মাওলানা মুহাম্মদ তাকী আমিনী আজমীরের মঈনীয়া দারুল উলূম মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল। তিনি উপমহাদেশের একজন প্রখ্যাত কৃতি আলিম ও গবেষক। ইতিপূর্বে ফিক্‌হ, উসূলে ফিক্‌হ, ইসলামের ভূমি ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর বেশ কিছু অত্যন্ত উঁচু মানে গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থটি ফিক্‌হ ও উসূলে ফিক্‌হ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা প্রমাণ করে। গ্রন্থটি রচনায় তিনি ইসলামী দুনিয়ায় বিগত সাত-আটশো বছরের মধ্যে প্রকাশিত এ বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রেষ্ঠ রচনা ও গ্রন্থরাজির সাহায্য নিয়েছেন। অনুবাদের ভাষা যতদূর সম্ভব সহজ রাখার চেষ্টা করেছি। পারিভাষিক শব্দগুলো যতদূর সম্ভব সহজ বাংলায় রূপান্তরিত করার চেষ্টা করেছি এবং দৃষ্টি রেখিছে যাতে এ রূপন্তর অস্বাভাবিক, দৃষ্টিকটু ও শ্রুতিকটু না ঠেকে। পারিভাষিক শব্দগুলোর আরবী রূপও পাশাপাশি লিপিবদ্ধ করেছি। ইসলামী ফিক্‌হ সম্যক আত্মস্থ করতে চাইলে তার পরিভাষা আয়ত্ব করা ছাড়া উপায় নেই, কারণ এগুলো ইসলামী বিধানে ব্যাখ্যা-বিন্যাসের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যদিও পারিভাষিক শব্দগুলোর অনূদিত রূপ অনেক ক্ষেত্রে সঠিক তাৎপর্য প্রকাশে সক্ষম হয় না, তবে পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার পুস্তকের কলেবর সংযত রাখতে সাহায্য করে।

বাংলায় উসূলে ফিক্‌হের বই হয়ত এটিই প্রথম। বাংলা ভাষার অঙ্গনে ইসলামী জ্ঞানের এই শাখার অনুশীলন খুব বেশি হয়নি বলে ভাষার দিকে থেকে যে সীমাবদ্ধতা অনুভূত হয়েছিল, তা কাটিয়ে ওঠা যথেষ্ট আয়াসসাধ্য ব্যাপার। বিদগ্ধ পাঠক সমাজ এদিকটি অবশ্যি বিবেচনায় রাখবেন বলে মনে করি।

মূল উর্দু কিতাবে কোন কোন ক্ষেত্রে আলোচনা খুব গভীরে প্রবেশ করেছে, যা বাংলাভাষী পাঠক সাধারণের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে পারে; অথচ ফিকহে ইসলামীর রূপরেখা ও বিবর্তনের ধারা জানার জন্য তা অপরিহার্য নয়। এরূপ ক্ষেত্রে কিছু কিছু তাত্ত্বিক আলোচনা অনুবাদে বাদ দেয়া হয়েছে। পুনরুক্তির ক্ষেত্রেও ঐ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে এবং কোন কোন অধ্যায়ের উপস্থাপনার ধরন পাল্টাতে হয়েছে। তবে বিষয়বস্তুর বিন্যাস অপরিবর্তিত রয়েছে। আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু যেন এই প্রচেষ্টা কবূল করেন। আমীন!

আবদুল মান্নান তালিব

ভূমিকা

প্রত্যেকটি কাজের একটি অনুকূল পরিবেশ থাকা চাই এবং প্রত্যেকটি পরিকল্পনার জন্য একটি উপযোগী সময় হতে হবে। প্রতিকূল পরিবেশে কোন কাজ এবং অসময়ে কোন পরিকল্পনা সুফলদায়ক হয় না। বরং উল্টো প্রতিক্রিয়ার আশংকা থাকে। অনুরূপভাবে ফিকহের নূতন সংস্করণ বা সংকলনের বিষয়টিও স্থান ও পরিবেশের নাজুকতার সাথে সম্পর্কিত। যতদিন এই নাজুকতাকে সামনে রেখে এর চৌহদ্দি ও রূপরেখা নির্ধারণ করা হবে না ততদিন আশানুরূপ সফলতা লাভ সম্ভব নয়। তাই কাজ শুরু করার পূর্বে পরিবেশের আনুকূল্য যাচাই করতে হবে, মুসলিম সমাজের ধারণক্ষমতা ও বরদাশত করার শক্তির পরিমাপ করতে হবে এবং যে পর্যায়ের আনুকূল্য ও যে পরিমাণ বরদাশত ক্ষমতার সন্ধান পাওয়া যাবে সেই পর্যায়ে এবং পরিমাণে কাজ করার জন্য এগিয়ে যেতে হবে।

তাছাড়া আইনের একটা বিশেষ প্রকৃতি (مزاج= মিযাজ) থাকে ও বিশেষ ধরনের এক প্রাণশক্তি (روح= রূহ) তার শিরা-উপশিরায় সঞ্চারমান থাকে। এই রূহ এবং মিযাজ-এর প্রতি দৃষ্টি না রাখলে আইনের মাধ্যমে কোন সমাজের হিফাযত করা যেতে পারে না এবং যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সামনে রেখে আইন রচনা করা হয় তাও অর্জিত হওয়া সম্ভবপর হয় না।

ধর্মীয় আইনের ব্যাপারে রূহ এবং মিযাজের বিবেচনা অধিকতর নাজুকতা সৃষ্টি করে। কারণ আইনের প্রয়োগ ও পরিণামের সম্পর্ক থাকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রূহ এবং মিযাজের সাথে। এ ব্যাপারে গাফলতি বা শিথিলতা প্রদর্শন করলে আইন 'প্রভাবশালী' হবার পরিবর্তে 'প্রভাবিত' হয়ে পড়ে অর্থাৎ আইন কার্যকরী হয় না বরং পরিবেশ তাকে দুমড়ে দেয় এবং ক্রমে ক্রমে আইন নিজের আকর্ষণ ক্ষমতা (জনগণের শ্রদ্ধা) হারিয়ে সামাজিক অস্থিরতা এবং মানবিক দুর্বলতার সাথে সমঝোতা করে নেয়। ফলে তখন তা কাগুজে আইনের কাঠামোতে পর্যবসিত হয় এবং তার কল্যাণপ্রসূ ভূমিকা প্রায় খতম হয়ে যায়।

এই পর্যায়ে এসে ধর্ম নিজেই নিজের দুশমনে পরিণত হয়। অর্থাৎ সত্যিকার ধর্ম নিজের প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্বের জন্য 'প্রথাগত ধর্মের' সাথে সংঘাতে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়। কারণ এই সংঘাত ছাড়া ধর্ম জনগণের শ্রদ্ধা অর্জনের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে এবং সমাজেও তা নিজ কল্যাণকর রূপ অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয় না।

আইনের শিক্ষা এবং তাকে চালু রাখার বিষয়টিও বড়ই গুরুত্বের দাবিদার। যতক্ষণ আইন শিক্ষা ও তার শিক্ষা পদ্ধতিতে মৌলিক পরিবর্তন সাধন করা না হবে, তাকে চলমান রাখার ব্যাপারে বিচার না করা হবে, এবং আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার সাহায্যে তাকে গ্রহণ না করা হবে ততক্ষ আইনের প্রকৃষ্টতা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী আইন প্রণয়নে কোন বিশেষ ফলোদয় হবে না। যদি এসব ব্যাপারে যথাযথ ও যুক্তিযুক্ত ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে আইন খেলনায় পরিণত হয়ে যাবে।

নিচে এমন কিছু বিষয়ের উল্লেখ করা হচ্ছে যার সাহায্যে সামাজিক অবস্থা এবং জনগণের ধারণ ও বরদাশত করার যোগ্যতা পরিমাপ করা সহজ হবে। তাছাড়া বর্তমান অবস্থায় কোন্ পয়ায়ের আইন 'সংকলন' গ্রহণযোগ্য হতে পারে এবং তার নক্শা কি হওয়া উচিত, তাও সুস্পষ্ট হয়ে যাবে।

মুসলিম সমাজের তিনটি শ্রেণী

মুসলিম সমাজ তিনিটি শ্রেণীতে বিভক্ত। এদের প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে রয়েছে মৌলিক পার্থক্য।

১. একটি শ্রেণীর দৃষ্টিতে না বর্তমান দুনিয়ার অবস্থা ও সমস্যাবলী আছে, আর না আছে ইসলামী আইনের প্রকৃষ্টতা ও বিবর্তনশীল রূপরেখা। তারা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামকে কায়েম করার কথা চিন্তা করতে পারে না এবং তার প্রয়োজনও অনুভব করে না। একটি সীমাবদ্ধ পরিসরে কতিপয় খুঁটিনাটি ও ছোটখাট ব্যাপার তাদের সামনে রয়েছে এবং সেই সীমিত পর্যায়েই তারা পূর্ণাঙ্গ ইসলামের প্রবক্তা হওয়ার দাবিদার। কিন্তু জনগণের বেশির ভাগ তাদের ধর্মীয় ব্যাপারে এই শ্রেণীটির দ্বারস্থ হয়। তাই এদেরকে উপেক্ষার দৃষ্টিতেও দেখা যেতে পারে না।

২. দ্বিতীয় শ্রেণীটির জ্ঞান অত্যন্ত অগভীর এবং অল্প পরিসর। এরা নিজেদের 'আমানত প্রকোষ্ঠের' খাঁটি মণিমুক্তার বিনিময়ে বিজাতীয়দের কাছ থেকে 'পাথরকুচি' ও 'উপল খণ্ড' কিনে নিয়েছে। নিজেদের অগভীর ও সীমিত পরিসর জ্ঞানের কারণে ঐগুলিকেই আসল মণিমুক্তা মনে করে বসেছে। ফলে এ শ্রেণীটি নিজেদের মহান গৌরবোজ্জ্বল অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইসলামের একটি 'নতুন সংস্করণ' তৈরী করতে চাচ্ছে, যার প্রায় প্রত্যেকটি জিনিস বাইর থেকে আমদানী করা হয়েছে।

যেহেতু প্রাচীনতার মূল্য ও মর্যাদা তার অন্তর থেকে অন্তর্হিত হয়েছে এবং যেহেতু অতীতের প্রদেয় মহান গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য যার ওপর জাতীয় জীবনের ভিত্ গড়ে ওঠে, তার দৃষ্টিতে তা জরাজীর্ণ ও অনুন্নত সভ্যতা-সংস্কৃতির স্মৃতিচিহ্নে পরিণত হয়েছে, তাই এই শ্রেণীটি ধর্মীয় ও আইনগত বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর তুলনায় অনেক বেশি ভয়ংকর।

কিন্তু আধুনিক বিশ্বের 'টেকনিক'-এর সাথে এই শ্রেণীটি বেশি পরিচিত, অবস্থার পরিবর্তনের সাথে এরা নিজেদের পরিবর্তিত করার কায়দাও ভাল করেই জানে, তাই আশা করা যায়, যে জিনিসটি একবার চালু হয়ে যাবে এরা নিজেদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ও স্বার্থে তাকেই হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে থাকবে।

৩. মাঝামাঝিতে অবস্থানকারী শ্রেণীটি প্রাচীনের ভক্ত। তারা প্রাচীনকে প্রাণের চেয়েও প্রিয় মনে করে। তবে অবস্থা ও চাহিদার আলোকে তারা পুরাতন জিনিসগুলিকে নতুনভাবে বিন্যস্ত ও নতুন সাজে সজ্জিত করতে চায়। তারা নতুন পদ্ধতি ও নতুন প্রকাশ ভঙ্গিমার দাবি করে। এভাবে তারা পুরাতন মদিরাকে প্রয়োজন মত নতুন বোতলে দেখতে চায়, যাতে তার উপকার ধারা অব্যাহত থাকে, উপরন্তু যাতে অতীত ও বর্তমানের সম্পর্ক ছিন্ন না হয় এবং জাতি তার গৌরবোজ্জ্বল অতীতের ভিত্তির ওপর বর্তমান ও ভবিষ্যতের ইমারত রচনা করতে সক্ষম হয়। আসলে এই শ্রেণীটিই মুসলিম সমাজের জাগরণের পতাকাবাহী। এ দলটি যতই ভারী হবে এবং জ্ঞান ও কর্মের ময়দানে যতই এদের উন্নতি পরিলক্ষিত হতে থাকবে জাতি ততই উন্নত বলে বিবেচিত হতে থাকবে।

ফিকহের নূতন সংস্করণের দাবি

আইনের স্থায়িত্ব ও সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য মনস্তাত্ত্বিক ও প্রকৃতিগত দিক দিয়ে দু'টি জিনিস একান্ত অপরিহার্য। সে দু'টি হচ্ছে ঃ শ্রদ্ধা ও পবিত্রতার অনুভূতি। শ্রদ্ধার মাধ্যমে মানব মনে আইনের মর্যাদা ও সম্মান প্রতিষ্ঠিত থাকে। আর পবিত্রানুভূতির মাধ্যমে আইনের প্রতি বিশেষ ধরনের হৃদয়গ্রাহিতা ও আকর্ষণ অনুভূত হয়। কোন আইন ও বিধি-ব্যবস্থা থেকে যদি এ দু'টি জিনিস বের হয়ে যায় তাহলে তা মানব জীবনে নিজের স্থান করে নিতে ব্যর্থ হয় এবং তার আসল ভূমিকার প্রকাশও সম্ভব হয় না।

ধর্মীয় আইনের ভিত্তিই শ্রদ্ধা ও পবিত্রতা বোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আইনের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মানুষের ধর্মীয় জীবন আইনের দ্বারা যে পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছে, নির্ভেজাল পার্থিব আইনের দ্বারা তার দশ ভাগের এক ভাগও হয়নি। এর প্রধানতম কারণ হচ্ছে, ধর্ম শ্রদ্ধা ও পবিত্রতা বোধের সংরক্ষণ করে। এজন্য এ দু'টির ওপর আঘাত হানার অথবা আইন পরিবর্তনের মানসিকতা ব্যাপকতা লাভ করার আশংকা থাকলে ফিকহের আধুনিক সংস্করণ রচনার কোন আওয়াজই গ্রহণযোগ্য হবে না। অন্যপক্ষে যদি কখনও কেউ ফিকহের আধুনিক সংস্করণ প্রণয়নে ব্রতী হয় তাহলে তাকে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

আধুনিক সংস্করণ ব্যাপারে সতর্কতার উপায় স্বরূপ আইনকে নিম্নোক্ত দু'ভাগে ভাগ করতে হবে ঃ

এক, যে অংশের সম্পর্ক রয়েছে আকীদার (বিশ্বাসমূলক ব্যাপার) ইবাদত নৈতিক চরিত্র ইত্যাদির সাথে।

দুই, যে অংশের সম্পর্ক রয়েছে সামাজিকতা, রাজনীতি ইত্যাদির সাথে ।

প্রথম অংশের মধ্যে কোন ধরনের পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। কেবলমাত্র আধুনিক বিন্যাস ও কোন কোন অধ্যায়কে অগ্রে এবং কোন অধ্যায়কে পশ্চাতে স্থান দানের মাধ্যমে এ কাজ হতে পারে।

দ্বিতীয় অংশে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করে নকশা তৈরী করা প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রেও যে সমস্ত বিধি-বিধান কুরআন ও সুন্নার স্পষ্ট দলীলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত তাদেরকে অক্ষুণ্ন রাখতে হবে।

কালরূপী মুফতী যেসব বিষয়কে অকার্যকর বলে ফতওয়া দিয়েছে, যথা ক্রীতদাস সংক্রান্ত বিধানাবলী, সেগুলোকে আলোচনা থেকে বের করে দেয়া হবে। পরিবর্তন হতে পারে ইজতিহাদমূলক বিধি-বিধানগুলোতে। সংস্করেণের অন্তর্ভুক্ত হবে ইসলামের পরবর্তী যুগসমূহে যে সকল ইজমা হয়েছে সেগুলো।

যদিও কোন কোন মহলে ইসলামী আইনের নবতর সংস্করণ প্রণয়নের আওয়াজ উঠেছে তবুও এ কথা স্বীকার্য যে, বিভিন্ন মাযহারেব ইমামগণের মতানৈক্যকে সামনে রেখে একটি নতুন ফিকহ তৈরী করা এবং সমগ্র ইসলামী বিশ্বকে তা কার্যকর করার জন্য আহ্বান জানানোর সময় এখনো আসেনি। পকিস্তানে মুসলিম পারিবারিক আইন (Family Law) প্রবর্তনের বিরুদ্ধে যে ঝড় উঠেছিল, তা এ কথার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আইনের আধুনিক সংস্করণ প্রণয়নে ইজমা

ফিকহের আধুনিক সংস্করণ প্রণয়নের ব্যাপারে ইজমাকে সক্রিয় করতে হবে। ইসলামী আইনের এ উৎসটি যেমন অতি গুরুত্বপূর্ণ, বিভিন্ন অবস্থার কারণে তার প্রতি তেমনি অনাগ্রহও দেখানো হয়েছে। ব্যক্তি শাসনের যুগে একে উৎসাহিত করা হয়নি। এই কারণে যে, ব্যক্তিতান্ত্রিক সরকারগুলি সাধারণত ইজমা ভিত্তিক কোন 'প্রতিষ্ঠান' বরদাশত করতে প্রস্তুত হয় না। কারণ এই ধরনের কোন একদিকে যেমন অবস্থা ও সমস্যাবলী সম্পর্কে স্বাধীন চিন্তা-ভাবনা এবং স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ ও ফায়সালা দানের দায়িত্ব বহন করবে, অন্যদিকে তেমনি এই প্রতিষ্ঠানের সদস্যবৃন্দের প্রতি জনগণের মধ্যে আকর্ষণ সৃষ্টির সুযোগ পাবে।

তাই ব্যক্তিকেন্দ্রিক শাসনামলে রাজনৈতিক কারণে ইসলামের ইতিহাসে 'ইজমা'র মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি কর্মক্ষেত্রে অবতরণের সুযোগ পায় নি। পরবর্তীকালে এই ধারণাটি ব্যাপকতা লাভ করে যে, ইজমা'র জন্য যেহেতু সমগ্র উম্মতের একমত হওয়া জরুরী এবং এইরূপ ঐকমত্য প্রায় অসম্ভব, তাই ইজমা' অনুষ্ঠিত হওয়াও সম্ভবপর নয়। অথচ বেশির ভাগ ইজমা' অনুষ্ঠিত হয়েছে উম্মতের সিদ্ধান্ত গ্রহণের এবং ফায়সালা দানের যোগ্যতাসম্পন্ন মুজতাহিদ (اهل الحل والعقد) ব্যক্তিবর্গ, তথা বিভিন্ন দেশের মুফতীগণের ঐকমত্যের ভিত্তিতে। এ ব্যাপারে ফারূক-ই-আযম হযরত উমর (রা) থেকে যে সিদ্ধান্ত পাওয়া গেছে তা এই যে, ইজমা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উম্মতের নেতৃস্থানীয় মুফতীদের ঐকমত্য। এ ব্যাপারে অপর একটি মত হচ্ছে, ইজমা অনুষ্ঠিত হবার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিপুল সংখ্যকের ঐকমত্য এবং বাকি লোকদের নীরবতা জরুরী।

ইজমার কার্যকর ব্যবস্থা

ইজমার জন্য মুজতাহিদগণের একটি মজলিস গঠনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য, যা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক হতে পারে এবং উভয় অবস্থায় বে-সরকারি হওয়াই উত্তম যাতে মুজতাহিদগণ স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে পারেন। এ মজলিসের সদস্য নির্বাচনও হতে হবে সরকারি প্রভাকমুক্ত এবং স্রেফ ইলমী যোগ্যতার ভিত্তিতে।

ইজতিহাদের আবশ্যকতা

আমাদের বর্তমান সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবন বহু সমস্যা সংকুল এবং সংকটময়। এ পরিস্থিতিতে ইজতিহাদের প্রয়োজনও সমধিক, অথচ এক শ্রেণীর লোকের দৃষ্টিতে ইজতিহাদের দরজাই বন্ধ হয়ে গেছে, এমনকি তার চাবিটিও হারিয়ে গেছে। আনন্দের কথা, পুরাতন ও নতুন উভয় শ্রেণী থেকে এমন একটি শ্রেণীর উদ্ভব হচ্ছে, যাদের জ্ঞান স্পৃহা প্রবল এবং আশা করা যায় তারা ইজতিহাদে ভারসাম্য রক্ষা করে মুসলিম উম্মার পথের দিশারী হতে পারবেন।

অন্যপক্ষে আমাদেন পুরাতন ফকীহগণ ইজতিহাদের মূলনীতি ও নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করে গেছেন এবং সে নীতি-পদ্ধতির আওতায় কাজ করে দেখিয়ে গেছেন। এসবই সুলিখিত ও সুবিন্যস্ত অবস্থায় সংরক্ষিত রয়েছে। এই বিপুল সম্পদ থেকে লাভবান হওয়ার শ্রম স্বীকারে আমরা বিমুখ অথবা অহমিকার বশে আত্ম প্রতারণার জালে আবদ্ধ হয়ে এর গুরুত্ব অনুভব করছি না। এর চাইতে বড় বঞ্চনা ও অদূরদর্শিতা আমাদের জন্য আর কী হতে পারে ?

সমষ্টিগতভাবে এই সম্পদ সম্ভার এত বেশি ব্যাপকতা ও পূর্ণতার অধিকারী যে, এগুলির সাহায্যে বর্তমান অবস্থা ও প্রয়োজনের উপযোগী আইনের চমৎকার ও উত্তম বিধি-বিধান রচিত হতে পারে এবং ইজতিহাদের রুদ্ধ দুয়ার উন্মুক্ত করা যায়।

উক্ত বিপুল সম্পদের রূপরেখা কিঞ্চিৎ বিস্তারিতভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। নিজের স্বল্প জ্ঞান ও সূক্ষ্মদর্শিতার অভাবের ব্যাপারে আমি পুরোপুরি সচেতন। কোথায়, কোন্ দিক দিয়ে কিভাবে পদস্খলন হয়ে গেছে তা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

তবে গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে আমি বিশেষভাবে নজর রেখেছি যাতে নির্ভরযোগ্য সনদ ছাড়া এবং মানসিকভাবে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত না হয়ে কোথাও কোন বিষয় উপস্থাপিত না করা হয়।

এ প্রসঙ্গে এটা আমার একটা ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা মাত্র। প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবার নামই জীবন বলে জানি।

আল্লাহ্ তাঁর একজন অক্ষম বান্দার এই সামান্যতম প্রচেষ্টাটি কবূল করে নিয়ে কওম ও মিল্লাতের জন্য একে সুফলদায়ক করে দেবেন, তাঁর কাছে এটিই আমার দু'আ। আমীন!

মুহাম্মদ তাকী আমীনী

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

ফিক্‌হের স্বরূপ ও তার অর্থের ক্রমসংকোচন ১৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামী ফিক্‌হের বিবর্তনমূলক ক্রমোন্নতি ৩৩

তৃতীয় অধ্যায়

ফিক্‌হের উৎস ৪৯

চতুর্থ অধ্যায়

ফিক্‌হের মূলনীতি এবং ব্যাপক নিয়ম ১৯৫

পঞ্চম অধ্যায়

ফিক্‌হী বিধানের লঘুকরণ ২৩৭

ষষ্ঠ অধ্যায়

ফকীহগণের মতবিরোধের কারণ ২৪৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়

ফিক্‌হের স্বরূপ ও তার অর্থের ক্রমসংকোচন

ফিক্‌হের স্বরূপ

ফিক্‌হ (فِقْه) শব্দের অর্থ হচ্ছে ব্যুৎপত্তিগত বিদারণ (شَقّ) ও উন্মোচন (فَتْح)। 'আল্লামা যামাখ্‌শরী তাই বলেছেন ঃ

الفِقه حَقيقته الشَّق والفَتح [১]

"দলীল, পরিবেশ, তর্ক ইত্যাদির বেড়াজাল বিদীর্ণ করে, তবে শরী'আতের বিধান উন্মোচন করতে হয়।"

ইমাম গাযালী (র) ফিক্‌হের পারিভাষিক অর্থের ইংগিতে বলেছেন, ফিক্‌হ হচ্ছে যথার্থ জ্ঞান, উপলব্ধি, গভীর চিন্তা-ভাবনা ও দীনের ব্যাপারে গভীর ও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি।[২]

বাস্তবে এ দুয়ের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে তত্ত্বানুসন্ধানী 'আলিমগণ 'ফকীহ' শব্দের প্রয়োগ প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

الفقيه العالم الذى يشق الاحكام ويفتش عن حقائقها و يفتح ما استغلق منها ـ [৩]

"ফকীহ হচ্ছেন এমন 'আলিম, যিনি (চিন্তা-ভাবনা ও গভীর গবেষণার মাধ্যমে) আইনের উন্মোচন করেন এবং তার প্রকৃত তাৎপর্য (حَقِيقَة) গুলো অনুসন্ধান করেন এবং অবোধগম্য ও জটিল বিষয়সমূহ সুস্পষ্ট করেন।

ফিক্‌হের এই গভীরতায় পৌঁছার জন্য একদিকে যেমন জ্ঞান ও গবেষণাগত যোগ্যতার প্রয়োজন, তেমনি অন্যদিকে প্রয়োজন হৃদয় ও মস্তিষ্ক তথা চিন্তার

১. হাকীকাতুল ফিক্‌হ, ১ম খণ্ড।
২. ইহ্‌য়া'উ উলূমিদ্দীন, ১ম খণ্ড, ২৪ পৃষ্ঠা।
৩. হাকীকাতুল ফিক্‌হ, ১ম খণ্ড।

পরিচ্ছন্নতা এবং আত্মিক পবিত্রতার। কারণ এগুলো ছাড়া চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কাঙ্ক্ষিত পরিপক্বতা সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। এই সত্যটি উপলব্ধি করেই ইমাম হাসান বসরী (র) ফকীহের মধ্যে নিম্নোক্ত গুণাবলী থাকা অপরিহার্য গণ্য করেছেন। তিনি বলেছেন, ফকীহ হচ্ছেন এমন ব্যক্তি–

১. যিনি দুনিয়ার প্রতি মনোনিবেশ করেন না অর্থাৎ দুনিয়া তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য হয় না।

২. যিনি আখিরাতের ব্যাপারেই অধিক উৎসাহী।

৩. যিনি দীনের ব্যাপারে পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী।

৪. যিনি আল্লাহ্‌র হুকুম সর্বক্ষণ মেনে চলেন এবং পরহেযগারীর পথ অবলম্বন করেন।

৫. যিনি কোন মুসলিমকে বেইজ্জত করা ও তার অধিকার হরণ করা থেকে দূরে থাকেন।

৬. যাঁর দৃষ্টি থাকে সামগ্রিক স্বার্থের প্রতি অর্থাৎ জাতীয় ও সামাজিক স্বার্থকে ব্যক্তি স্বার্থের ওপর প্রাধান্য দেন।

৭. অর্থ-সম্পদের লোভ যাঁর থাকে না।[৪]

ইমাম গাযালী (র)-ও ফকীহের জন্য প্রায় একই ধরনের গুণাবলী অপরিহার্য গণ্য করেছেন। তবে এক্ষেত্রে তাঁর নিম্নোক্ত বাক্যটি অত্যন্ত গুরুত্ববহ ঃ

فقيها فى مصالح الخلق فى الدنيا ـ [৫]

ফকীহ্ হচ্ছেন, পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকুলের কল্যাণ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ।

এ কারণেই আল্লামা ইব্‌ন 'আবেদীন নিম্নোক্ত মত প্রকাশ করেছেন ঃ

ومن لم يكن عالما باهل زمانه فهو جاهل ـ [৬]

"যে ফকীহ্ তাঁর যুগের লোকদের অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ, তিনি আসলে মূর্খ।"

মুহাদ্দিস ও ফকীহের মধ্যে পার্থক্য

হযরত আ'মাশ (র) মুহাদ্দিস ও ফকীহের মধ্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। এ থেকে ফকীহের জ্ঞানের গভীরতা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ক্ষমতার প্রয়োজনিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

৪. ইহ্‌য়াউ উলূমিদ্দীন, ১ম খণ্ড।

৫. ঐ

৬. হাকীকতুল ফিক্‌হ, ১ম খণ্ড।

তিনি বলেন ঃ

يا معشر الفقهاء انتم الاطباء ونحن الصيادلة [৭]

"হে ফকীহগণ! তোমরা হচ্ছো চিকিৎসক আর আমরা ঔষধ প্রস্তুতকারী (Chemist and druggist)।

অর্থাৎ মুহাদ্দিসদের কাজ হচ্ছে ভালো ভালো ঔষধ একত্রিত করে সাজিয়ে রাখা আর ফকীহ্‌দের কাজ হচ্ছে সেখান থেকে ঔষধ বাছাই করা, রোগ নির্ণয় করা এবং রোগ ও রোগীর প্রকৃতি অনুধাবন করে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থাপত্র দেওয়া। সাধারণভাবে যদিও এই পার্থক্যটা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়; কারণ, ইমাম বুখারী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণের একাধারে হাদীস এবং ফিক্‌হ উভয়ের জ্ঞান অস্বীকার করার উপায় নেই, তবুও প্রত্যেক দলের কাজের ধরন ও দায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে এ পার্থক্য বেশ প্রত্যক্ষ করা।

বলা বাহুল্য উল্লিখিত ব্যাখ্যা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ফকীহ্‌ হবার জন্য অনুসন্ধান ও গবেষণার উন্নত মানের যোগ্যতা, জাতীয় তথা জনগণের স্বভাব-প্রকৃতি মেযাজ অনুধাবন ক্ষমতা, মাস্‌লিহাত অর্থাৎ কল্যাণকর ব্যবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকা, রোগ ও রোগীর মনস্তত্ত্ব জানা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় অপরিহার্য।

কুরআনে ফিক্‌হের ভিত্তি

কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতটি হচ্ছে ফিক্‌হের ভিত্তি। এখানে এর অন্তর্নিহিত অর্থটির প্রতিও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে।

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ (التوبة – ١٢٢)

"তবে কেনই বা মু'মিনদের প্রত্যেকটি গ্রুপ থেকে একটি করে দল বের হয়ে (সফরে) আসে না, যাতে তারা দীনের গভীর জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করতে পারে এবং (শিক্ষা লাভের পর) যখন তারা নিজেদের গ্রুপে ফিরে যাবে, তখন (অশিক্ষা ও গাফলতির পরিণাম থেকে) লোকদের সতর্ক করতে পারে, যাতে তারা দুষ্কৃতি থেকে বাঁচতে পারে।"

আয়াতে যে ভাষায় ফিক্‌হের জ্ঞান অর্জনের কথা বলা হয়েছে তাতে মনে হয়, ফিক্‌হের জন্য হৃদয় ও মস্তিষ্কের একটি বিশেষ কাঠামো নির্ধারিত রয়েছে।

একারণে ইমাম গাযালী (র) 'তাফাক্কুহ ফিদ্‌দ্বীন' (تَفَقُّه فِى الدِّين)-এর মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোও অন্তর্ভুক্ত মনে করেছেন ঃ

৭. নাশ্‌রুল উরফ, ১২৯ পৃষ্ঠা, (মা'আরিফ থেকে)।

এক ঃ প্রবৃত্তিজাত বিপদগুলোর সূক্ষ্মতা অনুধাবন,

দুই ঃ 'আমল বিনষ্টকারী ব্যাপারগুলোর অনুধাবন,

তিন ঃ আখিরাতের জ্ঞান লাভ,

চার ঃ পরকালীন নিআমতগুলির প্রতি চরম আকর্ষণ,

পাঁচ ঃ দুনিয়াকে তুচ্ছ মনে করার সাথে সাথে তার ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করার ক্ষমতা,

ছয় ঃ হৃদয়ের মধ্যে আল্লাহ্‌র ভয়ের প্রাধান্য,

নিজ বক্তব্যের স্বপক্ষে প্রমাণ হিসেবে ইমাম সাহেব ইসলামের প্রথম যুগে ফিক্‌হ শব্দের অর্থের ব্যাপকতার বিষয়টি পেশ করেছেন। উপরন্তু উল্লিখিত কথাগুলোকে আয়াতাংশ (تفقه فى الدين) এর অর্থের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেছেন।[৮] উসূলবিদগণের নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা থেকে এর সমর্থন মেলে ঃ

সত্য 'আকীদার প্রতি বিশ্বাস ও মিথ্যা 'আকীদা প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে দীনের গভীর তত্ত্বজ্ঞান অর্জিত হয়। এ ছাড়াও হৃদয় ও অঙ্গ- প্রত্যঙ্গাদির সাথে যেসব কাজের সম্পর্ক রয়েছে, দীনের গভীর জ্ঞান অর্জনের জন্য সেগুলোকে এমনভাবে সম্পাদন করতে হবে, যাতে শারী'আত প্রবর্তকের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জিত হয়।[৯]

উল্লিখিত নীতিগুলো কার্যকর করার মাধ্যমে দীনী মেযাজ গঠিত হয় এবং মন-মস্তিষ্কের পরিশীলন হয়। অতঃপর চিন্তা-গবেষণার ক্ষেত্রে সুষ্ঠু দৃষ্টিভঙ্গি পুষ্ট হয়, যা ফিকহের জন্য অপরিহার্য।

হাদীসে ফিকহের অর্থ

নিম্নোল্লেখ্য হাদীসগুলোও ফিকহের অর্থের গভীরতার সমর্থক ঃ

مَن يرد الله به خَيرا يُفقهه فِى الدين [১০]

"আল্লাহ্‌ যার কল্যাণ করতে চান, তিনি তাকে দীনের তাফাক্কুহ (تفقه) বা সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি দান করেন।"

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) একবার সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে বলেন ঃ

إن رِجالا يأتونكم من الارض يتفقهون فى الدين فاذا اتوكم فاستوصوا بهم خيرا [১১]

---

৮. ইহ্‌ইয়াউ উলূমিদ্দীন, ১ম খণ্ড, ২৪ পৃষ্ঠা।

৯. শরহু মুসাল্লামিস সুবুত, ১১ পৃষ্ঠা।

১০. বুখারী, মুসলিম ও মিশকাত কিতাবুল ইলম।

১১. তিরমিযী ও মিশকাত, কিতাবুল ইলম।

"লোকেরা দ্বীনের ব্যাপারে তাফাক্কুহ হাসিল করার জন্য তোমাদের কাছে আসবে নানা স্থান থেকে। যখন তারা আসে আমার এ অসিয়্যত যে, তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে।"

তিনি আরো বলেন ঃ

رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه [১২]

অনেক সময় ফিক্‌হ বহনকারী অর্থাৎ নতুন অবতীর্ণ কোন আয়াত বা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কোন নির্দেশের বাহক বা বর্ণনাকারী খোদ ফকীহ হয় না। আবার অনেক সময় ফিকহের বাহক এমন কারো কাছে ফিক্‌হ বহন করে নিয়ে যায় যে অধিকতর সূক্ষ্মদর্শী ফকীহ।

বুদ্ধি ও হৃদয়বৃত্তি প্রসূত বিচক্ষণতা

ফিক্‌হী বিধান দেয়ার জন্য যে ধরনের তাফাক্কুহের কথা বলা হয়েছে, তাতে বুদ্ধি ও হৃদয়বৃত্তি উভয়ের প্রেরণায় কাজ করা এবং উভয়ের মধ্যে সমতা ও ভারসাম্য বজায় রাখা অপরিহার্য গণ্য করা হয়। যে চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি ঐ দুটির মধ্য থেকে কোনো একটির নেতৃত্ব ও নির্দেশনা লাভ থেকে বঞ্চিত হবে অথবা এ দু'য়ের ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম হবে না, তা অন্য কোনো কাজের জন্য যদিও বা সহায়ক হতে পারে ফিকহী বিধান উদ্ভাবন তথা আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তার বিশেষ কোনো ভূমিকা থাকা সম্ভব হবে না। সাধারণভাবে মনে করা হয়ে থাকে যে, ইল্‌ম (জ্ঞান) ও উপলব্ধির একমাত্র উৎস হচ্ছে বুদ্ধি (عقل)। অথচ কুরআন মজীদের বিভিন্ন বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, ইল্‌ম ও উপলব্ধির আরও একটি উৎস আছে এবং সেটি হচ্ছে কল্‌ব (قلب) বা হৃদয়, যেমন বলা হয়েছে ঃ

لَهُمْ قُلُوْبٌ لاَّ يَفْقَهُوْنَ بِهَا (الاعراف : ١٧٩)

"তাদের হৃদয় আছে বটে, কিন্তু সে হৃদয়ে তাফাক্কুহ (গভীর তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধির ক্ষমতা) নেই।"

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ (البقرة : ٧١)

"আল্লাহ্ তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দিয়েছেন।"

اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا (محمد : ٢٤)

"অথবা তাদের হৃদয়ে তালা মেরে দেয়া হয়েছে কি?"

فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لاَيَفْقَهُوْنَ (المنافقون : ٣)

"তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে, তাই তারা বুঝে না।

---

১২. তিরমিযী ও আবূ দাউদ, ইব্‌ন মাজা ও মিশকাত, কিতাবুল ইলম।

এই আয়াতগুলোয় হৃদয়ের সাথে সম্পর্কিত জ্ঞান ও উপলব্ধির অনুপস্থিতির কথা বলা হয়েছে। তবে বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার প্রয়োজনের কথা অস্বীকার করা হয়নি। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় বুদ্ধির উচ্চ শিখরে আরোহণ করা সত্ত্বেও অনেক মানুষ সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হতে পারেনি।

আধুনিক যুগের কোনো কোনো লেখক উপরে উদ্ধৃত আয়াতে উল্লিখিত 'কল্‌ব' শব্দের অনুবাদ করেছেন 'বুদ্ধিবৃত্তি'। তাদের এ ত্রুটিপূর্ণ অনুবাদের কারণ, আধুনিক গবেষণা ও অনুসন্ধানে 'কল্‌ব'কে কোনো বিশেষ স্থান দিতে প্রস্তুত নয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বর্তমান কালের গবেষণা ও অনুসন্ধান কি মানব জগতের সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে? তাছাড়া এ পর্যন্ত মানুষ সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে, কেবল মাত্র সেগুলিই কি মানব প্রকৃতির চূড়ান্ত কথা? সেগুলি ছাড়া কি আর কিছুই নেই? যদি এর জবাব নেতিবাচক হয় এবং নিঃসন্দেহে এর জবাব নেতিবাচক; তাহলে 'কল্‌ব'কেও ইল্‌ম ও উপলব্ধির একটি মাধ্যম হিসেবে মেনে নিতে হবে। 'কল্‌ব' বললে গোশ্‌তের একটা টুকরা বোঝায় না, যা মানুষের বক্ষদেশের বামদিকে ঝুলানো থাকে; বরং 'কল্‌ব' হচ্ছে ঐ গোশ্‌তের টুকরাটির সাথে সম্পর্কিত একটি অদৃশ্য শক্তি। উসূলবিদগণ এ শক্তিটিকে 'কল্‌বের চোখ (عـين القلب) আখ্যা দিয়েছেন।[১৩] ঐ টুকরাটির সাথে কল্‌বের সম্পর্ক ঠিক তেমনি, যেমন বিশেষিতের সাথে বিশেষণের সম্পর্ক এবং যেমন স্থানের সাথে অবস্থানকারীর সম্পর্ক হয়। এই কল্‌ব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ (الحديث) لا يسعنى الا قلب مؤمن "মু'মিনের কল্‌ব ছাড়া আর কোথাও আমার (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র) স্থান সংকুলান হতে পারে না।"

আর এরি মাধ্যমে সেই ফিরাসাত (فراسة- অন্তর্দৃষ্টি) সৃষ্টি হয়, যে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله (الحديث) "মু'মিনের ফিরাসাতকে ভয় করো, কারণ সে আল্লাহ্‌র নূর দিয়ে দেখে।"

'হিকমত' শব্দের অর্থ

বুদ্ধি ও কলবের সমন্বয়ে যে ধরনের ইলম এবং ফিরাসাত-এর সৃষ্টি হয়, আইন প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে যার সহায়তা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়, কুরআন মজীদ তাকে একটি ব্যাপক অর্থবাচক শব্দ 'হিকমত' দিয়ে প্রকাশ করেছে।

ইরশাদ হয়েছে ঃ

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا
(البقرة : ٢٦٩)

---

১৩. নূরুল আনওয়ার, ১১৮ পৃষ্ঠা।

"আল্লাহ্ যাকে চান 'হিকমত' (حِكمَة) দান করেন। আর যাকে হিকমত (রূপ সম্পদ) দান করা হয়েছে, তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়েছ।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিম্নোক্ত হাদীসেও হিকমত শব্দটির আসল তাৎপর্যের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। [১৪] مَن يرد اللّٰه به خَيرا يفقهه فِى الدين

"আল্লাহ্ যার কল্যাণ করতে চান, তাকে তিনি দীনের তাফাক্কুহ (সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি) দান করেন।"

ইমাম মালিক (র) একজন শ্রেষ্ঠ ফকীহ এবং মালিকী মাসলাক তথা পন্থা (মাযহাব)-এর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বলেন ঃ

الحِكمة والعِلم نور يَهدى به اللّٰه مَن يَشاء [১৫]

"হিকমত ও ইল্‌ম হচ্ছে 'নূর'। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাকে এ নূরের মাধ্যমে পথের দিশা দিয়ে থাকেন।"

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

لَيس العِلم بِكثرتِ الروايات ولكنه نور يجعله اللّٰه فِى القلوب ـ[১৬]

"বিস্তর রেওয়ায়েত আসলে ইল্‌ম নয়; বরং ইল্‌ম হচ্ছে এমন একটি নূর, আল্লাহ্ যার উন্মেষ করেন মানবের কলবে।"

ইল্‌ম ও হিকমতের অধিকারীর আলামত বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি এক স্থানে বলেন ঃ

لكن عليه عَلامة ظاهرة وهو التجافى عن دار الغرور والانابة الى دار الخلود ـ[১৭]

"তার (হিকমতের অধিকারীর) পরিষ্কার আলামত হচ্ছে মায়াময় জগতকে এড়িয়ে চলা (অর্থাৎ দুনিয়াবী স্বার্থকে নিজের জীবনের মূল লক্ষ্যে পরিণত না করা) এবং চিরন্তনের (আখিরাতের) দিকে প্রত্যাবর্তন করা।"

মুহাক্কিক (গভীর তত্ত্বানুসন্ধানী) ও মুফাস্‌সিরগণের বর্ণনায় হিকমতের অর্থ

মুহাক্কিক ও মুফাস্‌সিরগণ হিকমতের কয়েকটি অর্থ বর্ণনা করেছেন। যেমন ইমাম রাগেব ইস্পাহানী বলেছেন ঃ

الحِكمة إِصابة الحَق بالعِلم والعَقل [১৮]

---

১৪. বুখারী ও মুসলিম।

১৫. তরজমানুস সুন্না, ১ম খণ্ড।

১৬. ঐ

১৭. ঐ ২য় খণ্ড, ৫০ পৃষ্ঠা।

১৮. মুফরাদাত, ১২৬ পৃষ্ঠা।

"ইল্‌ম ও বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে 'সত্যে' পৌছে যাওয়াই হচ্ছে হিকমত।"

'লিসানুল আরব' গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

الحِكمة عِبارة عَن مَعرفةِ اَفضلِ الاَشياء بِاَفضل العلومِ [১৯]

"শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম জিনিসকে সর্বোত্তম ইল্‌মের মাধ্যমে জানাই হচ্ছে হিকমত।"

হিকমতের অন্যান্য অর্থ হচ্ছে ঃ

এক ঃ বুদ্ধির পথ নির্দেশনা ও কলবের অন্তর্দৃষ্টি।

দুই ঃ বস্তুর যথার্থ স্বরূপ জানা।

তিন ঃ প্রত্যেক বস্তুকে তার যথাযথ স্থান দানের যোগ্যতা।

চার ঃ হক ও বাতিলের মধ্যে ফায়সালা করার শক্তি।

পাঁচ ঃ নফস এবং শয়তানের সূক্ষ্মতম অনুপ্রবেশ সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি।

ছয় ঃ শয়তানী ও মানবিক চাহিদাগুলোর মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা।

সাত ঃ অসৎ বৃত্তিগুলোকে নির্ভুলভাবে চিহ্নিত করে তার প্রতিরোধের সঠিক ব্যবস্থা অবলম্বন।

আট ঃ সৃষ্টদের বিভিন্ন অবস্থার জ্ঞান।

নয় ঃ এমন তত্ত্ব ও তথ্যের জ্ঞান, যার মাধ্যমে মানবাত্মা পূর্ণতায় পৌছে যায়।

দশ ঃ বিশেষ ধরনের বিচক্ষণতা ইত্যাদি।[২০]

ফলকথা, এমন সব যোগ্যতা ও ক্ষমতা, যার মাধ্যমে মানুষ বস্তুর আসল রূপ ও তাৎপর্য জানতে পারে এবং কার্যকারণের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে, তাকে হিকমত বলে। আল্লামা ইব্‌ন মিসকুওয়াহই (র) নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকেও হিকমতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রত্যুৎপন্নমতি, স্বচ্ছ চিন্তা ও সহজে শিক্ষার ক্ষমতা। এ সবগুলি উল্লেখ করার পর তিনি আরো বলেছেন ঃ

وبهذه الاشياء يَكون حُسن الاِستعداد لِلحِكمة [২১]

"এই জিনিসগুলির মাধ্যমে হিকমতের সুষম যোগ্যতা সৃষ্টি হয়।"

ইল্‌মের তিনটি পর্যায়

উল্লিখিত হিকমত ও আলোচ্য তাফাক্কুহ-এর তাৎপর্য বুঝবার জন্য নিম্নলিখিত আয়াতটিও বিশেষ গুরুত্ব বহন করে ঃ

---

১৯. লিসানুল আরব, ৫ম খণ্ড।

২০. আরা ইসুল বায়ান ফী হাকাইকিল কুরআন, পৃষ্ঠা ৬।

২১. তাহযীবুল আখলাক, ৮ পৃষ্ঠা।

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ (ال عمران : ١٦٤)

"নিঃসন্দেহে মু'মিনদের ওপর আল্লাহ্ ইহ্সান করেছেন যখন তিনি তাদের মধ্যে পাঠিয়েছিলেন একজন রাসূল, যিনি হচ্ছেন তাদেরই অন্তর্ভুক্ত, যিনি আল্লাহ্র আয়াতগুলি তাদের পড়ে শোনান, তাদের পরিচ্ছন্ন করেন এবং তাদেরকে শেখান কিতাব ও হিকমত।"

এই আয়াতটিতে রাসূলের কর্মের তিনটি পর্যায় বর্ণিত হয়েছে ঃ

এক ঃ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ রাসূল তাদেরকে তাঁর আয়াতগুলি পাঠ করে শোনান। আরবী ভাষা জানার মাধ্যমে এই পর্যায়ে উপনীত হওয়া সম্ভব, যাতে কুরআন মজীদের উপদেশ ও স্মারক উপলব্ধি করতে পারে। যে কেউ চেষ্টা করলে এ পর্যায়ে পৌঁছতে পারে বলে কথাটির অর্থে সর্বজনীনতা আছে। আর এই অর্থের প্রেক্ষিতে ইরশাদ হচ্ছে ঃ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ (القمر : ١٧)

"উপদেশ গ্রহণের জন্য আমরা কুরআনকে সহজ বানিয়েছি। কোনো উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি ?

দুই ঃ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ (তিনি তাদেরকে কিতাবের তা'লীম দেন)। এই তা'লীমের লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর মধ্যে এমন যোগ্যতা সৃষ্টি করা, যাতে সে আয়াতের প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারে, কুরআনে যে সব মূলনীতি ও মৌল বিষয় বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর যথার্থ স্থান এবং গুরুত্ব নির্ধারণ করতে পারে এবং খুঁটিনাটি বিষয়গুলোকেও চিহ্নিত করতে পারে। এই পর্যায়ে উন্নীত হবার জন্য চাই কুরআন মজীদের আয়াতের পূর্বাপর (سِيَاق و سَبَاق)-এর প্রতি দৃষ্টি দান, সূরাগুলোর মূল বিষয়বস্তু অনুধাবন সূরাগুলি যে পারিপার্শ্বিক অবস্থায় নাযিল হয়েছিল, তার জ্ঞান লাভ, পরোক্ষ ইঙ্গিতাদি (قرائن) হৃদয়ংগম করা, যাতে শিক্ষার্থী নতুন অবস্থা বা প্রশ্নোদির সম্মুখীন হলে তার জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও বুদ্ধির সাহায্যে রায় (راى) দিতে সক্ষম হয়, প্রয়োজন বোধ করলে অন্য আলিমদের সাথে আলোচনা করে বিধান দান করতে পারে। এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য ঃ فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (النحل : ٤٣)

"যদি তোমরা না জেনে থাকো তাহলে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, যারা জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে।" অর্থাৎ নিজ জ্ঞানগবেষণার অগম্য বিষয়ে অপরের জ্ঞান-গবেষণার সাহায্য গ্রহণ করো।

তিন ঃ يُعَلِّمُهُمُ الْحِكْمَةَ (তাদের হিকমত শিখান)। হিকমত ইল্‌মের সবচেয়ে উঁচু পর্যায় এবং ফকীহের যোগ্যতার শীর্ষে অবস্থিত। কার্যকারণ অনুসন্ধান করে গূঢ় তত্ত্ব অনুধাবন করে উৎস ও লক্ষ্য জেনে নেয়াই হিকমত।

আইনের জগতে এই পর্যায়ে উপনীত হবার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির জ্ঞান অপরিহার্য গণ্য করা হয় ঃ

১. আইনের ঐতিহাসিক পটভূমির জ্ঞান;

২. আইনের ভূমিকা সম্পর্কীয় জ্ঞান;

৩. ইল্লাত (علة)[২২] ও কার্যকারণের অনুধাবন সম্পর্কীয় জ্ঞান;

৪. মনস্তত্ত্বের গভীর জ্ঞান,

৫. প্রকৃতিগত আকর্ষণ ও প্রবণতা অনুধাবন,

৬. জাতীয় ও দলীয় মেযাজ সম্পর্কে জ্ঞান,

৭. জাতীয় জীবনের বিভিন্ন যুগ এবং জাতির উত্থান-পতন ইত্যাদির জ্ঞান।

কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতটিতে এই তৃতীয় পর্যায়টির উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا (البقرة : ٢٦٩)

"আর যাকে হিকমত রূপ সম্পদ দান করা হয়েছে, তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়েছে।

হিকমতের অধিকারীদের পর্যায় ও মর্যাদা

সুউচ্চ ও সুগভীর হিকমতের অধিকারীরা বিভিন্ন পর্যায় ও মর্যাদায় বিভক্ত। হিকমতের সবচেয়ে উঁচু পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন আম্বিয়া (انبياء) আলাইহিমুস সালাম। তারপর আইনের উদ্ভাবন ব্যাপারে নবীদের সাথে যে যতটা নৈকট্যের অধিকারী ছিলেন এবং যার যত বেশি সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, সেই প্রেক্ষিতেই তার স্থান নির্ধারিত হয়।

হিকমতের একটি পর্যায়ে অবস্থান করছিলেন সাইয়িদুনা হযরত উমর (রা) ও অন্য কতিপয় সাহাবা (صَحَابَة)। তাঁরা শরী'আত ও শরী'আতের মেযাজের সাথে এতই একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন যে, তার ফলে একাধিক বিষয়ে তাঁদের মতের অনুকূলে অহী (وَحى) নাযিল হয়েছিল। অনুরূপভাবে অনেক পারদর্শী সাহাবা এমন পর্যায়ে অবস্থান করছিলেন যে, তার ফলে কেবলমাত্র ইল্‌হাম (إلهام) ও ব্যক্তিগত ঝোঁক (رُجحان) প্রবণতাই তাঁহাদেরকে শরী'আতের দিকে পথপ্রদর্শনে সহায়তা করতেন।

প্রথম যুগে ফিক্‌হ

নবী (সা)-এর মুবারক যুগে ফিক্‌হ গ্রন্থিত হয়নি এবং তার সীমারেখাও নির্ধারিত হয়নি। সাহাবাই কিরাম (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যে কাজটি যেভাবে

---

২২. মদ্যপান হারাম, কেননা তাতে মাদকতা রয়েছে। মাদকতা মদ্যপান হারাম হওয়ার علة আর এই علة যেসব জিনিসে রয়েছে, যথা গাঁজা আফিম ইত্যাদি সবই হারাম।

করতে দেখতেন সেকাজটি সেভাবে করাকে তাঁরা দীন ও দুনিয়ার সাফল্য ও সৌভাগ্য মনে করতেন। হযরতের কোন্ কাজটির গুরুত্ব কোন্ পর্যায়ে এ ধরনের কোনো প্রশ্নই সাহাবার মনে উদয় হয়নি। কোন্ কাজটি তিনি অভ্যাস হিসেবে করেছেন আর কোন্‌টি ইবাদত হিসেবে, কোন্ কাজটি অপরিহার্য, কোন্‌টি অপরিহার্য নয়– এমন প্রশ্নও তাদের মনে জাগতো না। ইত্তেবা (اِتِّبَاع) অর্থাৎ আনুগত্যকে তারা প্রাণের চাইতে বেশি ভালোবাসতেন।[২৩]

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের পর যখন এমন কোন অবস্থার উদ্ভব হতো, যার কোন নযীর এবং সে প্রেক্ষিতে হযরতের কোনো হিদায়াত পাওয়া যেতো না, তখন যাঁরা বেশি ইল্‌মের অধিকারী হতেন না, তাঁরা অধিক ইলমের অধিকারী সাহাবা (রা)-কে জিজ্ঞেস করে فَسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ আয়াতে বর্ণিত নির্দেশ অনুযায়ী আমল করতেন। অধিক ইলমের অধিকারীরা কেমন করে বিধান দিতেন? এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন হযরত শাহ্ অলি উল্লাহ্ (র) ঃ

اجتهد برأيه وعرف العلة التى ادار رسول الله عليها الحكم فى منصوصاته فطرد الحكم حيثما وجدها لايالو جهدا فى موافقة غرضه عليه السلام ـ[২২]

ব্যাখ্যা ঃ যে সাহাবী উদ্ভূত পরিস্থিতির সম্মুখীন তিনি তাঁর মত প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থাৎ যে ইল্লতের ভিত্তিতে, অনুরূপ কোন অবস্থায় তাঁর প্রকাশ্য উক্তিতে যে হুকুম জারী করেছিলেন; তদ্রূপ কোন ইল্লাত উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বিদ্যমান কি-না, সে বিষয়ে গবেষণার বেলায় চেষ্টার কোন ত্রুটি করতো না। ইল্লতের সন্ধান পাওয়া গেলে অনুরূপ হুকুম চালাবার পক্ষে মত স্থির করতেন। ইল্লাতের অনুসন্ধানে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে হুকুম দিয়েছেন, তার (غرض) (মুখ্য উদ্দেশ্য) জানার জন্য তাঁরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতেন এবং সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্যের প্রেক্ষিতে বিধান দান করতেন।

সাহাবা-ই- কিরামের (রা)-পর এলো তাবেঈ (تَابِعِيْ)দের (র) যুগ। তাঁরা কুরআনের জ্ঞান, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস ও সাহাবাগণের (রা) বাণী ও কার্যাবলী খোদ সাহাবাগণের (রা) কাজ থেকেই সংগ্রহ করেন এবং তদনুযায়ী বিধান দান করতেন, নতুন ব্যাপারে ইজতিহাদের অনুরূপ কর্ম পদ্ধতি অবলম্বন করেন যা সাহাবা (রা) করেছিলেন। এমন কি–

وكان سعيد بن المسيب وابراهيم وامثالها جمعوا ابواب الفقه باجمعها وكان لهم فى كل باب اصول تلقوها من السلف ـ

২৩. আল ইনসাফ– শাহ অলি উল্লাহ্ (র), ২ পৃষ্ঠা।

২৪. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ্, ১৪০ পৃষ্ঠা।

"হযরত সাইদ ইবনুল মুসাইয়াব (র) ও ইবরাহীম (র) প্রমুখ তাবেঈগণ ফিক্‌হের নানাবিধ উপকরণ সংগ্রহ করেন। প্রত্যেক প্রসংগের কতিপয় মূলনীতিও তাঁরা হাসিল করেছিলেন সাহাবাদের (রা) কাছ থেকে।"

এরপর এলো তাবে তাবেঈন (تَبَع تَابعين) (র) দের যুগ। তাঁরা পূর্ববর্তীদের সমগ্র জীবন, অবস্থা ও সমস্যাবলী অনুধাবন করেন বুদ্ধিবৃত্তি ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে উপরোক্ত রূপে ইজতিহাদ করেন। এঁরাই ফিক্‌হ গ্রন্থাদি রচনা শুরু করেন।

প্রথম যুগে ফিক্‌হের অর্থ

প্রথম যুগে ইসলামী জীবনের সমস্ত বিভাগের সমুদয় প্রশ্নের বিধান ফিক্‌হ শব্দের অর্থের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যেমন– উসূল গ্রন্থসমূহে বলা হয়েছে ঃ

ان الفقه فى الزمان القديم كان متنا ولالعلم الحقيقة وهى الالهيات من مباحث الذات والصفات وعلم الطريقة وهى مباحث المنجيات والمهلكات وعلم الشريعة الظاهرة ـ[২৫]

"প্রাচীন যুগে ফিক্‌হের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১. عِلم الحَقيقة তথা ইলাহীয়াত (الهيات) তথা আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলীর জ্ঞান, ২. عِلم الطَريقة অর্থাৎ প্রমাণ নির্দেশক জ্ঞান, তথা নাজাতদানকারী ও ধ্বংসকর কার্যাবলীর জ্ঞান এবং ৩. الشريعة الظاهرة। অর্থাৎ দৃশ্যমান কর্মসমূহ সম্পর্কীয় বিধানের জ্ঞান। সুতরাং সে যুগে ফিক্‌হের পরিসর ছিল সর্বব্যাপী। সর্ব প্রকার দীনী ইল্‌ম ছিল ফিক্‌হ পদবাচ্য। ফিক্‌হের অর্থ সম্বন্ধে ইমাম আবূ হানীফায় (র) ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ইমামগণের বর্ণনার দীনের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি এবং اِستنباط (deduction), সংক্ষেপে উদ্ভূত প্রশ্নের জবাব অর্থাৎ বিধান উদ্ভাবন ক্ষমতা আর এ দুয়ের সমন্বয়ের নাম ফিক্‌হ, যার মাধ্যমে শরী'আতের হুকুম-আহ্‌কাম, মারেফতের গূঢ় রহস্যাদি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়, উপরন্তু নিত্য নতুন খুঁটিনাটি (جُزئيات) প্রশ্নের উত্তর উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়। যে ব্যক্তি এই গভীর দ্বীনী অন্তর্দৃষ্টি ও বিধান উদ্ভাবনের ক্ষমতা রাখেন, তাঁকেই ফকীহ বলা হয়।[২৬]

ইমামগণ ফিক্‌হের যে সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন তা হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

الفقه مَعرفة النفس مَا لها ومَاعَليها

ফিক্‌হ হচ্ছে নাফ্‌স-এর পরিচয় লাভ করা তথা কি কি তার অনুকূল (উপকারী) এবং কি কি তার প্রতিকূল (ক্ষতিকর) সে সম্বন্ধে জ্ঞান।

---

২৫. শরহে মুসাল্লামুস সুবূত, পৃষ্ঠা ১০ ও শরহে তালবীহ, ফুটনোট, ১০ পৃষ্ঠা।

২৬. ঐ।

مَالها ومَا عَليها কথাগুলোর ব্যাখ্যা তাঁরা করেছেন এইরূপ ঃ

ماينتفع به النفس ومايتضرر به فى الدنيا والاخرة [২৭]

"যার সাহায্যে নাফ্‌স দুনিয়া ও আখিরাতে ফায়দা হাসিল করে (مالها)আর যার কারণে দুনিয়া ও আখিরাতে নাফস ক্ষতির সম্মুখীন হয় (ما عليها)।

ফিক্‌হের উপরোল্লিখিত সংজ্ঞায় কোনো ইল্‌ম বা ইলমের কোন শাখাকে বিশেষিত করা হয়নি, বরং ভিন্ন এক দৃষ্টিকোণ তথা লাভ-লোকসান-এর মানদণ্ডের প্রেক্ষিতে প্রত্যেকটি উপকারী ইল্‌ম ও উহার শাখাকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটি ক্ষতিকর বিষয়কে এ থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র) আকাইদের একটি কিতাব লেখেন এবং তার নাম দেন 'ফিক্‌হে আকবর।'[২৮]

দীর্ঘকাল যাবৎ ফিক্‌হের এই অর্থই প্রচলিত এবং কার্যকর থাকে।

ফিক্‌হর পরিধির ক্রমসংকোচন

পরবর্তীকালে গ্রীক দর্শনের প্রভাবে বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়গুলো (আকাইদ عقائد) তাদের সহজ-সরল প্রকাশ ভংগী হারিয়ে ফেলে এবং তদসংক্রান্ত আলোচনা দীর্ঘ এবং যুক্তিতর্কের মার-প্যাঁচে পূর্ণ হয়ে পড়ে, তখন 'আকাইদ' একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করে। অতঃপর 'ইল্‌ম-ই কালাম' নামে তা খ্যাতি লাভ করে।

এই পর্যায়েও মনোজগতের ব্যাপার, ((وَجدانيات)[২৯] গুলোর সম্পর্ক ফিক্‌হের সাথে স্থিত ছিল। অর্থাৎ ফিক্‌হের আওতায় তার আলোচনা হত। তাই শর্‌হে মিন্‌হাজ ইত্যাদি কিতাবগুলিতে মনস্তাত্ত্বিক বিষয়গুলিকে ফিক্‌হের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নোক্ত সুস্পষ্ট বক্তব্যই অনুধাবন করা যায় ঃ

اِن تَحريم الحَسد والرِياء مِن الفِقه [৩০]

"হিংসা ও রিয়া (প্রদর্শনকারী লোক দেখানো ইবাদত) হারাম হওয়ার বিষয়টি ফিক্‌হের সাথে সম্পর্কিত।" প্রকৃতপক্ষে হিংসা ও রিয়া এবং এই ধরনের আরো সমস্ত অসৎ চিন্তা মনোবৃত্তি বিশেষ এবং ফিক্‌হের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

তারপর গ্রীক দর্শন ইত্যাদি বাইরের প্রভাব যখন আরো বেশি প্রাধান্য বিস্তার করে তখন 'বিজদানীয়ত' ও একটি পৃথক শাস্ত্রের রূপ গ্রহণ করে এবং 'তাসাউফ'

---

২৭. শরহে মুসাল্লামুস সুবূত, ১১ পৃষ্ঠা।

২৮. তাওযীহ তালবীহ, ২৮ ও ৩০ পৃষ্ঠা।

২৯. وجدانيات-এর আভিধানিক অর্থ হৃদয়ভ্যন্তরের অনুভূতি, অলৌকিক ব্যাপার. ইলহামও এর অন্তর্ভুক্ত।

৩০. শরহে মুসাল্লামুস সুবূত, ১২ পৃষ্ঠা।

(تَصوف) নামে পরিচিতি লাভ করে। ফলে আকাইদ এবং আখলাকিয়াত (اَخلاقيات-নৈতিকতা সংক্রান্ত বিষয়াদি), এই দুটি বিষয় ফিক্‌হের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে জ্ঞানের স্বতন্ত্র দুটো শাখা (ইল্‌ম-ই কালাম এবং ইল্‌ম-ই-তাসাওউফ)-এর রূপ লাভ করলো।

মুহাক্কিক (مُحقّق = সত্যানুসন্ধিৎসু) গণের দৃষ্টিতে পরিসর সংকোচন

প্রসংগত লক্ষণীয়, মিল্লাতে ইসলামিয়ার মুফাক্‌কির (مُفكر = চিন্তাবিদ) এবং মুহাক্কিক আলিমগণ ফিক্‌হের এই পরিসর সংকোচন-এই পৃথকীকরণ কে সুনজরে দেখেন নি, বরং তাঁরা এর কঠোর সমালোচনা করেছেন। ইমাম গাযালী (র) বলেন ঃ

"ফিক্‌হ শব্দটিকে সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। বর্তমানে ফিক্‌হ বলতে বোঝান হচ্ছে কতগুলো অভিনব ও অদ্ভূত ধরনের খুঁটিনাটি বিষয়ের জ্ঞান, তাদের 'ইল্লাত' ও কার্যকারণের অবনতি এবং অযথা বাক্য ব্যয়। এমন সব কথামালার সংরক্ষণকে ফিক্‌হ বলা হচ্ছে, যাদের সম্পর্ক খুঁটিনাটি বিষয়ের সাথে এবং তাদের ইল্লাত ও কার্যকারণের সাথে। যে ব্যক্তি উপরোল্লিখিত ব্যাপারগুলোর মধ্যে বেশি মশগুল থাকে, তাকেই ফিক্‌হের বড় আলিম মনে করা হয়।"[৩১]

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ "ফিক্‌হী জ্ঞান অর্জন করার উদ্দেশ্য কুরআন হাকীমে বর্ণনা করা হয়েছে- لِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ (যাতে তারা নিজেদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে)। আর প্রথম যুগের ফিক্‌হকে কার্যকর করলেই এ উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে। তালাক (طَلاق), ইতাক (عِتاق), (ক্রীতদাসের মুক্তি) লি'আন (لِعان ব্যভিচার প্রমাণের জন্য সাক্ষীর অভাবে পক্ষদ্বয়ের পারস্পরিক لَعنت এর প্রার্থনা) ইত্যাদি খুঁটিনাটি বিষয়ের জ্ঞান অর্জনে এ উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে না। বরং কেবলমাত্র ঐ বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার ফলে অনেক সময় হৃদয় কঠিন হয়ে যায় এবং আল্লাহ্‌র ভয় মন থেকে উধাও হতে থাকে। যেমন আমরা দেখছি আমাদের যুগের মুফতীদের মন কঠোর হয়ে গেছে এবং সেখান থেকে আল্লাহ্‌র ভয় তিরোহিত হয়ছে।[৩২]

সংকোচনের পর ফিক্‌হের সংজ্ঞা

যাহোক, এভাবে ফিক্‌হের পরিসর সংকোচন তথা আকাইদ এবং তাসাওউফ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর তার যে সংজ্ঞা প্রচলিত এবং খ্যাত হয়েছে, তা আমরা উসূলের কিতাবগুলিতে পাই। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অর্থব্যঞ্জক ও সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা হচ্ছে এইরূপ-

الفِقه حِكمة فَرعية شَرعية

---

৩১. ইহ্‌ইয়াউ উলূমিদ্দীন।

৩২. ইহ্‌য়াউল উলূমিদ্দীন, ১ম খণ্ড, ২৪ পৃষ্ঠা।

"ফিক্‌হ হচ্ছে এমন 'হিকমত' যার সাহায্যে নানা শাখায় শরী'আতের আহকাম উদ্ভব করা সম্ভব হয়।"[৩৩]

অধিকাংশ ফকীহ ফিকহের সংজ্ঞা দিয়েছেন এই ভাবে ঃ

العِلم بِالاحكامِ الشَرعية عَن اَدلتها التَفصيلية

"ফিক্‌হ হচ্ছে শরী'আতের আহকামের জ্ঞান যা তার বিস্তারিত যুক্তিপ্রমাণ সহকারে অর্জিত হয়।"[৩৪]

এই সংজ্ঞায় ফিক্‌হকে মানুষের জ্ঞান সম্পর্কিত একটি গুণ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু পূর্বোল্লেখিত সংজ্ঞার তুলনায় এই সংজ্ঞা নিম্ন মানের। কারণ এই সংজ্ঞায় ফিক্‌হকে 'হিকমত' বলা হয়েছে। আর হিকমত হচ্ছে অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের ইল্‌ম। তবুও ভালো, এই সংজ্ঞার মধ্যে উদ্ভাবনী শক্তি এবং যুক্তিপ্রমাণ প্রয়োগকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু নিম্নলিখিত সংজ্ঞাটি এদিক দিয়ে একেবারেই হতাশা ব্যঞ্জক। এতে বলা হয়েছে ঃ الفِقه مَجموعة الاحكام المشروعة فِى الاسلام "ইসলামী শরী'আতের বিধিবদ্ধ আহকাম সমষ্টির নাম ফিক্‌হ।" এই সংজ্ঞায় ফিক্‌হেরা শুধুমাত্র বিধান সংক্রান্ত কতগুলো তথ্যের সমষ্টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। যাতে ইল্‌ম এবং হিকমতের সাথে এর সম্পর্ক গৌণ মনে হচ্ছে। উসূলবিদগণা ফিক্‌হের এই পর্যায়টির জন্য নিম্নোক্ত ভাষায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন ঃ

ثم لما صارت العلوم صناعات غلب الاستعمال فى المسائل -

"তারপর যখন সব ইল্‌ম কতগুলো শিল্পের আকার ধারণ করলো তখন 'ফিক্‌হ' শব্দের প্রয়োগ প্রধানত মাসায়েলের ক্ষেত্রে[৩৫] সীমাবদ্ধ হয়ে গেলো।

ফিক্‌হে আলোচ্য বিষয়গুলির বিভাগ

ফিক্‌হের পরিসর সংকোচন তথা 'ইলম-ই-কালাম ও ইল্‌ম-ই-তাসাওউফ-এর স্বতন্ত্রীকরণের পর ফিকহের সম্পর্ক থেকে যায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলির সাথে ঃ

১. ইবাদাত (عِبادات) ঃ যা আল্লাহ্‌ ও বান্দার মধ্যে সম্পর্ক বজায় রাখে এবং জীবনের বিস্তৃত অংগনে বিশেষ ধরনের দৃষ্টিভংগী ও নীতি অবলম্বনের নির্দেশ দেয়।

২. মু'আমিলাত (مُعاملات) সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিধিবিধান। যাতে রয়েছে পারস্পরিক সহযোগিতা ও যৌথভাবে কাজ করার নীতি-পদ্ধতি। যেমন কেনাবেচা, ঋণ, ভাড়া, আমানত, যামানত ইত্যাদি।

---

৩৩. মুসাল্লামুস সুবূত, ৩ পৃষ্ঠা।

৩৪. নূরুল আনওয়ার ইত্যাদি।

৩৫. শরহে তাওযীহ।

৩. মানাকিহাত (مُناكحات = বিয়ে-শাদী) ঃ মানবের বংশ রক্ষা সংক্রান্ত বিধিবিধান, যার মধ্যে রয়েছে, বিয়ে, ইদ্দত, অভিভাবকত্ব, ওসীয়্যত, উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয়সমূহ।

৪. উকূবাত (عُقوبات = দণ্ডবিধি) ঃ অপরাধ যথা হত্যা, চুরি, ব্যভিচারের অপবাদ ইত্যাদি এবং তার শাস্তি যথা মৃত্যুদণ্ড, শোণিতপণ ইত্যাদি।

৫. মুখাসামাত (مُخاصَمات) ঃ এর মধ্যে রয়েছে আদালতী বিষয়সমূহ যথা অভিযোগ বিধি, বিচার বিধি, প্রমাণ প্রয়োগ বিধি ইত্যাদি।

৬. হুকুমত ও খিলাফত (حُكومة وخِلافة) ঃ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, যুদ্ধ, শান্তি ও সন্ধি, মন্ত্রিত্ব, কর আরোপ ও আদায় ইত্যাদির যেসব বিধান ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রচলিত ছিল। কিতাবুস সিয়ার ও কিতাবুল আহ্‌কামিস সুলতানীয়া জাতীয় গ্রন্থে হুকুমত ও খিলাফত সম্পর্কীয় রয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ফিক্‌হের এই আলোচ্য সমষ্টি হঠাৎ এক সময় অস্তিত্ব লাভ করেনি, একথা অতি সহজে বোঝা যায়; বরং অবস্থা ও চাহিদার প্রেক্ষিতে এবং বিবর্তনের বহু পর্যায় অতিক্রম করে বর্তমান অবস্থানে উপনীত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামী ফিক্‌হের বিবর্তনমূলক ক্রমোন্নতি

বিবর্তনমূলক ক্রমোন্নতির বিবেচনায় ইসলামী ফিক্‌হের চারটি যুগ চিহ্নিত করা যায় ঃ

১. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবনকাল তথা ১০ম হিজরী পর্যন্ত ফিক্‌হের প্রথম যুগ।

২. সাহাবা (রা)-এর আমল তথা ৪১ হিজরী পর্যন্ত ফিক্‌হের দ্বিতীয় যুগ।

৩. বয়োকনিষ্ঠ সাহাবা (রা) ও তাবেঈগণের আমল তথা হিজরী দ্বিতীয় শতকের প্রারম্ভকাল পর্যন্ত তৃতীয় যুগ।

৪. দ্বিতীয় হিজরী শতকের শুরু থেকে চতুর্থ হিজরী শতকের প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত চতুর্থ যুগ।

প্রথম যুগ

জীবনের মৌল শক্তি ও গুণাবলীর বিকাশ

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আমলে ফিক্‌হ সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় তাঁর পবিত্র সত্তার সাথে সম্পর্কিত ছিল। আইন প্রণয়ন বিচার-ফায়সালা ইত্যাদি যাবতীয় দায়িত্ব তিনি নিজেই সম্পাদন করতেন। তাঁর প্রদত্ত ফায়সালা ও আইন কানুনগুলো আলোচিত এবং অনুসৃত হত অব্যশই, কিন্তু যথারীতি সংকলিত হয়নি। তৎকালীন জীবন যাত্রার প্রয়োজন সীমিত হবার কারণে এর তেমন প্রয়োজনও ছিল না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আমল ছিল মানব জীবনের মৌল শক্তি ও গুণাবলীকে বিকশিত করার এবং ইসলামী কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাবার যুগ। এজন্য শরী'আতের শিক্ষা দান, গ্রহণ ও বাস্তবায়নের প্রতিই ছিল সবার দৃষ্টি। তদুপরি তাদের উপর ন্যস্ত ছিল কঠোর জিহাদের দায়িত্ব– সংযমের জিহাদ, প্রচারের জিহাদ, আত্মরক্ষার জন্য সশস্ত্র জিহাদ। অন্যপক্ষে তখন লেখাপড়ার চর্চাও ছিল সীমিত–সাহাবা (রা) কুরআন মজীদের আয়াতের অনুলিপি রাখতে, হাদীস লিখে রাখতে খোদ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বারণ করেছিলেন। একটি সৎ, সরল ও অনাড়ম্বর সমাজ জীবনের যে সব প্রশ্ন ও কল্যাণকর ব্যবস্থা হতে পারে, সেগুলির বিশ্লেষণের

মধ্যেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল। এবং সাহাবা (রা)-এর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল এই শিক্ষা বাস্তবায়নের মধ্যে। হযরত (সা)-এর ফায়সালা লিখে রাখার গরয তাঁরা অনুভব করলেও তাতে ছিল বারণ।

ফিক্‌হের উৎস

হযরত (সা)-এর যুগে ফিক্‌হের মাত্র দুটি উৎস ছিল।

১. কুরআন হাকীম,

২. রাসূলের ব্যাখ্যা,

কুরআনে মূলনীতি ও শাসনতান্ত্রিক বিধান ছাড়া একটি সৎসমাজের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় ও সমস্যাবলীও আলোচিত হয়েছে। যখন যেসব প্রয়োজন দেখা দিয়েছে সেই অনুযায়ী কুরআনী বিধানও নাযিল হয়েছে। এই সংগে বিপদের প্রতিরোধ ব্যবস্থার জন্যও বিধান এসেছে। যখন যেসব ওহী নাযিল হয়েছে, হযরত (সা) তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন– বাচনিক। খুব জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজনও তখন দেখা দেয়নি।

রাসূল (সা) ও সাহাবী (রা) গণের কাজের বিবরণ

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাজগুলি ছিল নিম্নরূপ ঃ

১. আল্লাহ্‌র কিতাবের শিক্ষা দেওয়া।

২. আল্লাহ্‌র কিতাবের ব্যাখ্যা দান। হিকমত শিক্ষাও ছিল এর অন্তর্ভুক্ত।

৩. উম্মতের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা। এজন্য কোনো বিশেষ পদ্ধতি নির্ধারিত ছিল না। প্রদত্ত বিধি-বিধান কার্যকর করার মাধ্যমে সাফল্য অর্জিত হতো। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহচর্য এতই প্রভাবশীল ছিল যে, তাঁর অনুকরণে সমাজ জীবনের সমস্ত কাঠামোই পুরোপুরি বদলে যেতো।

৪. সমষ্টিগত জীবনের এমন প্রশিক্ষণ দান করা, যাতে জীবন পথের প্রতিটি মোড় ও প্রতিটি অবস্থান অতিক্রম করে ইসলামী কার্যক্রম অনবরত এগিয়ে যেতে পারে।

৫. এমন একটি জামা'আত গঠন করা, যাতে নুবুওয়াতের অবসানের পর নবুওয়াতের দায়িত্ব নুবুওয়াতেরই নকশা অনুযায়ী সম্পন্ন করা যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) দুনিয়া থেকে ঠিক তখনই বিদায় নিলেন, যখন ইসলামের বুনিয়াদ সব দিক দিয়ে পূর্ণতা লাভ করেছে বলে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলেন। একদিকে তিনি ইসলামী আইনের ভবিষ্যৎ সংকলনের প্রয়োজন মিটাবার পক্ষে পূর্ণ একটি কাঠামো তৈরী করে দেন এবং অন্যদিকে আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে পরবর্তীদের জন্য কার্যকর পন্থা সৃষ্টি করে যান।

অন্যপক্ষে সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর কর্ম ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছ থেকে তাঁরা যে কুরআন তা'লীম পেতেন তা মুখস্থ করা, বুঝা ও 'আমল করা। তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাচনিক ও কর্মমূলক ব্যাখ্যাসমূহ নিজেদের জীবনে সংযোজিত করতেন। এ ছাড়া আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র সংশোধনমূলক বিশেষ হিদায়াতসমূহকে তাঁরা মনেপ্রাণে অনুধাবন করতেন।

দ্বিতীয় যুগ

রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার উদ্ভব

বহুসংখ্যক বিজয় ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক জীবন ধারার মুখোমুখি হবার কারণে এই যুগে নতুন নতুন বহু রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাবলী দেখা দেয়। অবস্থা ও যুগের দাবির প্রেক্ষিতে সমস্যাবলী সমাধানের নতুন নতুন দৃষ্টিকোণ সৃষ্টি হতে থাকে। প্রথম যুগের যে বিধান-সমষ্টি মনের ভাণ্ডারে সংরক্ষিত এবং বাস্তবে কার্যকর ছিল, সমকালীন প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য তার সম্প্রসারণের প্রয়োজন দেখা দিল এবং তারা সেই সম্প্রসারণ এমনভাবে করলো যাতে অন্য কোন উৎস থেকে আলো ধার করার প্রয়োজন হল না।

ইজমা' ও রায়

এ যুগে উদ্ভূত সমস্যাবলী সমাধানের জন্য আইন সম্প্রসারণের ব্যাপারে দুটো প্রক্রিয়ার ব্যবহার শুরু হয়। এ দুটি হচ্ছে ঃ (১) ইজ্‌মা ও (২) রায়। (إجماع - رأى = যথাক্রমে ফকীহদের সম্মিলিত মত এবং তাঁদের ব্যক্তিগত মত)।

এ দুটিকে কাজে লাগানোর প্রেরণা কুরআন ও সুন্নায় ছিল। যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পর পরবর্তী যুগের লোকেরাই আল্লাহ্‌র দীনের হিফাযতকারী ও আমানতদার ছিলেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের আমল অর্থাৎ কর্মধারা থেকে ফায়দা হাসিল করা নবুওয়াতের নকশার অন্তর্ভুক্ত ছিল; তাই তাঁরা নিজেদের গুরু দায়িত্ব অনুভব করে ফিক্‌হকে ব্যাপকতর করার পথ উন্মুক্ত করেন। এভাবে তাঁরা পরবর্তী কালের লোকদের জন্য অনেক সম্পদ জমা করে দেন।

এ যুগে ইজ্‌মাকে সংগঠিত প্রতিষ্ঠানিক রূপ দান করা হয়। এজন্য যোগ্যতা সম্পন্ন লোকদের একটি কমিটি গঠিত হয়। এই সংগে যতদূর সম্ভব যোগ্যতা সম্পন্ন লোকদের বাইরে যাওয়াও বন্ধ করে দেওয়া হয়। কুরআন ও সুন্নায় কোন উদ্ভূত বিষয়ে ফায়সালা না পাওয়া গেলে তাঁদের পারস্পারিক পরামর্শের ভিত্তিতে যে ফয়সালা গৃহীত হয়ে যেত, তা আইনের মর্যাদা লাভ করতে থাকে। অবশ্য ফকীহের 'রায়' প্রদান এবং

গ্রহণের ব্যাপারে ফিক্‌হের বিধি-বিধান ও মূলনীতি পরবর্তী পর্যায়ে সুবিন্যস্ত করা হয়। শরী'আতের উদ্দেশ্য ও মূলনীতিসমূহের আওতাধীনেই রায় অর্থাৎ সুযোগ্য ফকীহদের সুচিন্তিত ও ইজতিহাদ প্রসূত অভিমতের ব্যবহার হতো। কিন্তু যে বে-পরওয়া ব্যক্তিগত মত বা রায় ইসলামের কোন সুপ্রতিষ্ঠিত মূলনীতির উপর আঘাত হানতো তা প্রত্যাখ্যান এবং তার তীব্র বিরোধিতা করা হতো।

কুরআন ও সুন্নাহর সাথে আইনের উৎস রূপে ইজমা এবং রায় যুক্ত হলেও এ যুগের ফিক্‌হের উপজীব্য ছিল বাস্তবত নির্ভর ও ঘটনা ভিত্তিক। যখন যে প্রয়োজন দেখা দিতো অথবা যে সমস্যা তাৎক্ষণিক সমাধানের দাবি করতো, কেবল মাত্র তারই সমাধান পেশ করা হতো। পরবর্তীকালে যেসব সমস্যা ও ঘটনার উদ্ভব হতে পারে সেগুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা করার মত ফুরসত তাঁদের ছিল না।

সাহাবীগণের মধ্যে মতবিরোধ

কতিপয় ব্যাপারে এ যুগে সাহাবা কিরামের (রা) মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়, কারণ ঃ

১. কুরআন মজীদের ব্যাখ্যায় মতবিরোধ, যাতে বিধান দানেও মতপার্থক্য ঘটে। কয়েকটি অবস্থায় কুরআনের ব্যাখ্যায় মতপার্থক্য দেখা দিত ঃ (ক) দ্ব্যর্থ বোধক আরবী শব্দের ব্যবহার, যেমন 'قُرء' (তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীদের 'ইদ্দত (عِدة) সম্পর্কে ব্যবহৃত)। শব্দটিকে কোন কোন সাহাবী (হায়য حَيض) অর্থে গ্রহণ করেছেন এবং অন্যেরা একে গ্রহণ করেছে তুহ্‌র (طُهر পরিচ্ছন্ন অবস্থার) অর্থে।

(খ) আপাত দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী আয়াতের প্রয়োগ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকলে যথা ঃ যে স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গেছে, তার ইদ্দত যে আয়াতে চারমাস দশ দিন বলা হয়েছে, সে আয়াতটির অর্থ ব্যাপক। ফলে গর্ভবতী নারীর স্বামীর মৃত্যুতেও ইদ্দতের একই বিধান বলে অনুমিত হয়। কিন্তু তালাকপ্রাপ্তা গর্ভবতী নারী সম্পর্কিত আয়াতের সন্তান প্রসবকাল পর্যন্ত তার ইদ্দত নির্দেশ করা হয়েছে। গর্ভবতী নারীর স্বামী মারা গেলে সে কোন্ আয়াতের আওতাধীন হবে? তার ইদ্দত চার মাস দশ দিন হবে? না সন্তান প্রসবকাল পর্যন্ত? কোনো কোনো সাহাবী প্রথম আয়াতটি অনুযায়ী ফতোয়া দিয়েছেন, কেউ দিয়েছেন দ্বিতীয় আয়াতটি অনুযায়ী।

(গ) স্থান ও কাল নির্ধারণের ব্যাপারে মতবিরোধ। অন্য সাহাবীদের সাথে হযরত 'উমর (রা)-এর অধিকাংশ মতবিরোধ এই কারণেই হয়েছে।

২. কোন হাদীস সম্পর্কে কতিপয় সাহাবীর অনবহিত থাকার কারণে ফতোয়ার বিভিন্নতা। সাধারণভাবে হাদীস হযরত (সা)-এর সাহাবী (রা)-দের জানা ছিল, কিংবা এ সংক্রান্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর 'আমল লোকদের সামনে ছিল। আবার

কতিপয় হাদীস সম্বন্ধে বহু সাহাবী অনবহিত ছিলেন এবং এ সংক্রান্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আমলও ছিল অল্প কয়েকজন সাহাবীর জ্ঞাত, অন্যেরা ছিলেন সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত। কারণ সাধারণভাবে হাদীস বর্ণনা করার রেওয়াজ তখন ছিল না। গ্রন্থাকারে হাদীস লিপিবদ্ধও ছিল না।

৩. কোন হাদীস যে সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, সে সূত্রটি নির্ভরযোগ্য কি-না, এ ব্যাপারে মতপার্থক্যের কারণে ফতোয়ার মধ্যেও মতবিরোধ দেখা দেয়।

৪. 'রায়' দানের ব্যাপারে মতবিরোধ। সাহাবীগণ (রা) 'রায়' প্রদান করার ক্ষেত্রে "মাসালিহ" (مَصالح = জনকল্যাণ), দীনের মূলনীতি ও ফিক্‌হের প্রাণ তথা হিকমত -এ সবই দৃষ্টিপথে রেখেছিলেন। তাঁদের আমলে ফিক্‌হের নিয়ম-কানুন রচিত বা বিধিবদ্ধ হয়েছিল না। বিধান দানের ব্যাপারে إستحسان (যুক্তি গ্রাহ্য না হলেও জনকল্যাণের বিবেচনা) এবং إستصلاح (অবস্থা দৃষ্টে কল্যাণকামিতা)-এর নীতি গ্রহণের প্রমাণ সাহাবা (রা)-এর আমলেও পাওয়া যায়। যদিও তাঁরা শরীয়তের বিভিন্ন বিধানের স্থান-কাল নিজের চোখে দেখেছিলেন এবং নবুওয়াতের প্রকৃতির সাথে পরিচিতির মাধ্যমে শরী'আতের ব্যবস্থাকে হৃদয়ংগম করেছিলেন; তবুও সকল সাহাবা একই দৃষ্টিকোণ থেকে 'মাসালিহা' তথা সার্বিক কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি দেবেন এমন কথা বলা যায় না। দৃষ্টিভংগীতে পার্থক্য দেখা দিত, ফলে ফতোয়ার মধ্যেও বিভিন্নতা দৃষ্ট হত। ফিক্‌হ ছিল ঘটনা ভিত্তিক ও বাস্তবধর্মী, তাই মতবিরোধ ছিল সীমাবদ্ধ। অন্যপক্ষে পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে নিশ্চিয়তা অর্জন করার পর যে সমস্যার সমাধান করা হতো তার মধ্যে মতবিরোধের অবকাশই থাকতো না।

এই যুগের সর্বাপেক্ষা ফকীহ্ এবং গভীর জ্ঞানীদের নাম নিচে দেয়া হলো ঃ

হযরত আবূ বকর (রা), হযরত উমর (রা), হযরত উসমান (রা), হযরত আলী (রা), হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা), হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা), হযরত মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা), হযরত উবাই ইব্‌ন কা'আব (রা) এবং হযরত যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা)।

মুসলিম জামা'আতের বিভক্তি

এ যুগে রাজনৈতিকভাবে মুসলিম জামা'আতের তিনটি ভাগে বিভক্তি ফিক্‌হের ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। দলগুলো হচ্ছেঃ

১. সংখ্যগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণ, যারা হযরত আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর খিলাফত মেনে নিয়েছিল।

২. শি'আ সম্প্রদায়, যাদের বিশ্বাস, হযরত (সা)-এর পর হযরত আলী (রা) ছিলেন খিলাফতের বৈধ অধিকারী এবং খিলাফত অবশ্যই আহলে বায়ত (اهل بيت = নবীপরিবারের সদস্য)-দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে।

৩. খারিজী সম্প্রদায়, যারা হযরত উসমান (রা), হযরত আলী (রা) ও হযরত মু'আবিয়া এ তিন জনের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতো।

মতবিরোধ রাজনৈতিক বা যে ধরনেরই হোক না কেন, তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া স্বরূপ স্বপক্ষীয়দের রেওয়ায়েত ও 'রায়' অধিকতর গুরুত্ব পেতে থাকলো, ফলে ফতোয়ায় বিভিন্নতা দেখা দিল।

তৃতীয় যুগ

ফিক্‌হ সংকলনের ভিত্তিস্থাপন

এ যুগটি হযরত আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর শাসনামলে ৪১ হিজরী সন থেকে শুরু হয়ে দ্বিতীয় হিজরী শতকের সূচনাকাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত। ফিক্‌হের সংকলন, বিন্যাস ও লিপিবদ্ধ করার সমস্ত মালমসলা এ যুগেই তৈরী হয়। এজন্য একে ফিক্‌হের বিন্যাস ও গ্রন্থনার ভিত্তি যুগ বলাই সংগত।

এ যুগের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি ফিক্‌হের উপরও প্রভাব বিস্তার করে ঃ

১. ফেরকাবাজীর দরুন প্রত্যেক ফেরকার প্রবণতা হল, কোন কোন পর্যায়ে দলীয় লোকদের রেওয়ায়েত ও রায়কে অগ্রাধিকার দান করা।

২. কেন্দ্রের প্রতি আগের মতো আকর্ষণ না থাকার কারণে এবং এই সংগে ইসলামী কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাবার তাগিদে 'উলামা ও ফকীহগণ বিভিন্ন বিজিত দেশে ছড়িয়ে পড়েছিলেন এবং তথায় বসবাস করতে থাকেন। তাঁদের শিক্ষায় তাবেঈদের একটি নতুন প্রজন্ম যোগ্যতার মাপকাঠিতে সাহাবীদের যোগ্য স্থলাভিষিক্ত প্রমাণিত হয়। তাঁদের মধ্যে কোনো কোনো তাবেঈ যথাযথই বিধান উদ্ভাবন ও ফতোয়া ইত্যাদি ব্যাপারে সাহাবীগণের প্রায় সমকক্ষ হয়ে উঠেছিলেন।

৩. হাদীস বর্ণনা ও শ্রবণ শিক্ষারীতি ও পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং হাদীস ব্যাপকভাবে প্রচলিত হতে থাকে। সাহাবীদের যুগে এ কাজটি কতকটা সীমাবদ্ধ ছিল, কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিধানগুলো তখন লোকদের সামনে বাস্তব কর্মরূপে মূর্ত ছিল, তাই হাদীস বর্ণনা তেমন প্রয়োজনও ছিল না। কিন্তু এখন রাসূল (সা)-এর কথা, কাজ ও জীবনধারা, যা সাহাবীগণ নিজেদের জীবনে চিত্রায়িত করে রেখেছিলেন, শিক্ষা ও অনুশীলনের মাধ্যমে তাকে যত ব্যাপকভাবে সম্ভব প্রচলিত

করাই ছিল শরী'আতের কাঠামো অপরিবর্তিত রাখার একমাত্র পথ। কাজেই সাহাবীগণ নিজেদের জ্ঞাত সমস্ত হাদীস এবং নিজেদের পবিত্র জীবন ধারা তাবেঈদের হাতে সমর্পণ করেন। রাসূল (সা)-এর অন্তর্ধানের পর তাঁদের যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং সমাধান দিতে হয়েছিল তথা খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে মুসলিম মিল্লাত যে সব আকীদা এবং অনুষ্ঠানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, সাহাবা (রা) সে সবই তাবেঈদের সামনে তুলে ধরেন।

৪. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আজামী (عَجمی –অনারব) লোকদের একটি বিরাট দল তৈরি হয়। তাঁরা ইসলামী বিশ্বের সমস্ত শহরে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেন। যোগ্যতার দিক দিয়ে তারা আরবদের চাইতে কম ছিলেন না। বরং কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে ফিক্‌হ ও হাদীসের ক্ষেত্রে আজমীদের অবদান ছিল আরবদের চাইতে বেশি। যদি বেশি না-ও হয়, তুল্য অবদানের ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। এভাবে শরী'আত ব্যবস্থা অনুধাবন, বিশ্লেষণ ও নতুন আঙ্গিকে চিন্তা করার যথেষ্ট সুযোগ সৃষ্টি হয়ে যায় অনারব দেশের লোকদের জন্য।

৫. 'রায়' ও হাদীস প্রয়োগের সীমারেখা নির্ধারণে মতভেদ দেখা দেয়। এর ফলে দুটি দলের সৃষ্টি হয়। একটি দল এমন সব হাদীসের ভিত্তিতে ফতোয়া দিতো, যেগুলি তাদের গোচরীভূত ছিল এবং যেগুলির সন্ধান পাওয়া সম্ভবপর ছিল। এজন্য তাদের ফতোয়া দানের গণ্ডী ছিল তুলনামূলকভাবে সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয় দলটি শরী'আতকে বুদ্ধি ও নীতি ভিত্তিক মানদণ্ডে বুঝাতে চেষ্টা করতো এবং কোনো ক্ষেত্রে হাদীস না পাওয়া গেলে তারা 'রায়' এর আশ্রয় গ্রহণ করতো। এজন্য ফতোয়া দানের ব্যাপারে তাদের দৃষ্টি পরিসর প্রথমোক্ত দলটির তুলনায় ব্যাপকতর। হিজাযাবাসীগণের প্রবণতা ছিল প্রথমোক্ত দলটিকে অগ্রাধিকার দানের দিকে এবং তাদের কেন্দ্র ছিল মদীনা। আর দ্বিতীয় দলটির প্রতি অনুরক্ত ছিল 'ইরাকবাসীরা এবং তাদের কেন্দ্র ছিল কূফা। একথা সুস্পষ্ট, হিজাযবাসীদের পক্ষে হাদীসের সন্ধান করা যতটা সহজ ছিল ইরাকবাসীদের ততটা ছিল না। তবে সাহাবীগণ বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ার পর হিজাযবাসীদের জন্যও হাদীসের সন্ধান ও সংগ্রহ আর ততটা সহজ থাকেনি। সে সময় বিভিন্ন দেশের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা এমন ছিল না, যাতে হাদীস ভিত্তিক জ্ঞানের সমন্বয় সাধন সম্ভবপর। এছাড়া প্রথম দলটির তুলনায় দ্বিতীয় দলটি তমদ্দুনিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারার অধিকতর বৈচিত্র্য জনিত অবস্থা ও সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল অনেক বেশি। এখানে বাইরের প্রভাবও যথেষ্ট ছিল। বিভিন্ন তমদ্দুন ও মতবাদের ধারক এখানে বেশি ছিল। এ কারণে দু'দলের দৃষ্টিভংগীর মধ্যে বড় ধরনের পার্থক্য হওয়া ছিল অনিবার্য। ফলে তাদের ফতোয়া ও ফায়সালার মধ্যেও পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে।

কিয়াস, ইসতিহ্‌সান ও ইস্‌তিস্‌লাহের ব্যাপক ব্যবহার

এ যুগে বিধান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে কিয়াস, ইস্‌তিহ্‌সান ও ইস্‌তিসালাহের ব্যবহার অত্যন্ত ব্যাপকতা লাভ করে। ফকীহগণের ওপর নতুন নতুন প্রশ্নের চাপ পড়ে অনেক বেশি। ফলে উল্লেখিত প্রক্রিয়া অবলম্বন ছাড়া তাঁদের গত্যন্তর ছিল না। হাদীসপন্থী সম্প্রদায়ের কেউ কেউ এর কঠোর প্রতিবাদ করেন। এমনকি তাঁরা কিয়াসকে নাজায়িয গণ্য করেন। কিন্তু তাঁরা যদি কিয়াসপন্থীদের মতো সমপর্যায়ে জীবনের সমস্যাদির মুখোমুখি হতেন তাহলে মতবিরোধের মধ্যে অনেকটা পার্থক্য দেখা দিতো। একারণে মতবিরোধের কঠোরতা বেশি দিন অব্যাহত থাকতে পারেনি। বরং কিছু দিন পরে তাঁদের শাগরিদদের মধ্যে পারস্পর ইল্‌ম চর্চা ও গবেষণার মাধ্যমে লাভবান হবার ধারাবাহিক প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই যুগে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ফকীহ ও মুফতীগণের নাম নিচে দেয়া হলো ঃ

মদীনার প্রসিদ্ধ ফকীহ ও মুফতীগণ

১. উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা), ২. হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর (রা), ৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা), ৪. হযরত সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যিব মাখ্‌যূমী (রা), ৫. হযরত উরওয়া ইব্‌ন যুবাইর ইব্‌ন 'আওয়াম (রা), ৬. হযরত আবূ বকর ইব্‌ন আবদুর রহমান (রা), ৭. হযরত আলী ইব্‌ন হোসাইন (রা), ৮. হযরত উবাইদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উতবাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা), ৯. হযরত সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর (রা), ১০. হযরত সুলাইমান ইব্‌ন ইয়াসার (রা), ১১. হযরত কাসেম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবী বকর (রা), ১২. হযরত নাফে' (রা), ১৩. হযরত ইব্‌ন শিহাব যুহ্‌রী (রা), ১৪. হযরত আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হোসাইন (রা), ১৫. হযরত আবুয যিনাদ আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন যাকওয়ান (রা), ১৬. হযরত ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ আনসারী (রা) এবং ১৭. হযরত রাবী'আহ ইব্‌ন আবী আব্‌দির রহমান (রা)।

মক্কা ও কূফার প্রসিদ্ধ ফকীহ ও মুফতীগণ

মক্কার ফকীহগণ হচ্ছেন ঃ ১ হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আব্বাস (রা), ২. হযরত মুজাহিদ ইব্‌ন জুবাইর (রা), ৩. হযরত ইকরামা (রা), ৪. হযরত আতা ইব্‌ন রিবাহ (রা), ৫. হযরত আবুয যুবাইর মুহাম্মদ মুসলিম (র)।

কূফার ফকীহ ও মুফতীগণ হচ্ছেন ঃ ১. হযরত আলকামা ইব্‌ন কায়স আন্‌ নাখঈ (রা), ২. হযরত মাসরূক ইব্‌ন আজদা' (র), ৩. হযরত উ'বাইদা ইব্‌ন উমর সালমানী (র), ৪. হযরত আস্‌ওয়াদ ইব্‌ন ইয়াযীদ নাখঈ (র), ৫. হযরত শুরাইহ্‌ ইব্‌ন হারেস কিনদী, ৬ হযরত ইবরাহীম ইব্‌ন ইয়াযীদ নাখঈ (র), ৭. হযরত সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) এবং ৮. হযরত আমের ইব্‌ন শারাহবীল (র)।

বসরা ও সিরিয়ার প্রসিদ্ধ ফকীহ ও মুফতীগণ

বসরার ফকীহ ও মুফতীগণ হচ্ছেন ঃ ১. হযরত আনাস ইব্‌ন মালেক আনসারী (রা), রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খাদেম, ২. হযরত আবুল আলিয়া (র), ৩. হযরত আবুশ শা'শা জাবের ইব্‌ন যায়দ (র), ৪. হযরত মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন (র), ৫. হযরত হাসান ইব্‌ন আবুল হাসান য়াসার (র) এবং ৬. হযরত কাতাদা ইব্‌ন দা'আমাহ (র)।

সিরিয়ার ফকীহ ও মুফতীগণ হচ্ছেন ঃ ১. হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন গানাম আশ'আরী (র), ২. হযরত আবূ ইদরীস খওলানী (র), (৩) হযরত কাবীসা ইব্‌ন যুওয়াইব (র), ৪. হযরত মাকহূল ইব্‌ন আবী মুসলিম (র), ৫. হযরত রজা ইব্‌ন হায়াতিল কিন্দী (র), ৬. হযরত উমর ইব্‌ন আবদিল আযীয ইব্‌ন মারওয়ান (র)।

মিশর ও ইয়ামনের বিখ্যাত ফকীহ ও মুফতীগণ

মিসরের ফকীহ ও মুফতীগণ হচ্ছেন ঃ ১. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইবনিল 'আস (রা), ২. হযরত আবুল খায়র মুরশিদ ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ (র) এবং ৩. হযরত ইয়াযীদ ইব্‌ন আবী হাবীব (র)।

ইয়ামানের ফকীহ ও মুফতীগণ হচ্ছেন ঃ ১. হযরত তাউস ইব্‌ন কায়সান জুন্‌দী (র), ২. হযরত ওহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (র) এবং ৩. হযরত ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবী কাসীর (র)।

তখনও ফিকহের বিভিন্ন মাযহাব প্রতিষ্ঠিত হয়নি–

উল্লেখিত মনীষীগণ সবাই হাদীস ও ফিক্‌হের জ্ঞানে ব্যুৎপন্ন এবং প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁরা তাদের শহরের জনগণের আকর্ষণের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিলেন। এ যুগে ফিকহের বিভিন্ন সম্প্রদায় (Sehools of thought) বা মাযহাব (مَذهب =পন্থা) কায়েম হয়নি। বরং যে যার কাছ থেকে ইচ্ছা ফতোয়া গ্রহণ করতো এবং মুফতী নিজের জ্ঞান অনুযায়ী ফতোয়া দিতেন। যদি এই ফতোয়া সন্তোষজনক নয় মনে হতো অথবা কোন ব্যাপারে আরো অনুসন্ধানের প্রয়োজনবোধ হতো তাহলে অন্য কোন মুফতী ও ফকীহের কাছে একই ব্যাপারে ফতোয়া নেওয়া হতো। এধরনের বিষয়কে দোষণীয় মনে করা হতো না।

মুফতী ও ফকীহ ছাড়া বিভিন্ন শহরে সরকারের পক্ষ থেকে কাযী (বিচারপতি)ও নিযুক্ত ছিলেন। তাঁরা কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী বিচার করতেন। যদি কুরআন ও হাদীসে তাঁরা কোনো ক্ষেত্রে নির্দেশ না পেতেন তাহলে বিখ্যাত ফকীহ্‌দের কাছ থেকে ফতোয়া নিতেন অথবা নিজেদের ইজতিহাদ প্রসূত মতের ভিত্তিতে ফায়সালা দিতেন। আবার কখনো তাঁরা পত্রের মাধ্যমে খলীফার কাছ থেকেও ফায়সালা জেনে নিতেন।

খারেজী ও শি'আ সম্প্রদায়ের উন্নতি

এ যুগে খারেজী ও শি'আ সম্প্রদায়ের প্রভাব বৃদ্ধি হয়েছিল। খারেজীরা বিভিন্ন দীনী ব্যাপারে নিজেদের মতের ওপর অটল থাকে। এ কারণে হাদীস গ্রহণ করার ব্যাপারে তারা এমন সব লোককে অগ্রাধিকার দিয়েছিল, যারা ছিল তাদের বন্ধু ও সমমনা।

শী'আদের মধ্যে বিভিন্ন ফেরকার জন্ম হয়। তারা গায়র শী'আ লোকদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ বা হাদীস গ্রহণকে গুরুত্ব দেয়নি। ফলকথা এভাবে প্রত্যেক ফেরকা, দল ও সম্প্রদায় নিজেদের ইমামের কাছ থেকে হাদীস ও ফিক্‌হ সংক্রান্ত ফায়সালা গ্রহণ করাকে অগ্রাধিকার দেয়।

হাদীস লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস

একদিকে যথাযথ পদ্ধতিতে হাদীস লিপিবদ্ধ করার জন্য খলীফা হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) প্রচেষ্টা শুরু করেন। ইসলামী দুনিয়ার প্রত্যেক দেশের শাসক এবং আলিমদের কাছে তিনি লিখে পাঠান, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস সন্ধান করে তা সংগ্রহ করতে থাকো। আমি ইল্‌ম ও উলামার নিঃশেষ হয়ে যাবার ভয়ে ভীত। অন্য দিকে তখন জাল হাদীস রচনা চলছিলো।

জাল হাদীস রচনার কারণ

১. ইসলাম বিরোধী লোকদের ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করার বাসনা।

২. মূর্খ সূফী ও 'আবিদ (ইবাদতে মশগুল) গণের বাসনা, তাঁরা অনুপ্রেরণা মূলক ও ফাযায়েল (فَضَائِل) সংক্রান্ত হাদীস তৈরী করে জনগণকে ধর্মকর্মে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন।

৩. সংকীর্ণমনা এবং স্বল্প শিক্ষিত মুহাদ্দিসগণের খ্যাতি অর্জনের বাসনা।

৪. বিদ্'আত প্রচারে উৎসাহী ও বিভিন্ন মাযহাবের অনুসারীদের নিজেদের মতবাদের স্বপক্ষে দলীল পেশ করার গরজ।

৫. বৈষয়কি স্বার্থান্বেষীদেরকে তাদের কর্মের স্বপক্ষে শরঈ দলীল পেশ করে খুশি করার ইচ্ছা।

৬. দুর্বল মতন[৩৬]-এর দুর্বলতা দূর করার জন্য

প্রখ্যাত সনদ[৩৭] জুড়ে দেওয়া, কোন প্রখ্যাত সনদকে ওলটপালট করে কাটছাঁট করে দুর্বল বা ত্রুটিপূর্ণ 'মতন' এর সাথে যুক্ত করা, যাতে তাদের বক্তব্যের বিরুদ্ধে

---

৩৬. যে শব্দগুলোতে হাদীসের বক্তব্য প্রকাশিত হয় তার সমষ্টিকে হাদীসের মতন (مَتْن) বলা হয়। – অনুবাদক

৩৭. হাদীস বর্ণনাকারী (রাবী-رَاوِى) দের নামের সমষ্টিকে হাদীসের সনদ বলে।

কোনো প্রবল অভিযোগ না আসে এবং তাদের বর্ণনার অভিনবত্বে জনগণ তাদের ইল্‌মী শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেয়।

৭. সাহাবীদের উক্তি, আরবী প্রবাদবাক্য ও জ্ঞানীদের জ্ঞানগর্ভ কাহিনীগুলিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সম্পর্কিত করে হাদীস বলে চালিয়ে দেয়ার প্রবণতা।

এই সব উদ্দেশ্যে কোনো কোনো লোক মিথ্যে করে বলে দিত "আমি নিজের কানে এই হাদীস শুনেছি, আমি বর্ণনাকারীর সাথে সাক্ষাত করেছি ইত্যাদি।"

সত্যানুসারীদের বিপুল সংখ্যা

একথা সত্য, কোনো যুগের সব মানুষ এক ধরনের হয় না এবং এ যুগের সবার প্রবৃত্তি একই রকম ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগের কাছাকাছি হবার কারণে সত্যানুসারী এবং দীন ও ঈমানের জন্য জীবন উৎসর্গকারী লোকের সংখ্যা এ যুগে ছিল প্রচুর।

কিন্তু জাল হাদীসের প্রাদুর্ভাবে মুহাদ্দিসগণের জন্য হাদীস সংকলনের কাজ অত্যন্ত কঠিন ও দুরূহ হয়ে পড়ে। তাঁরা কিভাবে জাল হাদীসের মিশ্রণ থেকে প্রকৃত হাদীসগুলিকে আলাদা করেন এবং কিভাবে তাঁরা এ কর্মে সাফল্য লাভ করেন, তা ইসলামের ইতিহাসের একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

চতুর্থ যুগ

চতুর্থ যুগের বুনিয়াদ রচিত হয় তৃতীয় যুগেই। ঐ যুগে ফিক্‌হের সংকলন ও গ্রন্থনার সূচনা হয় এবং চতুর্থ যুগেই যথাযথভাবে ফিক্‌হ লিপিবদ্ধ ও সংকলিত হয়। ইসলামী বিশ্বের চতুর্দিকে যেসব মহান মর্যাদা সম্পন্ন ইমামগণ– যাঁদের মুকাল্লিদ তথা অনুসারীবর্গ চারদিকে ছড়িয়ে গিয়েছিলেন, এবং নিজ নিজ ইমামের ফিক্‌হী ফায়সালাকে নিজেদের জীবনে কার্যকর করেছিলেন, সে ইমামগণ ছিলেন এই চতুর্থ যুগেরই সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব।

এ যুগের বৈশিষ্ট্য

এ যুগের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি ফিক্‌হের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে ঃ

১. সভ্যতার ব্যাপকতা। এর ফলে নতুন নতুন প্রয়োজনের জন্ম হয় এবং চিন্তা গবেষণার নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়।

২. জ্ঞান চর্চার প্রসার। গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচলন ও প্রসার ঘটে যাতে পারস্পরিক আদান-প্রদানের সুযোগ (এবং দুযোর্গ) সৃষ্টি হয়।

হাদীস গ্রন্থ প্রণয়ন

৩. এ যুগেই হাদীস গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার কাজ সম্পন্ন হয়। প্রায় সমস্ত ইসলামী শহরেই এ কর্মে মনোযোগ দেয়া হয়। এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ বিশেষ অবদান রাখে ঃ

১. মদীনায় ইমাম মালেক ইব্‌ন আনাস (র),

২. মক্কায় আবদুল মালিক ইব্‌ন আব্‌দিল আযীয (র),

৩. কূফায় সুফ্‌য়ান ছাওরী (র),

৪. বসরায় হাম্মাদ ইব্‌ন সাল্‌মাহ (র) এবং সাঈদ ইব্‌ন আবী আরুবাহ্‌ (র),

৫. ওয়াসিতে হাইশাম ইব্‌ন শাব্বীর (র),

৬. সিরিয়ায় আবদুর রহমান আওযাঈ (র),

৭. ইয়ামনে ইয়ামার ইব্‌ন আরকাদ (র),

৮. খোরাসানে আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুবারক (র),

৯. রায়-এ জারীর ইব্‌ন আবদিল হামীদ (র)।

হাদীস সংকলন ও গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা প্রথম পর্যায়ে সাধারণত একই বিষয়ে যেমন নামায রোযা ইত্যাদি বিষয়ের হাদীসমূহকে বিষয়ভিত্তিকভাবে সন্নিবেশিত করা হতো। তাছাড়া হাদীসের সাথে সাহাবা ও তাবেঈগণের উক্তিও মিশ্রিত করার প্রচলন ছিল। হাদীস সম্পর্কিত হতো রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে এবং সাহাবা ও তাবেঈগণের বাণী সম্পর্কিত হতো তাদের নিজেদের সাথে।

হাদীস সংকলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে মুহাদ্দিগণ রাসূল (সা)-এর হাদীস এবং অন্যদের উক্তিগুলি পৃথক পৃথকভাবে সংকলন করেন। এ পর্যায়ে (مُسند) নামে অভিহিত সংকলনের সৃষ্টি হয়, যাতে প্রত্যেক বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীসগুলো তাঁর নামে বিন্যস্ত করা হয়। যেমন– মুসনাদে আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মূসা কুফী, মুসনাদে ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্‌বল, মুসনাদে ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়াইহ্‌ (র) মুনাসনাদে উসমান ইব্‌ন আবী শাইবাহ্‌ (র) মুসনাদে আসাদ ইব্‌ন মূসা বসরী (র) মুসনাদে নাঈম ইব্‌ন হাম্মাদ। এঁরা সবাই এক একজন রাবীর বর্ণিত সমস্ত রিওয়ায়েত একই জায়গায় লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করেন। হাদীসের বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন। এই বিন্যাস ছিল রাবী ভিত্তিক।

তৃতীয় পর্যায়ে হাদীসের এই বিশাল সঞ্চয় থেকে সঠিক হাদীস নির্বাচন করার জন্য বিস্তর যাচাই-বাছাই করা হয়। এই যাচাই-বাছাই, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনাকারীদের শীর্ষে অবস্থান করেন ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী ও ইমাম মুসলিম ইব্‌ন হাজ্জাজ নিশাপুরী। চূড়ান্ত যাচাই-বাছাই ও পর্যালোচনার পর

তাঁরা যথাক্রমে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম নামক হাদীসের দুটি সংকলন তৈরী করেন। তাঁদের পদাংক অনুসরণ করে ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসায়ী ও ইমাম ইব্‌ন মাজাহ আরো চারটি হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন। এই ছয়টি হাদীস গ্রন্থ সিহা-ই-সিত্তা (صِحاح سِتة) নামে পরিচিত। আরো বহু মুহাদ্দিস হাদীসের সংকলন প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁরা ঐ ছয়জনার মতো খ্যাতি লাভ করতে পারেননি। যদিও কোনো কোনো বিবেচনায় এঁদের সংকলন অধিকতর খ্যাতির দাবীদার; কিন্তু সামগ্রিকভাবে এইগুলি উপরোক্ত ছয়টি সংকলন অপেক্ষা নিম্নতর মানের।

জারাহ্ (جَرح) ও তা'দীল (تَعديل)[১]

এই যুগে মুহাদ্দিসদের একটি শ্রেণী হাদীসের রাবীদের অবস্থা অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা নিজেদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পরিণত করে। এই দল রাবীদের ব্যক্তিগত গুণাবলী যথা নৈতিক ও চারিত্রিক অবস্থা, স্মরণশক্তি, ধারণ ক্ষমতা ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যসংগ্রহ করে। এ দলের সদস্যরা রিজালে জারাহ ও তা'দীল নামে খ্যাত হন।

জারাহ্ ও তা'দীল-এর মাধ্যমে প্রমাণিত হল, এক শ্রেণীর রাবীদের রেওয়ায়েত সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণযোগ্য এবং উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আর এক শ্রেণীর রাবীদের রেওয়ায়েত নানা দোষে দুষ্ট এবং প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে বর্জনযোগ্য, তৃতীয় এক শ্রেণীর রাবীদের রেওয়ায়েত গ্রহণ ও বর্জনের ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। হাদীসের ভাষাও (مَتن) এই বিচার-বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অর্থাৎ ভাষাগত বিচারে হাদীসটি গ্রহণযোগ্য কি-না, তাও যাচাই করা হতো।

ফল কথা, এ যুগে হাদীসের জারাহ্ ও তা'দীল জ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখায় (فَن) পরিণত হয় এবং বিস্তর লোক এ কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

উসূল ফিক্‌হ প্রণয়ন ও ফিক্‌হের মূল বিষয়ে মতবিরোধ

৪. এ যুগে উসূলে ফিক্‌হ তথা ফিক্‌হের মূলনীতিগুলি রচিত হয়। কিন্তু ফিক্‌হী বিধানসমূহে মতবিরোধ দেখা দেয়। এর নিম্নোক্ত কারণগুলি চিহ্নিত করা যেতে পারেঃ

(ক) হাদীসকে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা এবং তা থেকে ফিক্‌হের মাসায়েল উদ্ভাবনের যৌক্তিকতার ব্যাপারে কেউ দ্বিমত পোষণ করেননি। তবে হাদীসের গ্রহণ যোগ্যতা যাচাই পদ্ধতির ব্যাপারে মতবিরোধ হয়েছে এবং প্রত্যেক ফকীহ নিজের

---

৩৮. جَرح জেরা বা criticism, تَعديل = ভারসাম্য স্থির করা, বিচার করা, عَدل = ইনসাফ। رِجال = ব্যক্তিবর্গ।

মানদণ্ড অনুযায়ী যাচাইয়ের নিয়ম-কানুন ও পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন। কিছু সংখ্যক লোক দলীলরূপে হাদীস গ্রহণ করতে অস্বীকার করে বসেছিলেন। কিন্তু উম্মতে মুসলিমার ফকীহ গোষ্ঠীর বৃহত্তম অংশের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। বরং তাঁরা ওদের কঠোর সমালোচনা করেন। এমনকি ইমাম শাফেঈ (র) ও অন্যেরা হাদীস অস্বীকারের এই মতবাদকে পথভ্রষ্টতা হিসেবে গণ্য করেছেন।

(খ) কিয়াস ও ইস্‌তিহ্‌সানকে ইসলামী ফিক্‌হের উৎস হিসেবে গণ্য করার ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দেয়। মুহাদ্দিসগণ কিয়াস ব্যবহার করার ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করার চেষ্টা করেন। ইমাম শাফেঈ (র) ইস্‌তিসানের বিরোধিতা করেন। যাহেরীয়া [(ইমাম দাউদ যাহেরীর নামের সাথে সম্পর্কিত, যিনি দলীলের শাব্দিক (ظَاهِر দৃষ্টি গোচর) অর্থের উপর নির্ভর করতেন)] সম্প্রদায় কিয়াস অস্বীকার করেন।

উল্লেখ্য, নিঃসন্দেহে এযুগে কিয়াসকে খুব বেশি ব্যবহৃত করা হয়েছে। এতে হানাফীদের অংশ অনেক বেশি। হাম্বলী ও মালেকীদের অংশ সে তুলনায় অনেক কম। আর শাফেঈদের অংশ দুই শ্রেণীর প্রায় মাঝামাঝি।

(গ) ইজমার শর্তসমূহের ব্যাপারে মতবিরোধ হয়। এ জন্য ফিকহী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি হয়েছে।

(গ) ফিক্‌হী কোন হুকুমের কি মর্যাদা এবং কি দলীল, তা নিরূপিত হলে এ নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়। যেমন কোন্ বিষয়টি ওয়াজিব এবং ওয়াজিব বলে গণ্য হতে হলে কিরূপ দলীলের প্রয়োজন হয়; ফকীহ্‌গণ এর নিয়ম-পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন।

উল্লেখ্য, এই চতুর্থ যুগে ফকীহগণ উসূলে ফিক্‌হের বিষয়ে অসংখ্য কিতাব লেখেন। অসাধারণ সাফল্যের সাথে তারা ইসলামী জ্ঞানের শাখাটির গ্রন্থনা করেন। পরবর্তী আলিমগণ এ ব্যাপারে পথনির্দেশ (Guide line) লাভ করেন। এরই ভিত্তিতে তাঁরা ফিকহী হুকুম উদ্ভাবন (اِستنباط) করতে থাকেন।

৫. এই যুগে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র বর্ণনা ভংগী এবং কতখানি জোরালো ভাষায় কর্মের নির্দেশ দেয়া বা কর্ম নিষেধ করা হয়েছে ইত্যাদির প্রতি কর্মের শ্রেণী বিভাগ সূচক পরিভাষা যেমন ফরয (فَرض) ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্‌তাহাব, মানদূব, হারাম, মাকরূহ ইত্যাদি নির্ধারণ করা হয়। এতেও কিছু মতভেদ পরিলক্ষিত হয়।

এ চতুর্থ যুগের বিখ্যাত ফকীহ্‌গণ

১. ইমাম আবূ হানীফা (র)। তাঁর যুগে কূফায় আরো তিনজন বড় বড় ফকীহ ছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন ঃ

* সুফ্‌য়ান ইব্‌ন সাইদ ছাওরী (র)।
* শারীক ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ নাখঈ (র)।

* মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদির রহমান ইব্‌ন আবী লায়লা (র)।

ইমাম আবূ হানীফা ও এঁদের মধ্যে প্রায় ইল্‌মী বিতর্ক-আলোচনা চলতেই থাকতো। ইমাম আবূ হানীফার শাগরিদদের মধ্যে যাঁরা বেশি খ্যাতি অর্জন করেন তাঁরা হচ্ছেন–

* আবূ ইউসূফ ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম আনসারী (র)।

* মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন ফরকদ শাইবানী (র)।

* যুফার ইব্‌ন হুযাইল ইব্‌ন কায়্‌স কূফী (র)।

* হাসান ইব্‌ন যিয়াদ লুলুয়ী কুফী (র)।

২. ইমাম মালেক ইব্‌ন আনাস ইব্‌ন আবী আমের। মুহাদ্দিস ও ফকীহ উভয় দলে তাঁর বহু শাগরিদ রয়েছেন। কারণ ইমাম মালেকের মধ্যে ফকীহ ও মুহাদ্দিস উভয়েরই গুণাবলী ছিল।

৩. ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইদ্‌রীস শাফেঈ। তিনি শাফেঈ নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। ইরাক ও মিসর উভয় এলাকায় তাঁর শাগরিদদের সংখ্যা ছিল প্রচুর।

৪. ইমাম আহ্‌মদ ইব্‌ন হাম্‌বল ইব্‌ন হাল্‌লাল। মুহাদ্দিস ও ফকীহ উভয় দলে তাঁর শাগরিদদের সংখ্যাও যথেষ্ট।

খ্যাতির সাধারণ কারণসমূহ

এই চারজন ইমামের মাযহাব খ্যাতি অর্জন করে এবং জনসমক্ষে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে যায়। এদের ফিক্‌হ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়ে যায় এবং টিকে থাকে। এঁদের খ্যাতি লাভের সাধারণ কারণগুলি নিচে দেয়া হলো ঃ

১. এঁদের সমস্ত রায় অর্থাৎ প্রদত্ত বিধানগুলো সংগৃহীত হয়েছিল। পূর্ববর্তী ইমামদের বিধান বিক্ষিপ্ত থেকে যায় এবং সে জন্য তাঁরা খ্যাতি অর্জন করতে পারেননি।

২. এঁদের শাগরিদগণ সমাজে উচ্চ মর্যাদা লাভ করেন। তাঁরা নিজেদের উস্তাদগণের 'রায়' জগণের সামনে তুলে ধরলে তাকে অত্যন্ত মর্যদার দৃষ্টিতে দেখা হয়। শাগরিদগণ উস্তাদগণের রায় প্রচারে যথেষ্ট তৎপর ছিলেন।

৩. কোনো কোনো মাযহাবের উদারতার কারণে এবং জনগণের প্রয়োজন পূর্ণ করার ক্ষমতা বেশি থাকায় তা সরকারের আইনে পরিণত হয়ে যায়।

যায়্‌দিয়া ও ইমামিয়া সম্প্রদায়ের খ্যাতি

এ যুগে শি'আদের দুই সম্প্রদায় যায়দিয়্যা ও ইমামিয়্যা এবং তাদের মযহাব দুটো খ্যাতি লাভ করে। যায়দিয়্যা সম্প্রদায়টি যায়দ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হুসাইনের নামের সাথে সম্পর্কিত। এই সম্প্রদায়ের ইমামদের জন্য ইজ্‌তিহাদ ছিল অপরিহার্য। এ কারণে তাদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক স্বাধীন রায়ের যোগ্যতাসম্পন্ন ইমামের জন্ম হয়েছে। তাঁদের মধ্যে নিম্নোক্ত ইমামগণ বেশি প্রসিদ্ধি অর্জন করেন ঃ

১. আল হাসান ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হাসানুন যায়দ।

২. আল হাসান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন মুহাম্মদ।

৩. কাসেম ইব্‌ন ইবরাহীম।

৪. হাদী ইয়াহইয়া ইবনুল হাসান ইবনুল কাসিম।

ইমামিয়্যা ঃ সম্প্রদায়ের বুনিয়াদ ছিল প্রধান দুইটি আকীদার উপর প্রতিষ্ঠিত; এক. ইমাম অবশ্যই মাসূম (معصوم) তথা নিষ্পাপ হবেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বংশধর হবেন।

হযরত আলী (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর وَصى অর্থাৎ অসিয়াতের মাধ্যমে মনোনীত ইমাম বা খলীফা (তার অধিকার হরণ করে আবূ বকর প্রমুখেরা অবৈধভাবে খিলাফত করেছেন)। ইমামিয়াদের যে শাখা বারজন ইমামের প্রবক্তা (ইসনা আশারিয়া) তাদের সবচেয়ে বড় ইমাম ছিলেন আবূ আবদুল্লাহ্ জা'ফর সাদেক এবং[৩৯] তার পিতা আবূ জাফর মুহাম্মদ বাকের (প্রসঙ্গত ইমামিয়াদের অন্য শাখাটির নাম সাবইয়া[৪০] অর্থাৎ সাত ইমামের প্রবক্তা; ইমামিয়াদের বিশ্বাস, দ্বাদশ অথবা সপ্তম ইমাম গায়েব হয়ে গেছেন।) শী'আদের আরো অনেক ফেরকা রয়েছে।

কোনো কোনো মাযহাব নিশ্চিহ্ন

কয়েকটি মাযহাব কিছুকাল যাবৎ অনুসৃত হত, কিন্তু পরবর্তীকালে চারটি মাযহাবের প্রভাব বেড়ে গেলে এ মাযহাবগুলো বিলুপ্ত হয়। বিলুপ্ত মাযহাবগুলোর কয়েকজন প্রসিদ্ধ ইমাম ও ফকীহের নাম নিম্নে বর্ণিত ঃ

১. আবূ আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ আল আওযাঈ (اَوزاعى)।

২. আবূ সুলাইমান দাউদ যাহেরী (ظَاهرى)।

৩. আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর তাবারী (طَبرى)।

কাল্পনিক অবস্থা ভিত্তিক ফিক্‌হ

এ যুগের ফিক্‌হ গ্রন্থাদিতে অনেক কল্পনা ভিত্তিক বিধানও স্থান পেয়েছে অর্থাৎ প্রশ্ন জাগবার পূর্বে কল্পনা করে তার বিধান নির্দেশ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে ইরাকের ফকীহদের স্থান সর্বাগ্রে। তাদের প্রদত্ত এমন কিছু বিধানও আছে, যা বহু যুগ অতীত হবার পরও হয়ত প্রয়োগের অবকাশ বা ক্ষেত্র তৈরী হবে না। এতে ফিক্‌হের ব্যাপকতা বেড়েছে। অন্যদিকে পরবর্তীকালে লোকদের মধ্যে পরনির্ভরতা এবং সহজে কর্ম সাধন প্রবণতা অর্থাৎ ইজতিহাদ বিমুখিতার সৃষ্টি হয়েছে।

এই চতুর্থ যুগের ইসলামী ফিক্‌হের সমুদয় রচনাবলী সংরক্ষিত রয়েছে, যা অত্যন্ত মূল্যবান আলোচনায় সমৃদ্ধ।

---

৩৯. اِثناء عَشرية ৪০. سَبعية

তৃতীয় অধ্যায়

ফিক্‌হের উৎস

ইসলামী ফিক্‌হের উৎস (مَأخذ)

'উৎস' বলতে এমন উপায়-উপকরণ বুঝানো হয়, যা থেকে আইন সংগ্রহ অথবা এমন সব স্থানকে বোঝান হয় যেখান থেকে দলীল সহকারে আইন লাভ করা হয়। যে শাস্ত্রে এই উপায়-উপকরণ ও স্থানসমূহের আলোচনা হয়, তাকে বলা হয় 'উসূলে ফিক্‌হ' (اُصول فِقه)। ফকীহদের ভাষায় এর সংজ্ঞা হচ্ছে ঃ

هُو عِلم بِقواعد يَتوصل بِها اِلى اِستنباط الاَحكام الفقهية عَن دَلائلها[৪১]

"উসূল ফিক্‌হ হচ্ছে এমন কতিপয় মূলনীতির জ্ঞান যার মাধ্যমে যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে বিধি-বিধান উদ্ভাবন পদ্ধতির জ্ঞান লাভ করা যায়।"

এ শাস্ত্রটি বিধি-বিধান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে নিয়মাবলীর কাজ করে। এটিকে জ্ঞানের একটি শাখা রূপে গ্রন্থায়ন একমাত্র ইসলামেরই কৃতিত্ব ।

ইসলামী ফিক্‌হের উৎস সংখ্যা

ইসলামী ফিক্‌হের উৎস (مَاخذ) মোট বারটি ঃ

১. কুরআন,

২. সুন্নাহ বা হাদীস,

৩. ইজমা (اِجماع = ঐকমত্য),

৪. কিয়াস (قِياس = সাদৃশ্যের ভিত্তিতে যুক্তি প্রয়োগের বিধান),

৫. ইস্‌তিহ্‌সান (اِستحسان = জনকল্যাণের বিবেচনায় বিধান উদ্ভাবন),

৬. ইস্‌তিদ্‌লাল (اِستدلال = দলীলের আশ্রয় গ্রহণ),

৭. ইস্‌তিস্‌লাহ (اِستصلاح = জনকল্যাণের বিবেচনা),

৮. সর্বজন স্বীকৃত ব্যক্তিদের মত (رَأى),

৯. তাআমুল(تَعامل = ব্যবহারিক প্রচলন),

---

৪১. মুসাল্লামুস সুবূত, পৃষ্ঠা ৬ এবং শরহে তওদীহ।

১০. উরফ (عُرف) ও রসম (رَسم) রেওয়াজ (رِواج),

১১. পূর্ববর্তী শরী'আত,

১২. দেশজ আইন।

উসূলে ফিক্‌হের কিতাবগুলোতে কেবলমাত্র প্রথম চারটির উল্লেখ পাওয়া যায়। এর কারণ হচ্ছে, কোনো কোনো উৎস অন্য কোনটির অন্তর্ভুক্ত বলা যায়। যেমন কিয়াসের আওতায় পড়ে ইস্‌তিহ্‌সান ইস্‌তিদলাল ইত্যাদি। তেমনি ইজমার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে তাআ'মূল ও রসম-রেওয়াজ। পূর্ববর্তী শরী'আতগুলো তাদের উৎস কুরআন এবং সুন্নাতের পরিসরে দাখিল হয়ে যায়। দেশজ আইনও তা'আমুলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে পরে। সর্বজন স্বীকৃত ব্যক্তিদের রায় যদি কিয়াস ভিত্তিক হয়ে থাকে তাহলে তা কিয়াসের অন্তর্ভুক্ত হবে, অন্যথায় তা শ্রুতিনির্ভর হাদীসের আওতাধীনে এসে যায়। ইসতিদলালও কিয়াসের নিকটবর্তী, যদিও তার অর্থ কিয়াসের চাইতে বেশি ব্যাপক। প্রথম চারটি উৎসের মধ্যে স্তর ও মর্যাদার দিক দিয়ে পার্থক্য রয়েছে। বরং আসল উৎস হচ্ছে একমাত্র কুরআন; সুন্নাত তার ব্যাখ্য এবং কর্মজীবনে বাস্তব রূপ দানের দৃষ্টিতে তার বিশ্লেষণেরই নাম। এজন্যই সুন্নাতের কোনো কোনো ব্যাখ্যা সাময়িক ও স্থানীয় আবার কোনো কোনোটি নীতিগত ও চিরন্তন। বিধান দানের ক্ষেত্রে উভয় বৈশিষ্ট্যের বিবেচনা করা হয়।

রোমক[৪২] আইনের উৎসর বিবরণ

এ প্রসংগে রোমক আইনের উৎসগুলোর আলোচনা আকর্ষণীয় হবে এবং আলোচ্য বিষয়ের ওপর আলোকপাত করতে পারে। উৎসগুলো হচ্ছে ঃ

১. Jus Givile Papirianus নামক গ্রন্থ, যার মধ্যে অধিকাংশ ধর্মীয় বিষয় সংক্রান্ত আইন লেখা ছিল।

এই ধর্মীয় বিধানগুলোকেই ফাস (Fas) বলা হয়।

২. ফকীহ ও মুজতাহিদগণের ফত্‌ওয়া।

এই ফকীহগণকে আবার তিনটি দলে বিভক্ত করা হয়েছে।

(ক) প্রথম যুগের জ্ঞানী আলেম (أحبار) ও ফকীহবৃন্দ। তাঁরা বারোটি ফলক (Twelve Tafles) এ বিধৃত আইনের ব্যাখ্যা করতেন। তাঁদের এই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরবর্তীকালে নতুন বিধি-বিধান সম্বলিত একটি বিরাট সংকলন তৈরী হয়ে গিয়েছিল।

(খ) পূর্ববর্তী ফকীহ্‌গণ এদের নিম্নলিখিত কাজের ধরন দেখে এদেরকে প্রায় উকিলদের সমগোত্রীয় বলে মনে হয়। যেমন ঃ

এক. আইন সংক্রান্ত বিষয়ে উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব দেয়া।

---

৪২. খুসুসী কানূনে রোমা, ৫ পৃষ্ঠা।

দুই. মামলার প্রাথমিক পর্যায়গুলোয় মক্কেলের স্বার্থের রক্ষণাবেক্ষণ করা।

তিন. আদালতে মামলার তদারক করা।

চার. কখনো কখনো এরা আইন সংক্রান্ত পুস্তিকা সংকলন করতেন এবং কোনো কোনো বিশেষ অবস্থায় লিখিত ফতওয়াও দিতেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্ব বর্ণিত দায়িত্বই এরা পালন করতেন।

৩. নির্ভরযোগ্য মুজতাহিদগণ। এরা আইনের মূলনীতি রচনাকালের লোক ছিলেন। কাজটি শুরু হয় খৃষ্টিয় দ্বিতীয় শতকের প্রারম্ভে। এদের ওপর ছিল নিম্নলিখিত দায়িত্বসমূহ ঃ

(ক) রোমীয় আইনের উন্নতি বিধান।

(খ) সংকলিত আইন সমষ্টির সামঞ্জস্য বিধান।

(গ) আইনের আধুনিক ব্যাখ্যা দেয়া এবং অবস্থা অনুযায়ী তাকে নতুন আঙ্গিকে সাজানো।

(ঘ) আইন প্রণয়নের সর্বোচ্চ পরিষদের কাজ। সম্রাট ও তাঁর পরিষদবর্গ এই পরিষদে অন্তর্ভুক্ত ছিল।

(ঙ) গণপরিষদের কাজ। অভিজাত শ্রেণী ও সাধারণ মানুষ উভয়েই এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। অধিবাসীদের জেলাওয়ারী বিভক্তির ভিত্তিতে এ পরিষদটি প্রতিষ্ঠিত ছিল।

(চ) নেতৃপরিষদ (Seovath) এর কাজ। আইন সংক্রান্ত প্রস্তাবসমূহ আলোচনার উদ্দেশ্যে এই পরিষদে পেশ করা হত এবং তাদের সম্মতিক্রমে সেগুলো জারী করা হতো। রোমের বিভিন্ন গোত্র প্রধানদের সমন্বয়ে এই পরিষদ গঠিত হতো। রাজার নির্বাচন ও তাকে পরামর্শ দেয়া ছিল এর কাজ। পরে এই পরিষদ রাজার কর্তৃত্বাধীন হয়ে পড়ে।

(ছ) রাজকীয় ফরমানগুলোর রক্ষণ।

(জ) ম্যাজিস্ট্রেটগণের নির্দেশাবলীর সংকলন।

(ঝ) রসম ও রেওয়াজ সংগ্রহ। এটি হচ্ছে আইনের সবচেয়ে প্রাচীন উৎস। প্রত্যেক যুগে এর অস্তিত্ব ছিল।[৪৩]

রোমীয় আইনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এর একটি অংশ ধর্মভিত্তিক, যা অনিবার্যভাবে সামগ্রিক আইনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে ফিক্‌হের প্রত্যেকটি مَأْخَذ এর আলোচনা দেখুন।

---

৪৩. খুসুসী কানূনে রূমা, ২৪ পৃষ্ঠা।

প্রথম উৎস ঃ কুরআন হাকীম

ইসলামী ফিক্‌হের মূল উৎস (مَأخذ)

কুরআন হচ্ছে ইসলামী ফিক্‌হের মূল উৎস। মূলনীতি (اُصول) ব্যাপকনীতি (كُليات)[৪৪] সমূহ এই কিতাবে আলোচিত হয়েছে। আল্লাহ্‌র কর্ম কৌশল ও বিধান (Constitiution) এই কিতাবের আলোচ্য বিষয়। বিধানগুলোর শাখা-প্রশাখা (جُزئيات)-র বিস্তারিত আলোচনা এখানে খুব কমই করা হয়েছে। এ প্রসংগে আল্লামা শাতিবী (র) বলেন ঃ

القران عَلى اِختصاره جَامع ولايكون جَامعا الا والمجموع فيه اُمور كُليات ـ

"কুরআন মজীদ সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও ব্যাপক (جَامع) কিতাব। আর এ ব্যাপকতা বা পূর্ণাঙ্গতা তখনই সম্ভব, যখন তার মধ্যে থাকে কেবল মৌলিক বিষয়ের সমাহার।[৪৫]

কুরআন মজীদ যেহেতু আল্লাহ্‌ প্রদত্ত হিদায়াতের সর্বশেষ সংস্করণ এবং এরপর আর কোন নবী আসবেনা, কোন কিতাবও নাযিল হবে না; তাই প্রতি যুগে এর শিক্ষা ও নীতিমালা প্রয়োগের উপযোগিতা অপরিহার্য। এটা সম্ভবপর যদি মানব জীবনের প্রতিটি বিভাগের চৌহদ্দী নির্ধারণের পর তার সীমারেখা চিহ্নিত করা হয় এবং মানব জীবনের এই মানচিত্রের রং চড়ানোর দায়িত্ব সোর্পদ করা হয় বিভিন্ন কালের উলামার ওপর, যাঁরা তা করবেন অবস্থা ও কালের চাহিদার প্রেক্ষিতে। বাস্তবে তাই হয়েছে। কুরআনী মূলনীতি ও মৌলিক বিধানাবলী সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কিন্তু তাদের ইজতিহাদ প্রসূত শাখা প্রশাখায় পরিবর্তনশীল সমাজের সমস্যাদি সমাধানের তাগিদে পরিবর্তন আসতে পারে। এর বিপরীতে যদি শুরুতেই খুঁটিনাটি বিষয়াদির অবতারণা করা হতো তাহলে প্রথমত কুরআনের গঠন তান্ত্রিক (Constitutonal) রূপটি বিনষ্ট হতো এবং দ্বিতীয়ত যদি ধরা যায় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর প্রবর্তিত কুরআনের মৌলনীতি বিধানগুলোকে এমনভাবে সম্প্রসারিত করে দিলেন, যাতে সর্বকালের সব সমস্যার সমাধান মিলে, আল্লাহ্‌র পক্ষে তা অসাধ্য কিছু নয়, কিন্তু বান্দার পক্ষে সে অতিবিশালকায় কুরআন শেখা এবং ইপ্সিত বিধান খুঁজে বার করা সম্ভব হত কি? অন্যপক্ষে যদি কয়েকটি যুগের প্রয়োজন মত সম্প্রসারণ করে দিতেন তাহলে কুরআন

---

৪৪. كُل = সমগ্র كُلى = সামগ্রিক, সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য, বহুবচনে كُليات ; جُزء অংশ, جُزئى আংশিক, বহুবচনে جُزئيات।

৪৫. আল মাওয়াফিকাত, ৩য় খণ্ড, ৩৬৭ পৃষ্ঠা।

অপূর্ণ থেকে যেতো। আল্লাহ্ তাঁর সেরা সৃষ্টি মানুষকে বিচার বুদ্ধি এবং বিবেক সম্পন্ন করে তৈরী করেছেন। যদি মানুষ আল্লাহ্‌র নির্দেশিত মৌলনীতি ও সামগ্রিক (كلى) বিধানগুলোর প্রয়োগ সংক্রান্ত ধারা-উপধারা প্রণয়ন করতে না পারে, তাহলে তাঁর সেরা সৃষ্টির সার্থকতা কোথায়? কুরআনের এ বৈশিষ্ট্যর উদাহরণ যথা কুরআন সরকারের প্রকৃতি ও ভূমিকা নির্ধারণ করে দিয়েছে। এর রূপ হবে খিলাফতের অর্থাৎ জমীনে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্ব এবং আমানতদারীর রূপ, মানুষের ঐক্য এবং সাক্ষ্যই হবে এর ভিত্তি, ইনসাফের মাধ্যমে সরকার মানুষের বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের ব্যবস্থা করবে। এ কথাও বলে দিয়েছে যে, সরকারের প্রতিষ্ঠানিক রূপের মধ্যমণি হবে 'শুরা' (شُورى) যাকে পার্লামেন্ট বলা যেতে পারে। কিন্তু শুরার প্রতিষ্ঠা কিভাবে হবে, তা বলে দেয়নি। সরকার প্রচলিত অর্থে গণতান্ত্রিক হবে, না একনায়কত্বমূলক, রাজতান্ত্রিক না সামরিক স্বৈরতান্ত্রিক ? এ সব কথার ফায়সালা দেয়া হয়নি। জনগণের মতামত জানার জন্য কোন্ ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে, তাও মানুষের সৎবুদ্ধি উদ্ভাবনী ক্ষমতার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। কুরআন বলে দিয়েছে, সব সম্পদের মালিক আল্লাহ্, ধনীর ধনে বঞ্চিতের অধিকার রয়েছে। কিন্তু ধনের বণ্টনের এবং বঞ্চিতের অধিকার আদায়ের, অধিকন্তু জনগণের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য যে সাংগঠনিক ব্যবস্থার প্রয়োজন, তার রূপরেখা কুরআন নির্ধারণ করে দেয়নি। মানুষ তার উদ্ভাবনী শক্তি তথা ইজতিহাদের মাধ্যমে বায়তুল মাল, আদালত ইত্যাদি সৃষ্টি করেছে–অবশ্য ইজতিহাদের শামিল ছিল পরিস্থিতি ও সময়ের বিবেচনা।

এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মার ফকীহগণ জুযঈয়াত (جزئيات)-এর গবেষণা বা ইজতিহাদের মাধ্যমে যে বিরাট কার্য সম্পাদন করেছেন, তা সবই ছিল তাঁদের যুগ ও অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল। আজো আমরা মূলনীতি ও মূল লক্ষ্যের প্রেক্ষিতে পূর্ববর্তী ফকীহদের রচিত বিধি-বিধানের আলোকে নিজেদের যুগের অবস্থা ও চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিজেদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রচনা করতে পারি। কিংবা পূর্ববর্তীদের বিধি-বিধানের অনুসরণ করতে পারি। আমাদের রচিত বিধি বিধান কিংবা আমাদের প্রতিষ্ঠিত সাংগঠনিক কাঠামো তাও চূড়ান্ত ও চিরন্তন হবে না, বরং নির্ভরশীল হবে সময় ও সমাজের অবস্থার ওপর এবং টিকে থাকবে সময় ও সমাজ যতদিন অনুমতি দেবে ততদিন। কিন্তু মৌলনীতি ও বিধানগুলো চিরন্তন।

আসলে কর্ম-পদ্ধতি নির্ধারণ নির্ভর করে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গণ-চেতনার উপর কোনো দেশের অনুকরণের ওপর নয়। তা যখন গণচেতনায় পরিবর্তন আসবে তখন অনিবার্যভাবে পুরাতন কর্মপদ্ধতির পুনরালোচনার প্রয়োজন দেখা দেবে।

ফকীহের জন্য কুরআনের সাথে সম্পর্কিত উসূলে ফিকহের ব্যাখ্যা জানা অপরিহার্য

কুরআনের যেসব অংশের সাথে ফিক্‌হের বিধানের সম্পর্ক রয়েছে, ফকীহগণ সেই সব অংশের আলোচনা করেছেন। এসব অংশে প্রায় পাঁচ শতের মত আয়াত রয়েছে। এ সম্পর্কিত নিম্নলিখিত কথাগুলো জানা জরুরী।

১. নাসিখ (نَاسِخ = যে আয়াত অপর কোন আয়াতের বিধানকে মওকূফ করে দেয়) ও মানসূখ (مَنسوخ = যে আয়াতের বিধান মাওকূফ হয়ে গেছে)।

২. মুজমাল (مُجمل) অর্থাৎ যে আয়াত সংক্ষিপ্ত এবং মুফাস্‌সার (مُفسر) অর্থাৎ যে আয়াত সংক্ষিপ্ত নয়, বরং ব্যাখ্যা সম্বলিত।

৩. আম (عَام) ব্যাপক অর্থবোধক এবং খাস (خَاص) বিশেষ অর্থ বোধক।

৪. মুহ্‌কাম (مُحكم) যে সব আয়াত বোধগম্য; এবং মুতাশাবিহ (مُتشابه) অর্থাৎ ঈমানী বিষয়গুলোর সাথে সম্পর্কিত, আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যমূলক বিধানের সাথে সম্পর্কিত নয় এবং সহজবোধ্য নয়।

৫. যে সব আয়াতে মানুষের কর্মের কথা রয়েছে, ইতিবাচক হোক বা নেতিবাচক, সে সব কর্মের আদেশগুলো কোন্ পর্যায়ের– ফরয? ওয়াজিব? সুন্নাত? মুস্তাহাব? এবং নিষেধগুলো কোন্ পর্যায়ের? হারাম? মাকরূহ? ইত্যাদি।

ফকীহগণ এগুলো ছাড়া আরো বহু ব্যাপারে বিশ্লেষণ দান করেছেন প্রমাণ প্রয়োগ এবং বিধান উদ্ভাবনের পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন। সেগুলোও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন ফকীহ্ ও মুজতাহিদের জন্য সেগুলোর জ্ঞান অর্জন জরুরী।

কুরআনী আহকামের সামগ্রিক রূপ

কুরআনের আয়াতের আকারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট যে সমস্ত জ্ঞানগর্ভ ও পরিচ্ছন্ন বিষয় অবতীর্ণ হয়েছিল, দীনের পরিপূর্ণতার পর্যায়ে তা যতই নতুন বিধানরূপে প্রতিভাত হোক না কেন, মৌলিক শিক্ষার দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, তার মধ্যে এমন একটিও ছিল না, যা পৃথিবীবাসীর নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। এ প্রেক্ষিতে কুরআন নাযিলের নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যগুলো প্রতিভাত হয়ঃ

১. পূর্ববর্তী নবীদের প্রচারের পর আল্লাহ্‌র হিদায়াতের যে অংশ বাকি ছিল, তা পূর্ণ করা।

২. যে অংশ বাড়ানো বা কমানো হয়েছিল, তাকে সুস্পষ্ট করা।

৩. যে অংশ বিস্মৃত করা হয়েছিল, তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া।

৪. ভুলক্রমে মানব যেসব বাঁধনে নিজেদেরকে জড়িয়ে নিয়েছিল, সেগুলো থেকে তাদেরকে মুক্তি দেয়া।

উপরোল্লিখিত বর্ণনার সমর্থনে কুরআন মজীদের সূরা আ'রাফ-এর ১৫৭ নং আয়াতের কয়েকটি কথা অনুধাবন করা যেতে পারে ঃ

١- يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ -

"তিনি (রাসূল সা.) লোকদের মারূফ তথা সৎকাজের হুকুম দেন।"

٢- يَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ -

"তিনি তাদেরকে মুনকার তথা অপকর্ম থেকে বিরত রাখেন।"

٣- يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ -

"তিনি পাক-পবিত্র বস্তুগুলি তাদের জন্য হালাল করে দেন।"

٤- يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰئِثَ -

"অপবিত্র বস্তুগুলি তিনি তাদের জন্য হারাম করেন দেন।"

٥- يَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ -

"তিনি তাদের বোঝা নামিয়ে বা লঘিষ্ঠ করে দেন।"

٦ - وَالْاَغْلٰلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ -.

"যে সব শিকলে তারা আবদ্ধ ছিল, তিনি সেগুলো সরিয়ে দেন।"

মারূফ ও মুনকারের ব্যাখ্যা

'মারূফ' বলতে বুঝায় জানা ও পরিচিত বস্তু বা বিষয় আর 'মুনকার' হচ্ছে অপরিচিত এবং দোষাবহ বলে যাকে অস্বীকার করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র হিদায়াতের প্রদীপ অনবরত প্রদীপ্ত থাকার কারণে ইতিহাসের প্রতি যুগে নৈতিকা মূল্যবোধের ধারক অনেকাংশে সজীব থেকেছে এবং নৈতিক চরিত্র বিনাশী বস্তু-বিষয়ের সাথেও অনেক ক্ষেত্রে লোকেরা পরিচিত থেকেছে। এ কথা স্বতন্ত্র যে, মানুষ স্বার্থ ও লালসার প্রধান্যের কারণে মারূফ ছেড়ে মুনকার কর্মে লিপ্ত হয়েছে এবং পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে আসলের গায়ে নকলের আবরণ লেপ্টে গেছে। তাই বলে ন্যায়সম্মত বিষয়ের পরিচয় কখনও সাকুল্যে ঘুচে যায় নি।

এ প্রসংগে আরবের অবস্থা বেশি উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট। হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত মূসা (আ)-এর অনুসারীদের ব্যাপারে এটা কেমন করে ধারণা করা যেতে পারে যে, তারা নৈকিতকার গুরুত্ব ও উন্নত নৈতিক চারিত্রিক গুণাবলী সম্পর্কে পুরোপুরি অনবহিত থেকেছেন? ঐ দুই নবীর নির্দেশিত কতগুলো কর্ম এবং কতক

নৈতিক ধ্যানধারণা আরবের সমাজে প্রচলিত ছিল; যদিও তার ওপর শির্‌ক এবং কুসংস্কারের প্রলেপ পড়েছিল।

উল্লেখিত মারূফ বলতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বুঝা যাবে।

১. সেই সমস্ত চারিত্রিক গুণাবলী, যেগুলো আরবের অথবা দুনিয়ার যে কোনো অংশে বিরাজিত ছিল।

২. আসমানী শরী'আতের এমন অনেক বিষয়, যেগুলি লুপ্ত হয়নি। এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধানের হিকমতের সাথে সামঞ্জস্যশীল।

৩. রসম-রেওয়াজ ও এমন সব দেশজ আইন, যেগুলি ভারসাম্যপূর্ণ প্রকৃতি ও সুপ্ত বুদ্ধির (عَقل سَليم) সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল।

অনুরূপভাবে উপরোক্ত বিষয়গুলির বিপরীতধর্মী অথবা তার বিরোধী যাবতীয় ব্যাপার মুনকার-এর অন্তর্ভুক্ত। আবূ বকর জাস্‌সাস্ (র) 'মারূফ' শব্দের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন ঃ[৪৬] وَالمَعروف مَاحسنه الشَرع وَالعَقل

"শরী'আত ও বুদ্ধি যাকে সুন্দর ও ভালো বলে অভিহিত করে, সেটিই হচ্ছে মারূফ।"

তিনি অন্যত্র বলেছেন ঃ

والمعروف هو ما حسن فى العقل فعله ولم يكن منكرا عند ذوى العقول الصحيحة ـ

"সুবুদ্ধি যেটা করা পছন্দ করে এবং ভারসাম্যপূর্ণ বুদ্ধির অধিকারীদের দৃষ্টিতে যেটা মুনকারের অন্তর্ভুক্ত নয়, সেটিই হচ্ছে মারূফ।"[৪৭]

উক্ত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে প্রত্যেক যুগের রসম-রেওয়াজ, দেশীয় আইন ইত্যাদি, যা বুদ্ধি ও শরী'আতের বিরোধী নয়, সেগুলিকে মারূফের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয়। কুরআনের পরিভাষাগত শব্দ مَعروف অত্যন্ত ব্যাপক এবং এতে দেশজ আইন, উত্তম রেওয়াজাদির স্বীকৃতি পাওয়া যায়।

ইমাম আবূ বকর রাযী (র) এর কথা ঃ

كَلمة جَامعة لجميع جهات الامر بالمَعروف ـ

অর্থাৎ এ শব্দটি আমর বিল মারূফের সকল বিভাগের জন্য ব্যাপক।[৪৮] রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ব্যাপকতাকে সংক্ষেপে এভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ

التَعظيم لِاَمر اللّه والشفقة عَلىٰ خَلقِ اللّه ـ

---

৪৬. আহ্‌কামুল কুরআন।

৪৭. ঐ, ৩য় খণ্ড, ৩৮ পৃষ্ঠা।

৪৮. তদাফসীর কবীর, ৪র্থ খণ্ড, ২-৩ পৃষ্ঠা।

(আমর বিল মারূফের অর্থ হচ্ছে) আল্লাহ্‌র হুকুমের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি মমত্ববোধ।[৪৯]

এই সংক্ষিপ্ত ও জ্ঞানগর্ভ বাণীর অন্তর্নিহিত অর্থ সরকারি ও আইনগত পর্যায়ে একটি ব্যাপক অধ্যায় সৃষ্টি করে।

তাইয়েবাত ও খাবায়েস

তাইয়েবাত (طَيبَات = পাক-পরিচ্ছন্ন) বস্তু বা বিষয়সমূহ ও 'খাবায়েস' (خَبائث = অপবিত্র-অপরিচ্ছন্ন) বস্তু বা বিষয়সমূহ।

শব্দ দুটোও মুফাস্‌সীরগণের মতে ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে ঃ المراد من الطيبات الاشياء المستطابة بحسب الطبع -

"সুস্থ প্রকৃতি সম্পন্ন মানুষ যে সমস্ত জিনিসকে পাক-পরিচ্ছন্ন মনে করে সেগুলিই হচ্ছে তাইয়েব।"[৫০]

তদ্রূপ খাবায়েস সম্পর্কেও বলা হয়েছে ঃ

كل مايستخبّه الطبعُ ويستقذره النفس كان تناوله سبا لالمٍ -

" সুস্থ প্রকৃতির মানব যেসব জিনিসকে অপবিত্র ও অপরিচ্ছন্ন মনে করে এবং প্রকৃতিস্থ হৃদয়ও যাকে নাপাক মনে করে এবং যা গ্রহণ করা কারণ হয় সেগুলো[৩] হচ্ছে خبائث এর অন্তর্ভুক্ত।

উপরোক্ত বক্তব্যের ইংগিত

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে বিকৃতির চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল এমন এক সমাজকে সম্বোধন করে مَعروف، مُنكر، طَيبات এবং خَبائث ইত্যাদি সম্বলিত আয়াত নাযিল হয়েছিল। জীবন তাদের পাপে পরিপূর্ণ হলেও সে সমাজে যদি মৌলিক মূল্যবোধের ধারণা আদৌ না থাকতো তাহলে এ ধরনের বক্তব্যে সেখানে আরো বেশি গোমরাহী ও বিভ্রান্তির সম্ভাবনা ছিল। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখানে সশরীরে উপস্থিত ছিলেন ঠিকই, তবুও একেবারে অজ্ঞ ভাল-মন্দ, পাপ-পূর্ণ ইত্যাদির ধারণা বিবর্জিত একটি মানব সমাজকে সম্বোধন করার জন্য উল্লেখিত পরিভাষাগত শব্দের গুণ ব্যবহারে কোন সার্থকতা থাকতোনা। তাদের মধ্যেও সুপ্ত প্রকৃতি এবং عَقل سَليم এর অধিকারী কিছু সংখ্যক লোক বিদ্যমান ছিল এবং সেই সমাজে সাধারণভাবে مَعروف ও مُنكر , طَيبات ও خَبائث-এর মানদণ্ড একেবারে অপরিজ্ঞাত ছিল না। তাই সে সমাজের কতিপয় বিধি-বিধান, রসম ও রেওয়াজ কল্যাণকর এবং ফিক্‌হে ইসলামীতে স্থান লাভ করেছিল।

---

৪৯. ঐ।

৫০. তাফসীর কবীর, ৪র্থ খণ্ড এবং শায়খজাদা আলীকৃত তাফসীর বায়যাবীর ফুটনোট, ২৫৭ পৃষ্ঠা।

৫১. ঐ।

বোঝা ও শিকলের ব্যাখ্যা

اصر এবং اَغلال শব্দদ্বয়ের অর্থের মধ্যে এমন সব বিধান ও কার্যাবলী অন্তর্ভুক্ত যেগুলোর মধ্যে রয়েছে কাঠিন্য এবং যেগুলো অতিরিক্ত কষ্টসাধ্য।[৫২] মওলানা আবুল কালাম আযাদ যে আলোচনা করেছেন তার সারমর্ম নিম্নরূপ ঃ

ধর্মীয় বিধানের অযথা কড়াকড়ি, এমন সব বিধি-নিষেধ, যেগুলোর পালন সম্ভব নয়, দুর্বোধ্য 'আকীদা-বিশ্বাসের বোঝা, কুসংস্কারের স্তূপ, 'আলেম ও ফকীহদের অন্ধ অনুকরণের বেড়ি, নেতাদের দাসত্বের শিকল– এগুলো হচ্ছে সেই اِصر এবং اَغلال যা ইয়াহুদী ও ঈসায়ীদের মন-মস্তিষ্ককে কারারুদ্ধ করে রেখেছিল। ইসলামের নবী (সা)-এর দাওয়াত তাদেরকে সে অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়েছে। তিনি তাদের এমন সহজ সত্য পথ দেখিয়েছেন, যে পথে বুদ্ধির ওপর কোনো বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয় না। আমল বা কাজের ক্ষেত্রেও কোনো অযথা কড়াকড়ি করা হয় না।[৫৩]

হযরত শাহ্ অলীউল্লাহ্‌র বক্তব্য

উপরে কুরআন নাযিলের যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে, হযরত শাহ অলীউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী (র)-এর নিম্নোক্ত বক্তব্য তার সমর্থনে পেশ করা যেতে পারে ঃ

انه صلى اللّه عليه وسلم بعث بالملة الحنفية الابراهيمية (التى شاعت فى العرب) لاقامة عوجها و ازالة تحريفها و اشاعة نورها وذلك قوله تعالى مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْم ـ ولما كان الامر على ذلك وجب ان تكون تلك الاصول مسلمة وسننها مقررة لان النبى اذا بُعثْ الى قوم فيهم بقية سنة فلا معنى لتغييرها وتبديلها بل الواجب تقريرها لانه اطوع لنفوسهم واثبت عند الاحتجاج عليهم ـ

"রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পাঠানো হয়েছিল সরল-সোজা ইবরাহীমী মিল্লাত দিয়ে যা আরবে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। মিল্লাতের বক্রতাকে সোজা করার জন্য, তার বিকৃতি দূর করার জন্য, তার আলো বিকিরণের জন্য। এটিই আল্লাহ্‌র বাণীতে মিল্লাতা আবীকুম ইব্‌রাহীম– বাক্যটির অর্থ। এই যখন অবস্থা ছিল, তখন নিশ্চয়ই মিল্লাতে ইবরাহীমের মূলনীতিগুলি স্বীকৃত ছিল এবং তার সুন্নতগুলি প্রতিষ্ঠিত ছিল। কারণ পয়গম্বর যখন কোনো জাতির মধ্যে আগমন করেন, যাদের মধ্যে আগের শরী'আতের কিছু সুন্নত অবশিষ্ট থাকে, যেগুলোর মধ্যে পরিবর্তনের কোনো অর্থ হয় না। বরং

৫২. নূরুল আনওয়ার, ১৭১ পৃষ্ঠা।

৫৩. তরজমানুল কুরআন, ২য় খণ্ড।

কর্তব্য হলো সে সুন্নাতগুলিকে কায়েম রাখা। কারণ ঐগুলি সে সময়ের জন্য অধিকতর সুখকর এবং প্রমাণ প্রয়োগের পক্ষে অধিকতর মযবূত হয়।[৫৪]

আলোচনা প্রসংগে তিনি আরো বলেছেন ঃ "জাহেলী যুগে এমন লোক একেবারে বিরল ছিল না, যারা নবীদের আগমনের প্রয়োজনিয়তা স্বীকার করতো, পুরস্কার ও শাস্তির সম্ভাব্যতা মানতো, নেকী ও কল্যাণের নীতিতে বিশ্বাসী ছিল এবং সহযোগিতার ভিত্তিতে লোকের সাথে লেনদেন করতো। তবে তাদের মধ্যে দুটি দলের উদ্ভব হয়েছিল। এক দল ছিল ফাসিক (فَاسِق) এবং অন্য দলটি ছিল যিন্দীক (زِنديق)। যাহারা ইসলামের ছদ্মাবরণে মুসলিমদের ক্ষতি এবং তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতো। ফাসিকদের ওপর পাশব প্রবৃত্তি ও বর্বরতার প্রাধান্য ছিল। অন্যদিকে যিন্দীকদের চিন্তা ও মনন বিকৃত হয়ে গিয়েছিল।"[৫৫]

হযরত শাহ সাহেব অন্যত্র বলেছেন ঃ

وكثيرا ما يستدل هذا النبى فى مطالبه بما بقى عندهم من الشريعة الاولى -

"অনেক সময় এই নবী তার দাবিগুলোর সমর্থনে দলীল পেশ করতেন পূর্ববর্তী শরী'আতের যা কিছু অবশিষ্ট ছিল তার মাধ্যমে।[৫৬] এ কারণেই কুরআন মজীদে বিভিন্ন নবীর সম্বন্ধে আলোচনার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাঁদের অনুসৃতির হুকুম দেয়া হয়েছে। যথা ঃ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ (الانعام : ٩٠) "তুমি তাদের হিদায়াতের অনুসরণ করো।"

মোটকথা, এভাবে নবী (সা) আল্লাহ্ প্রদত্ত হিকমত ও মূলনীতির ভিত্তিতে পূর্ববর্তী শরী'আতের নীতিমালা এবং নতুন বিধি-বিধানের সমন্বয়ে অবস্থা ও যুগের উপযোগী একটি পূর্ণাঙ্গ শরী'আত প্রণয়ন করেন।

কুরআন মজীদের নুযূলের সামাজিক পটভূমিকা

সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে নাযিলকৃত কুরআনের বিধানসমূহকে দুটো ভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ

এক. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মক্কী জীবনে অবতীর্ণ আয়াত এবং আহ্কাম প্রথম বিভাগে পড়ে। মুষ্টিমেয় মুসলিম জামাআতটি সবেমাত্র প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করছিল। তাদের মধ্যে ইসলামী চেতনা তখনো সম্যক জাগ্রত হয়নি। অন্যপক্ষে

---

৫৪. হুজ্জাতুল্লাহি'ল বালিগা, ১ম খণ্ড, ১২৪ পৃষ্ঠা।
৫৫. ঐ।
৫৬. ঐ।

ইসলামের প্রচারে পর্বত প্রমাণ বাধা। এ অবস্থায় প্রয়োজন ছিল এমন কতিপয় মৌলিক আকীদা ও আমলের প্রচার, যা চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে ঐক্য ও এককেন্দ্রীকতা সৃষ্টি করতে পারে, নৈরাজ্যের অবসান ঘটিয়ে সমাজের মধ্যে সহানুভূতি ও সহমর্মিতার উন্মেষ ঘটাতে পারে। তা ছাড়াও জরুরী ছিল কিছু প্রায় সর্বজন বিদিত ঐতিহাসিক ঘটনার আলোচনা, যা থেকে লোকেরা শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করতে পারে, অন্ধ অনুকরণের পরিবর্তে বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তা-চেতনায় উজ্জীবিত হয় এবং কুসংস্কারের জাল থেকে বেরিয়ে যথার্থ সত্যকে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়।

সুতরাং এই প্রাথমিক পর্যায়ে কুরআন মজীদের যে সব সূরা নাযিল হয়, তাতে ছিল তাওহীদ, রিসালাত, কর্মফল, নৈতিক গুণাবলী, অতীত জাতিসমূহের উত্থান-পতনের সংক্ষিপ্ত ইতিকাহিনী, আল্লাহ্‌র সর্বময় ক্ষমতা ও সৃষ্টিকৌশলের সবিস্তার বর্ণনা এবং কিছু চারিত্রিক নির্দেশাবলী।

মোটকথা, এ পর্যায়ে অবতীর্ণ কুরআনের সূরাগুলোতে যা কিছু বিবৃত হয়েছে তা অনেকাংশে জাতির কাছে স্বীকৃত ছিল এবং তার গুরুত্ব, ফায়দা ও প্রকৃত তাৎপর্য অস্বীকার করা তাদের জন্য ছিল বড়ই কঠিন।

জাতীয় ও জামাআতী জীবনে এই প্রাথমিক পর্যায় সবচেয়ে বেশি নাজুক ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। এ পর্যায়ের যথাযথ সংগঠনের ওপরই জাতির সাফল্য ও উন্নতি নির্ভর করে। আর এর মধ্যে সামান্যতম ভুল-ভ্রান্তির পরিণাম ভোগ করতে হয় চিরকাল। কুরআন মজীদের ৩০ ভাগের প্রায় ১৯ ভাগই এই মক্কী যুগে নাযিল হয় এবং পূর্বোক্ত কয়েকটি বিষয়ে ছিল সীমাবদ্ধ। এই অংশ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ছোট ছোট ছন্দময় আয়াত সমৃদ্ধ, সূরাগুলি সংক্ষিপ্ত এবং সাধারণভাবে এখানে يَا أَيُّهَا النَّاسُ। (হে মানব জাতি!) বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

দুই. দ্বিতীয় বিভাগে পড়ে রাসূল (সা)-এর মাদানী জীবনে অবতীর্ণ সূরাগুলো। হিজরতের সময় পর্যন্ত সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য স্তরের পরিবেশ পুরোপুরি পরিচ্ছন্ন ও সুগঠিত হয়ে উঠেছিল, তাদের মধ্যে নৈতিক চেতনা জাগ্রত হয়েছিল। হক (حق) ও বাতিলের (بَاطِل) মধ্যে পার্থক্য করার প্রবণতা ও যোগ্যতা সৃষ্টি হয়েছিল। তখন প্রয়োজন দেখা দেয় সত্যানুসারীদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ সংগঠন কায়েম করার জন্য জীবনের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কিত মৌলিক হিদায়াতের প্রয়োজন হল। তাই কুরআনের এই অংশে সাধারণত এই বিষয়গুলিই বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিবৃত হয়েছে এবং সেখানে সম্বোধনও করা হয়েছে– يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا বলে। এটিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবনের মাদানী যুগ বলা হয়। এই যুগের সূরাগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দীর্ঘ ও বিস্তারিত হিদায়াত সম্বলিত। এভাবে কুরআন মজীদ ২৩ বছরে পর্যায়ক্রমে নাযিল হয়। ১৩ বছর মক্কী যুগ এবং ১০ বছর মাদানী যুগ।

উভয় যুগের বিধান ও নির্দেশনায় কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

উভয় যুগের বিধান ও মূল নির্দেশনা সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অনুধাবন করা জরুরী।

১. মৌলিক ও সাধারণ বিধানের ক্ষেত্রে মানব প্রকৃতির কোন্ কোন্ দিকের বিবেচনা করা হয়েছে।

২. আয়াত নাযিলের পটভূমি কি এবং কোন্ কারণ তার পেছনে কার্যকর ছিল।

৩. আইন প্রবর্তনের ক্ষেত্রে সামাজিক অবস্থার কতটা বিবেচনা করা হয়েছে এবং সামাজিক বিবর্তনের ধারায় কোন্ আইন কয়টি সোপান অতিক্রম করেছে।

৪. একটি নির্দেশের পরে সমপর্যায়ে আর একটি নির্দেশ কিসের ভিত্তিতে এসেছে।

৫. বিধানের মধ্যে বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধনের মতো কোন্ কোন্ হিকমত ও কারণ নিহিত রয়েছে।

৬. মৌলিক (اُصول) ব্যাপক নীতি (كُليات) সমূহের মধ্যে কোন্ ধরনের প্রাণসত্তা (رُوح) সক্রিয় রয়েছে এবং তারা কে কোন্ প্রকৃতির সন্ধান দেয়?

৭. আইনের শাখা-প্রশাখা (جُزئيات) কোন্ প্রাণসত্তার প্রকাশক এবং সেগুলির ওপর সামাজিক রীতি-রেওয়াজের প্রভাব কতখানি।

৮. কোন্ বিধানসমূহের কায়া ও প্রাণ উভয়ই উদ্দেশ্য এবং কোন্গুলির শুধুমাত্র প্রাণই উদ্দেশ্য, কায়া উদ্দেশ্য নয়।

আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রে কুরআনের মূলনীতি

কুরআন মজীদের প্রাণসত্তা ও মূলনীতিগুলোর বিশ্লেষণে দেখা যায় আইনের এই উৎসটি আইন প্রণয়ন ব্যাপারে মানবিক স্বভাব-প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত নীতিগুলোর বিবেচনা অপরিহার্য গণ্য করেছে–

এক. সংকীর্ণতা বর্জন (عَدم حَرج)।

দুই. কষ্টের স্বল্পতা (قِلت تَكلف)।

তিন. পর্যায়ক্রমিকতা (تَدرِيج)।

চার. নস্‌খ (نَسخ)।

পাঁচ. শানে নুযূল (شَان نُزول)।

ছয়. হিকমত ও ইল্লত (حِكمة و عِلت)।

সাত. আরবের সামাজিক অবস্থা (مُعاشرتی حَالت)।

প্রথম মূলনীতি ঃ সংকীর্ণতা বর্জন

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) এবং হযরত আয়েশা (রা) حرج -এর মানে করেছেন ضيق সংকীর্ণতা ও সংকুচিত অবস্থা[৫৭]। অর্থাৎ আইন এমন হতে হবে, যা সহজসাধ্য, তাতে এমন কাঠিন্য না থাকে, যা মানুষের সহ্য সীমার বাইরে অথচ তার কোনো সংগত সমাধান থাকে না। এই নীতির সমর্থন পাওয়া যায় নিম্নোক্ত আয়াত ও হাদীসগুলি থেকে–

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَايُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (البقرة : ١٨٥)

"আল্লাহ্ তাঁর দীনকে তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, কষ্টসাধ্য করতে চাননা।"

مَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ (الحج : ٧٨)

"আল্লাহ্ দীনের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি।"

مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ (المائدة : ٦)

"আল্লাহ্ তোমাদেরকে কোনো কঠিন অবস্থায় ফেলে দিতে চাননা; বরং তোমাদেরকে পাক-পবিত্র করাই তাঁর উদ্দেশ্য।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) ও হযরত মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা)-কে শাসন দায়িত্ব অর্পণ করতে গিয়ে তাঁদের দুজনকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

يَسِّرَا وَلَاتُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَاتُنَفِّرَا وَتُطَاوِعَا وَلَاتَخْتَلِفَا ـ

"তোমরা মানুষের জন্য তাদের কর্মকে সহজ করো, কঠিন করোনা। উৎসাহ দান করো, ঘৃণার উদ্রেক করোনা। মতৈক্যের পরিবেশ সৃষ্টি করে, বিরোধ সৃষ্টি করোনা।"[৫৮]

আর একবার তিনি বলেন ঃ بُعِثْتُ بِالْحَنَفِيَّةِ السَّمْحَةِ (الحديث) "আমাকে সরল-সোজা (Straight forward) সহনশীল শরী'আত দিয়ে পাঠানো হয়েছে।"

এ সম্পর্কে অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

اَحَبُّ الدِّيْنِ اِلَى اللّٰهِ الْحَنَفِيَّةُ السَّمْحَةُ (الحديث)

"আল্লাহ্‌র কাছে পছন্দনীয় হচ্ছে সহজ-সোজা সহনশীল দীন[৫৯]।"

৫৭. দেখুন তাফসীরে কাশ্‌শাফ ২৯২ পৃষ্ঠা, তাফসীর কবীর ৬ষ্ঠ খণ্ড ১২৮ পৃষ্ঠা এবং তাফসীরে কবীরের পাদটীকা ৩৮০ পৃষ্ঠা।

৫৮. বুখারী ও মুসলিম-মিশকাত থেকে ৩২৩ পৃষ্ঠা।

৫৯. বুখারী শিহাবুদ্দীন ইরাসার।

আর এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ لاَضَرَرَ وَلاَضِرَارَ فِى الْاِسْلاَمِ - "ইসলামে লোকসান নেই, ক্ষতিগ্রস্ত করার অবকাশও নেই।"[৬০]

মিসওয়াক সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

لَوْ لاَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ -

"যদি আমার উম্মতের কষ্ট হবে এ ভয় আমার না থাকতো তাহলে আমি প্রত্যেক নামাযের সময় তাদের মিসওয়াক করার হুকুম দিতাম।"[৬১]

কা'বার একটি অংশকে (حَطِيم) কা'বা ঘরের অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আয়েশা (রা)-কে যা বলেন, তাতে দেখা যায়, জনগণের মধ্যে সম্ভাব্য বিরূপ প্রতিক্রিয়ার প্রতি হযরতের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল ঃ

لو لا حدثان قومك بالكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على اساس ابراهيم -

"যদি তোমার কাওমের সবেমাত্র কুফরী থেকে ইসলামে প্রবেশ করার ব্যাপারটি না হতো তাহলে আমি কা'বাকে ভেঙে ইবরাহিমী ভিতের ওপর তাকে নির্মাণ করতাম।[৬২] (এবং হাতীমকে কা'বার অন্তর্ভুক্ত করতাম, যদি প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টির সম্ভাবনা না থাকতো)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একট সাধারণ রীতি ছিল, যখন তাঁকে দু'টি জিনিসের মধ্য থেকে একটি নির্বাচন করার ইখতিয়ার দেয়া হতো, তিনি অধিকতর সহজটি গ্রহণ করতেন; যদি তার সাথে গুনাহ্ বিজড়িত না হতো।[৬৩]

وَمَا خُيِّرَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ اِلاَّ اِخْتَارَ اَيْسَرَهُمَا مَالَمْ يَكُنْ اِثْمًا -

এই বিস্তারিত আলোচনার অর্থ এ নয় যে, শরী'আতের বিধি-নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে মামুলি ধরনের কষ্টও বরদাশত করার অবকাশ নেই। অথবা কোনো কঠিন সংকট ও সংকীর্ণ অবস্থার মুখোমুখি হলে তা উত্তরণের ব্যাপারে পুরোপুরি স্বাধীনতা দেওয়া হয় এবং তা যথোপযোগী সমাধানের দিকে দৃঢ় পদক্ষেপ নির্দেশ থাকে না। তাই যদি হয় তাহলে মানুষের مُكَلَّف بِالشرع অর্থাৎ শরী'আতে দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ার কোনো অর্থই থাকে না।

---

৬০. মুফত্তী ও দারুকুতনী।

৬১. তিরমিযী ও আবূ দাউদ।

৬২. মুসলিম ১ম খণ্ড ৪২৯ পৃষ্ঠা। কা'বার পুনর্নির্মাণের সময় কুরায়শ নির্মাণ সামগ্রীর অভাবে মূল ভিতের খানিকটা অংশ বাইরে রেখেছিল। পাঁচিল চিহ্নিত সে অংশটিকে বলা হয় حَطِيم

৬৩. তিরমিযী ও বুখারী, ২য় খণ্ড, ১০৮২ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় মূলনীতি ঃ কষ্টের স্বল্পতা

এটা সংকীর্ণতা নীতির অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। কারণ আইনে যে পরিমাণ সংকীর্ণতা থাকবে ঠিক সেই পরিমাণ কষ্টও বেড়ে যাবে। নিম্নোক্ত আয়াতগুলিতে এই নীতিটির দিকে ইংগিত করা হয়েছে ঃ

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا (البقرة : ٢٨٦)

"আল্লাহ্ কোনো ব্যক্তির ওপর তার সামর্থ্যের বেশি দায়িত্ব চাপান না।"

মুফাস্‌সিরগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ্ মানুষকে তার শক্তি অনুযায়ী অর্থাৎ যতটুকু সে সহজে বরদাশত করতে পারে। সে পরিমাণ দায়িত্ব চাপান। এমন নয় যাতে নিঃশেষে সর্ব শক্তি ব্যয় করতে হয়।[৬৪]

আর একটি আয়াত হচ্ছে ঃ

يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا (النساء : ٢٨)

"আল্লাহ্ তোমাদের বোঝা হাল্‌কা করতে চান, মানুষকে (প্রকৃতিগতভাবে) দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নুবুওয়াত দানের অন্যতম উদ্দেশ্যে নির্দেশ করতে গিয়ে আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন ঃ

وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ (الاعراف : ١٥٧)

"রাসূল তাদের বোঝা নামিয়ে দেন এবং শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেন তাদেরকে"। অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতের অবাধ্যতার শাস্তি স্বরূপ তাদের ওপর যে সব কঠিন ব্যবস্থা চাপান হয়েছিল এবং যাজক শ্রেণী তাদেরকে যে সব শেকলে আবদ্ধ করেছিল; মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা থেকে তাদের রেহাই দেন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَاِنْ تَسْئَلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَلَكُمْ ـ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নানা ব্যাপারে (রাসূলকে) প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করো না। তোমাদের প্রশ্নের উত্তরে) যদি তোমাদের কাছে সব কিছু প্রকাশ করে দেয়া হয় তাহলে তোমরা মুশকিলে পড়বে। (দীন তোমাদের জন্য কষ্টসাধ্য হবে) যদি কুরআন নাযিলের সময় তোমরা নানা বিষয়ে প্রশ্ন করো তাহলে তোমাদের কাছে (সে সব প্রশ্নের উত্তরও) প্রকাশ করে দেয়া হবে। (তাতে দীনে জটিলতা সৃষ্টি হবে)।

---

৬৪. তাফসীর কাশ্‌শাফ ২৯২ পৃষ্ঠা, তাফসীর কবীর ৬ষ্ঠ খণ্ড ১২৮ পৃষ্ঠা, তাফসীর কবীর ফুটনোট ৩০০ পৃষ্ঠা।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিম্নলিখিত উক্তি থেকে উল্লেখিত মূলনীতির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার প্রমাণ পাওয়া যায়। একবার তিনি বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوْهَا وَحَدَّ حُدُوْدًا فَلاَ تَعْتَدُوْهَا وَحَرَّمَ اَشْيَاءَ فَلاَ تَنْتَهِكُوْهَا وَمَكَثَ عَنْ اَشْيَاءَ رَحْمَةً لَّكُمْ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلاَ تَبْحَثُوْا عَنْهَا ـ

"আল্লাহ্ কতগুলো ফরয নির্ধারিত করে দিয়েছেন, তাকে নষ্ট (অমান্য) করো না, কতগুলো সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, সেগুলি অতিক্রম করো না। কতগুলো জিনিস হারাম করে দিয়েছেন, সেগুলো ব্যতিক্রম করোনা। আর যে বিষয়গুলো সম্পর্কে বিস্মৃতি ছাড়াই নীরবতা অবলম্বন করেছেন তোমাদের প্রতি মেহেরবানি করার জন্য সেগুলি সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়ো না (তাতে দীনের মধ্যে অনাহূত জটিলতা সৃষ্টি হবে)।[৬৫]

হযরত (সা) এই ব্যাপারে উম্মতকে সাবধান করতে গিয়ে বলেন ঃ

اِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلٰى اَنْبِيَائِهِمْ ـ

"তোমাদের আগে যারা ছিল, তারা অতিরিক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে এবং নবীদের সাথে মতবিরোধ সৃষ্টি করে ধ্বংস হয়ে গেছে।[৬৬]" তিনি আরো বলেন ঃ

اِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ وَلَنْ يُّشَادَّ الدِّيْنَ اَحَدٌ اِلاَّ غَلَبَهُ

"দীন হচ্ছে সহজ; কিন্তু যে ব্যক্তি দীনে জটিলতা সৃষ্টি করে, দীন তাকে পরাভূত করে।"[৬৭]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা জানা যায় যে, শরী'আতের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ সহজ সাধ্যতার নীতি অবলম্বন করেছেন।

তৃতীয় মূলনীতি ঃ পর্যায়ক্রম

কুরআনী বিধানসমূহ ২৩ বছর সময়কালে অবস্থা ও চাহিদা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে নাযিল হয়। বিধানসমূহ 'আকীদা বিশ্বাস ও ইবাদত-বন্দেগীর সাথে সম্পর্কিত ছিল। পরে অবতীর্ণ বিধানগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল পারিবারিক সামাজিক, তমদ্দুনিক এবং রাষ্ট্রিয় বিষয়াদি। আকাইদ শিক্ষা ও ইবাদত অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও

৬৫. দারে কুতনী মিশকাত থেকে কিতাবুল ইতিসাম।

৬৬. মুসলিম।

৬৭. বুখারী ও মিশকাত, বাবু কাসদিল আমল।

সামাজিক জীবন যতই সুগঠিত হতে থেকেছে এবং মানুষের গ্রহণ ক্ষমতা ও সহনশীলতা যতই বেড়েছে, ততই সেই অনুপাতে তার জন্য তেমন খাদ্যের ব্যবস্থাও হয়েছে। যেমন প্রথম দিকে শিশুর জন্য শুধু তরল দুধের ব্যবস্থা করা হয় এবং পরে ক্রমে ক্রমে অপেক্ষাকৃত অধিকতর পুষ্টিকর অথচ গুরুপাক খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয় শিশুর শারীরিক চাহিদা ও হজম শক্তির বিবেচনায়, তেমনি শরী'আতের আদেশ-নিষেধও পর্যাক্রমে অবতীর্ণ হয়েছে। শিশুকে ক্ষতিকর খাদ্য ও অভ্যাস থেকেও বিরত রাখা হয়। অনুরূপভাবে শরী'আতের আহকাম এমন কি নামায-রোযা যাকাত, হজ্জ ইত্যাদির আদেশসমূহ এবং মদ, ব্যভিচার, জুয়া ইত্যাদির নিষেধমূলক বিধানসমূহের ক্ষেত্রেও এই পর্যায়ক্রমিকতা নীতি অবলম্বিত হয়েছে।

উপরোল্লিখিত নীতি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিধানদাতাদের মধ্যে একটি মানসিক প্রেক্ষাপট সৃষ্টি করে। আর তা হচ্ছে এই যে, সমাজবদ্ধ জীবনে শৃঙখলা, কল্যাণ আর শান্তির গরজে আইনের চাহিদা সৃষ্টি হয় এবং মানুষের সহজাত ও অভিজ্ঞতা প্রসূত শান্তি প্রবণতা এবং কল্যাণকামিতা থেকেই আইনের উদ্ভব হয়। সেই আইনই সফল হয় যা মানুষের প্রকৃতি ও অভিজ্ঞতা-প্রবণতাগুলির সাথে সামঞ্জস্য রাখে। মানবের পরিপূর্ণ জীবন বিধান ইসলামের আহকাম প্রবর্তনের মূলে এই যে পর্যায় ক্রমিতানীতি, তা-ও পরিপূর্ণতার দাবীদার এবং মহানায়ক রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَدَعْ شَيْئًا مِنَ الْكَرَامَةِ وَالْبِرِّ اِلاَّ اَعْطَاهُ هٰذِهِ الْاُمَّةَ وَمِنْ كَرَامَتِهِ وَاِحْسَانِهِ اَنَّهُ لَمْ يُوْجِبْ عَلَيْهِمْ الشَّرَائِعَ دَفْعَةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ اَوْجَبَ عَلَيْهِمْ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ ـ

"মর্যাদা ও কল্যাণের হেন বস্তু নেই যা আল্লাহ্ এই উম্মতকে দান করেননি। শরী'আত ব্যবস্থা (বিধি-বিধান) তিনি একই সংগে নাযিল করেননি; বরং পর্যায়ক্রমে একেরপর এক ওয়াজিব করেছেন, এটিও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও মেহেরবানী।"[৬৮]

এই প্রসংগে হযরত আয়েশা (রা)-এর নিম্নলিখিত বাক্যগুলি অত্যন্ত সুস্পষ্ট পথ নির্দেশক ঃ

انما نزل اول مانزل سور من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى اذا ثاب الناسُ الى الاسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل اول بنتى لاتشربوا الخمر لقالوا لاندع الخمر ابدا ولو نزل لاتزنوا لقالوا لا ندع الزنا ابدًا ـ

৬৮. কুরতুবী ৩য় খণ্ড ৫২ পৃষ্ঠা।

"প্রথমে মুফাস্‌সাল (مُفصل) সূরাগুলি (সূরা হুজুরাত থেকে কুরআনের শেষ পর্যন্ত) নাযিল হয়। সেগুলিতে জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা রয়েছে। তারপর লোকেরা যখন ইসলামের দিকে এগিয়ে এলো তখন হালাল ও হারামের বিধানগুলি নাযিল হয়। যদি মদ্য পান নিষেধের বিধানটি প্রথম দিন নাযিল হতো তাহলে লোকেরা বলতো, আমরা কখনো মদ ছাড়বো না। অনুরূপভাবে প্রথম দিনই যিনা হারাম হবার বিধান নাযিল হলে লোকেরা বলে উঠতো, আমরা কখনো যিনা থেকে বিরত হবো না।"[৬৯]

আইন প্রবর্তনের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব পর্যায়ক্রমিক কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। তাছাড়া শুরুতে আইনের সংখ্যা কম হওয়া উচিত, যাতে সহজে সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যেতে পারে এবং তা বাস্তবে মেনে চলার ক্ষেত্রে বেশি সমস্যা ও সংকটের সৃষ্টি না হয়। বাস্তব জীবনে আইনের রূপায়নের দৃষ্টান্ত স্থাপন এবং মানুষকে আইনানুগ জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করা সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং সাহাবা (রা) তাই ত করেছিলেন সবিশেষ নিষ্ঠার সাথে।

চতুর্থ মূলনীতি ঃ নাস্‌খ

نَسخ -এর আভিধানিক অর্থ ঃ মুছে ফেলা, রহিত করা, কপি করা ..... ফিক্‌হের পরিভাষায় নস্‌খের দুটি অর্থ ঃ

এক. প্রথম হুকুমটি পরবর্তী হুকুমটি দ্বারা পুরোপুরি রহিত হয়ে যাবে।

দুই. অবস্থা ও চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রথম হুকুমটিতে কোনো প্রকার পরিবর্তন পরিবর্ধন সাধিত হবে। অর্থাৎ প্রথম হুকুমটি যদি 'আম' (عَام) তথা ব্যাপক হয় তাহলে 'খাস' (خَاص) তথা বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করতে হবে, মুতলাক (مُطلق = নিঃশর্ত, absobute) 'মুকায়াদ' (مُقيد = শর্ত সাপেক্ষ) হয়ে যাবে। মোটকথা পদ্ধতি অনুযায়ী প্রথম হুকুমটিকে সীমিত অর্থে গ্রহণ এবং প্রয়োগ করাই হচ্ছে দ্বিতীয় প্রকার নস্‌খ।

প্রথম প্রকারের নাস্‌খ-এর সম্পর্ক পূর্ববর্তী নবীদের শরী'আতের সাথে, যেমন– নিম্নোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ مِثْلِهَا (البقرة : ١٠٦)

"আমরা (আল্লাহ্) যে আয়াত নাকচ করি অথবা ভুলিয়ে দিই, তার চাইতে উত্তম বা সমতুল্য আয়াত তদস্থলে নাযিল করি।[৭০]"উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী নবীদের শরী'আত

৬৯.বুখারী ২য় খণ্ড ৭৪৭ পৃষ্ঠা।

৭০. আহকামুল কুরআন।

মানসূখ (مَنسوخ = রহিত) হয়েছে বললে বুঝতে হবে, মৌলিক 'আকাইদ যথা তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত ইত্যাদি এবং মুখ্য আহকাম যথা সালাত, সাওম, যাকাত ইত্যাদি বাদে অন্যান্য আহকাম রহিত হয়েছে। উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে গবেষক মুফাস্‌সিরগণের মত প্রতিফলিত হয়েছে আবূ বক্‌র, জাস্‌সাস (র)-এর নিম্নোক্ত কথায় ঃ

اِنَّ مَا ذُكر فيها من النسخ فانما المراد به نسخ شرائع الانبياء المتقدمين ـ

"এই আয়াতে যে নস্‌খের কথা বলা হয়েছে তাতে পূর্ববর্তী নবীগণের শরী'আত মান্‌সুখ (منسوخ = নাকচ) হবার কথা বুঝানো হয়েছে[৭১]।"

দ্বিতীয় প্রকারের নাসখের সম্পর্ক শরী'আতে মুহাম্মদীয়ার সাথে। কিন্তু এই নস্‌খের অর্থ আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং প্রয়োগ নির্ধারণ। ফকীহ্‌গণের মতে এই নাসখের অর্থ 'বয়ান' (বর্ণনা বা ব্যাখ্যা)। এতে কোন আয়াতের হুক্‌ম একেবারে নাচক বা রহিত হওয়া বোঝায় না। উলামা-এ সালাফ (عُلماء سَلف = পূর্ববর্তী যুগ)-এর মত হচ্ছে ঃ

هو رفع الظاهر لتخصيص او تقييد او شرط او مانع فهذا اكثر من السلف يُسمّيه نسخا ـ

(নাস্‌খের অর্থ হচ্ছে) দৃশ্যমান (শাব্দিক) অর্থের বর্জন تخصيص বা সীমিত করণের দরুন। কিংবা تَقييد বা শর্তারোপের মাধ্যমে অথবা مانع বা প্রতিবন্ধকতার কারণে– এটিই উলামা-ই-সালাফের অধিক সংখ্যকের মতে নস্‌খ নামে অভিহিত।[৭২]

আল্লামা ইব্‌ন কায়্যিম (র)ও অনুরূপ মত প্রকাশ করেন।

যেহেতু কুরআনী বিধাসমূহ সামাজিক অবস্থার ভিত্তিতে ২৩ বছর ধরে পর্যায়ক্রমে নাযিল হয়েছে; সুতরাং পরিবেশ ও পরিস্থিতির অজুহাতে কোনো বিধানকে পুরোপুরি বাতিল করে দেবার প্রশ্নই উঠতে পারে না। এক্ষেত্রে অবস্থা ও চাহিদার বিবেচনায়, অথচ শরী'আতের রূহ্‌ (প্রাণসত্তা) ও উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ন রেখে কোন বিধানকে সম্প্রসারিত করা বা তার ব্যাপকতা খর্ব করা অথবা অনুরূপ প্রয়োগিক ব্যবস্থা করাই হবে নাসখের উদ্দেশ্য। এই ব্যবস্থাতে রয়েছে ইসলামী ফিকহের বিবর্তন এবং যুগোপযোগিতা যা তাকে প্রতি যুগে চূড়ান্ত ফায়সালা দান করার ক্ষমতায় সমুন্নত করেছে। এ প্রসংগে হযরত শাহ অলিউল্লাহ (র)-এর একটি ব্যাখ্যা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

---

৭১. তাওযীহ তালবীহ ৩৩ পৃষ্ঠা ইত্যাদি।

৭২. আ'লামুল মুকিয়ীন।

তিনি বলেন ঃ

والثانى ان يكون شيئ مظنّةً مصلحة او مفسدةٍ فيحكم عليه حسب ذلك ثم يأتى زمان لايكون فيه مظنة لها فيتغير الحكم ـ

"দ্বিতীয় (প্রকার নাস্‌খটি) হচ্ছে সম্ভাব্য কল্যাণের আশা বা ক্ষতির আশংকা দেখা দিলে তদনুযায়ী বিধান দান করা, পরবর্তী কালে যখন সে সম্ভাবনা না থাকে তখন বিধান পাল্টে দেওয়া।[৭৩]

একে প্রকৃত নস্‌খ বলা যায় না। কারণ, যে সামাজিক অবস্থার কারণে কোনো বিধানের ব্যাপকতা সীমিত করা হলো বা অন্য কোন পদ্ধতিতে নাস্‌খ করা হলো, সে অবস্থার অবসান হয়ে যদি পূর্বের অবস্থা ফিরে আসে, তখন বিধানের ব্যাপকতা বা পূর্বাবস্থাও ফিরে আসবে, কিন্তু প্রকৃত নাস্‌খ হলে বিধানের পুনরাবর্তন সম্ভব হতো না। পূর্ববর্তী নবীগণের শরী'আতের নাস্‌খ প্রকৃত নাস্‌খ। সুতরাং সে সব শারী'আত পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবে না।

অভিজ্ঞ ও পারদর্শী চিকিৎসক যেমন রোগের সাময়িক নতুন উপসর্গ ঠেকাবার জন্য ঔষধ বদলে দেন, আবার যখন রোগের পূর্ববর্তী অবস্থা ফিরে আসে তখন পূর্বের ব্যবস্থা বহাল করেন, শারী'আত-ই মুহাম্মদিয়ার নাস্‌খও তদ্রূপ।

নাস্‌খের উপরোক্ত আলোচনা থেকে একটি নীতির সন্ধান মিলে; সেটি হচ্ছে মুহাক্‌কিক অর্থাৎ গবেষকগণের সাথে পরামর্শক্রমে, সাময়িক সামাজিক কল্যাণ ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আইন-প্রয়োগ কর্তৃপক্ষ কোন কোন আহকামের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করতে পারে, যেমন 'উলামায়ে সালাফ (سَلف)-এর যুগে এই নীতির ভিত্তিতে কাজ হয়েছিল। কাযী বাইদাবীর নিম্নলিখিত উক্তি একথারই ইংগিত বহন করছে ঃ

وذلك لان الاحكام شرعت والايات نزلت لمصالح العباد وتكميل نفوسهم فضلا من اللّه ورحمة وذلك يختلف باختلاف الاعصار والاشخاص كاسباب المعاش فان النافع فى عصر واحد يضر فى غيره

"(নাস্‌খ বৈধ এজন্য যে,) আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও মেহেরবানীতে, বান্দারে কল্যাণ ও প্রয়োজনে এবং তাদের নফসের পরিপূর্ণতার জন্য আহকাম বিধিবদ্ধ হয়েছে, আয়াত নাযিল হয়েছে; আর এই কল্যাণ ও প্রয়োজন ব্যক্তি ও যুগের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন জীবন ধারণের উপায়-উপকরণ বিভিন্ন হয়। এক যুগে যেসব উপায় উপকরণ উপকারী হয়, তা অন্য যুগে হতে পারে ক্ষতিকর।"[৭৪]

৭৩. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ১ম খণ্ড ১২২ পৃষ্ঠা।

৭৪. বাইদাবী ৯৮ পৃষ্ঠা।

হযরত উমর (রা)-এর 'একক সিদ্ধান্তবলী' এ প্রসংগে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি আসলে এমন ধরনের 'একক সিদ্ধান্ত' নয়, যা কারো কিয়াস ও রায়ের ভিত্তিতে স্থাপিত হবার কারণে তার গুরুত্ব কম হয়ে যায়। বরং এই নাস্‌খ নীতির আওতায় শরী'আতের রূহ বা প্রাণশক্তি ও উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ন রেখে, কুরআনী বিধানসমূহকে পরিবর্তিত অবস্থার সাথে খাপ খাওয়াবার প্রয়াসের সর্বোত্তম উদাহরণ ছিল। পরবর্তীদের জন্য হযরত উমর (রা)-এর একক সিদ্ধান্তগুলো পথ নির্দেশকের ভূমিকা পালন করেছে। এই নাস্‌খ নীতি থেকেই ফকীহ্‌গণ ইস্‌তিহ্‌সান, ইস্‌তিস্‌লাহ্‌, তা'দীল تَعديل (ভারসাম্য রক্ষা) ইত্যাদি মূলনীতিসমূহের উদ্ভাবন করেছেন এবং সেগুলিকে 'আইনের উৎস' সমূহের অন্তর্ভুক্ত বলে স্থির করেছেন।

'রদ্দুল মুহতার' প্রমুখ ফিক্‌হ গ্রন্থগুলিতে এমন অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যাতে জনকল্যাণের ভিত্তিতে আইন-প্রয়োগ কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও ইখতিয়ার খুবই ব্যাপক বলে মেনে নেয়া হয়েছে। এমন কি ইসলামী রাষ্ট্রের আইন-প্রয়োগ কর্তৃপক্ষ কোন কোন জায়িয ব্যাপারকে সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ করতে পারে কিংবা মুলতবী ঘোষণা করতে পারে এই নাস্‌খ নীতির প্রেক্ষিতে। ফকীহগণ আইনের ব্যাপকতা সীমিতকরণ (تَعميم وتَخصيص) ইত্যাদি নাস্‌খ নীতি প্রয়োগের যে সব পদ্ধতি স্থির করেছেন সেগুলিকে সাকুল্যে বর্জন করলে লাগামহীন বুদ্ধিবৃত্তি ও ইচ্ছা-প্রবণতার বিধ্বংসী পরিণাম থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় থাকে না।

পঞ্চম মূলনীতি ঃ শানেনুযূল অর্থাৎ আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট

শানে নুযূল বিশেষ ঘটনা নয় বরং অবস্থা ও পরিস্থিতি। কুরআনের সূরা ও আয়াতগুলিকে মক্কী ও মাদানী এই দুই ভাগে বিভক্ত করা থেকে সাধারণভাবে এবং শানে নুযূল থেকে বিশেষভাবে অবতীর্ণ আয়াত এবং সূরার বক্তব্য বিষয়সমূহের প্রেক্ষাপট ও পরিবেশ নির্ধারণ করা যায়, তবে শানেনুযূলের আওতায় যে সব ঘটনা বর্ণনা করা হয়, আয়াতের লক্ষ্যবস্তু সে সব ঘটনা নয়, বরং লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে জনগণের অবস্থা ও পরিস্থিতি যা বর্ণিত ঘটনাবলী থেকে পরিস্ফুট হয় এবং যে পরিস্থিতির মুকাবিলায় সংশ্লিষ্ট আয়াত নাযিল হয়। অর্থাৎ সমাজ যেসব অবস্থা ও সমস্যার সম্মুখীন হয় এই ঘটনাবলী সেগুলিরই প্রতিনিধিত্ব করে এবং সেগুলিকে চিহ্নিত ও উপলব্ধি করার ব্যাপারে ঘটনাগুলি তথ্য সরবরাহ করে।

বর্ণিত এই ঘটনাবলী নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হবে ঠিক ততখানি, যতখানি কুরআন মজীদের স্পষ্ট বাক্যগুলির সমর্থন থাকবে তাদের পেছনে। যদি কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় শব্দ ও অর্থ থেকে যা প্রকাশিত হয় এই ঘটনাবলী তার বিরুদ্ধতা করছে অথবা কোন মূলনীতির উপর আঘাত হানছে, তাহলে বর্ণিত ঘটনাবলী কোন গুরুত্ব

লাভ করবে না। বরং সেক্ষেত্রে কুরআনের আয়াতই হবে স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী। এ কারণে বিজ্ঞ মুফাস্‌সিরগণের মতে প্রকৃত শানেনুযূল হচ্ছে যা আয়াতের পূর্বাপর সম্বন্ধ এবং শব্দ ও অর্থের মধ্য থেকে ভেসে ওঠে। আল্লামা সুয়ূতীর বক্তব্য এ কথা সমর্থন করে ।

"যারকাশী (র) 'বুরহান'-এ লিখেছেন, সাহাবা (রা) ও তাবেঈগণ (র) সাধারণত বলতে অভ্যস্ত ছিলেন, অমুক আয়াত অমুক বিষয়ে নাযিল হয়েছে। এর অর্থ হয়, উক্ত আয়াতটি ঐ বিধান সম্বলিত অর্থাৎ আয়াতটি বিধানেরই প্রমাণ। আয়াতের মাধ্যমে ঘটনার বর্ণনা উদ্দেশ্য হয় না এবং ঘটনাটি আয়াতটি নাযিলের কারণও হয় না। ..... আমি বলি, ঘটনা যে সময় সংঘটিত হয়েছে আয়াতটি ঠিক সেই সময় নাযিল হওয়া অপরিহার্য নয়। "৭৫

ষষ্ঠ মূলনীতি ঃ হিক্‌মত (حِكْمَة) ও 'ইল্লাত (عِلَّة)-এর বিবেচনা

কুরআনের বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে হিকমত ও ইল্লাতের আলোচনা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও গভীর। এ দু'য়ের কারণে অতীতের সাথে বর্তমানের সম্পর্কচ্ছেদ হয় না। উম্মতের শ্রেষ্ঠ মনীষী ও চিন্তাবিদগণ এ প্রসঙ্গে বিরাট অবদান রেখেছেন। তাঁরা কুরআনী শিক্ষাকে মানব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল প্রমাণ করে এই জীবন বিধানের চিরন্তনতা ও সর্বজনীনতা সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন।[৭৬] এ প্রসঙ্গে মৌলিক কথা হচ্ছে, যতক্ষণ পর্যন্ত কুরআন হাকীমের ভাবধারাগত ও বাস্তব ব্যবস্থার ওপর গভীর দৃষ্টির অধিকারী হওয়া যাবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত হিক্‌মত ও ইল্লাত সন্ধানের ক্ষেত্রে সঠিক দৃষ্টিকোণ সৃষ্টি হতে পারে না। সঠিক দৃষ্টিকোণ সৃষ্টির জন্য গবেষককে অন্য সব বিষয়ের মধ্যে কুরআন মজীদে বর্ণিত নিম্নোক্ত ব্যাপারগুলির উপর অধিকতর গুরুত্ব দিতে হবে ঃ

১. দীন ও দুনিয়ার সম্পর্ক, ২. জীবন ও মৃত্যুর আত্মিক যোগাযোগ, ৩. দুনিয়া ও আখেরাতে পুরস্কার ও শাস্তির বিধান, ৪. মানসিক পরিচ্ছন্নতা অর্জনের নীতি, ৫. প্রকৃত সাফল্য ও কল্যাণের পথ, ৬. মানব প্রকৃতি, ৭. ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের চৌহদ্দি, ৮. জীবনের বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কিত বিধান, ৯. পথ প্রদর্শনের পর্যায়ক্রম এবং তার ক্রমবিবর্তন, ১০. জাতীয় স্বার্থ ও রাজনীতি এবং ১১. বিধান উদ্ভাবনের (اِستنباط = deduction) /পদ্ধতি ইত্যাদি (এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা 'কিয়াস' অধ্যায়ে করা হবে।)

---

৭৫. মুকাদ্দিমা তাফসীর নিয়ামুল কুরআন, ২৪ পৃষ্ঠা।

৭৬. এ ব্যাপারে হযরত শাহ অলীউল্লাহ (র)-এর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বা-লিগা ' অত্যধিক গুরুত্বের অধিকারী।

কুরআন হাকীমে এমন বহু বিধান রয়েছে, যার মধ্যে ইল্লাত বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। ফকীহ্‌গণ সেগুলি থেকে দলীল-প্রমাণ গ্রহণ ও বিধান উদ্ভাবনের যেসব পদ্ধতি নির্ধারিত করেছেন, সে সম্পর্কে জ্ঞান থাকা জরুরী। অন্যথায়, নির্দিষ্ট সীমানা ও শর্তের প্রতি দৃষ্টি না থাকার দরুন, ভুল দলীল-প্রমাণ উপস্থাপনের পরিণাম বিভ্রান্তিকর হয়ে যেতে পারে। অনুরূপভাবে আদেশ ও নিষেধের ব্যাপারে কুরআন হাকীম যে বর্ণনাশৈলী অবলম্বন করেছে তাও যথেষ্ট গুরুত্বের অধিকারী। গন্তব্যে উপনীত হবার ব্যাপারে তা যথেষ্ট সাহায্য করে।

সপ্তম মূলনীতি ঃ 'আরবের সামাজিক অবস্থার জ্ঞান

কুরআন হাকীমের খুঁটিনাটি (جُزئيات) বিধানের প্রেক্ষিতে 'আরবের সামাজিক অবস্থার খতিয়ান নিলে দেখা যাবে বিধানগুলিতে আরবের তদানীন্তন সামাজিক অবস্থাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আসলে এই আলোচনা আল্লাহ্‌র হিদায়াতের ধরন ও গুণগত অবস্থার সাথে সম্পর্কিত। তাই নিচে এ সম্পর্কে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে।

আল্লাহ্‌র হিদায়াতের সামনে সব সময় দু'টি উদ্দেশ্য দেখা গেছে ঃ

১. মানসিক ও আত্মিক সংস্কার এবং

২. সামাজিক ও সংস্কৃতিক কল্যাণ ও সাফল্য।

এই দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র হিদায়াতে ভিন্ন ভিন্ন মর্যাদাসম্পন্ন দুই ধরনের আইন পাওয়া যায় ঃ

১. যার প্রাণশক্তি ও কায়া অর্থাৎ অর্থ ও বাহ্যিক আকৃতি উভয়টিই শরী'আত নির্ধারণ করেছে এবং উভয়কে উদ্দেশ্যরূপে গণ্য করেছে।

২. যার কেবলমাত্র প্রাণশক্তিই উদ্দেশ্য, বাহ্যিক আকৃতি উদ্দেশ্য নয়।

প্রথম ধরনের আইন অপরিবর্তনীয় এবং একই অবস্থায় বিরাজিত থাকবে। কোন প্রকার পরিবর্তন হতে পারে না। আর দ্বিতীয় ধরনের আইনগুলি যেহেতু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন অবস্থা ও সময়ের সাথে সম্পর্কিত, তাই অবস্থার পরিবর্তন ও তমদ্দুনিক উন্নতির সাথে সাথে তাদের আকার-আকৃতি পবিবর্তিত হতে পারে। আইন প্রবর্তকের পক্ষ থেকে কেবলমাত্র তাদের প্রাণশক্তির স্থায়িত্বের দাবি করা হয়। শাহ অলিউল্লাহর নিম্নোক্ত বক্তব্য এদিকে ইঙ্গিত করে ঃ

ان الشرائع لها معدات واسباب تشخصها وترجع بعض محتملاتها على بعض -

"সব শরীয়তেরই কতগুলি কার্যকারণ থাকে। সেগুলি বিধানের আকৃতি নির্ধারণ করে এবং এক সম্ভাবনাকে অন্য সম্ভাবনার ওপর অগ্রাধিকার দেয়।"[৭৭]

---

৭৭. হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ্ ২৭-৯২ পৃষ্ঠা।

অন্যত্র তিনি বলেছেন ঃ

يعتبر فى الشرائع علوم مخزونة فى القوم واعتقادات كامنة فيهم وعادات تتجارى فيهم ـ[১]

"শরীয়ত প্রবর্তনের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় জাতির সঞ্চিত জ্ঞান, তাদের অন্তর্নিহিত আকীদাসমূহ এবং তাদের আচার ও আচরণ যার শিকড় তাদের গভীরে প্রোথিত থাকে।"[৭৮]

উপরোক্ত প্রথম প্রকারের আইনগুলির মর্যাদা রূহ ও ভিত্তির পর্যায়ভুক্ত। তারই মাধ্যমে দ্বিতীয় প্রকারের আইনের পলিসি এবং সাংস্কৃতিক কল্যাণের সঠিক দৃষ্টিকোণ নির্ধারিত হয়।

দ্বিতীয় প্রকার আইনে আরবের সামাজিক অবস্থার প্রভাব

একটি সর্বসম্মত বিষয় এই যে, দুনিয়ার কোন আইনই সমকালীন সমাজের রীতি-নীতি ও আচার-আচরণ দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। এ জন্য অনিবার্যভাবে আরবের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার প্রভাব হিদায়েতে ইলাহীর ওপর পড়েছে। কোন আইন প্রণেতা বা আইন প্রণয়ন পরিষদ যখন কোন দেশের জন্য আইন রচনায় মনোনিবেশ করেন, তখন স্বাভাবিকভাবে সর্বপ্রথম তিনি বা তাঁরা সংশ্লিষ্ট দেশের পূর্ব প্রচলিত বিধি-বিধান ও রীতি-নীতির প্রতি নজর দেন, কিছু অংশকে হুবহু গ্রহণ করেন, কিছু অংশ সংস্কার করে গ্রহণ করেন এবং কিছু অংশ পুরোপুরি বর্জন করে দেন। আল্লাহ্‌র হিদায়াত প্রচারের ক্ষেত্রেও একই কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করা অপরিহার্য।

আল্লাহ্‌র হিদায়াতে প্রচলিত বিধান ও রীতির বিবেচনা

কিন্তু প্রচলিত বিধান ও রীতি গ্রহণ ও পরিত্যাগ করার ব্যাপারে হামেশা দু'টি বিষয় দৃষ্টিপথে থাকে ঃ

এক, গ্রহণ ও বর্জনের প্রতিটি পর্যায়ে সামাজিক পরিস্থিতি ও গণ-চেতনার অবস্থা সঠিকভাবে নির্ণয় করা।

দুই, যেসব আইন ও রীতি-নীতি গ্রহণ করে নেয়া হয়, সেগুলিকে আল্লাহ্‌র হিদায়াতের প্রাণরসে সিক্ত করা অর্থাৎ সেগুলিকে আল্লাহ্‌র হিদায়াতের ছাঁচে এমনভাবে ঢালা হয়, যার ফলে সেগুলি আল্লাহ্ প্রদত্ত ব্যবস্থায় যথাযথভাবে খাপ খেয়ে যায়।

---

৭৮. হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ্ ২৭-৯২ পৃষ্ঠা।

কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত থেকে এই বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায় ঃ

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِّبَنِيْ اِسْرَائِيْلَ اِلاَّ مَاحَرَّمَ اِسْرَائِيْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ ـ

"সমস্ত খাদ্যবস্তু বানূ ইসরাঈলের জন্য হালাল ছিল, তবে যে খাদ্যবস্তু ইসরাঈল (য়া'কূব আলাইহিস সালাম) নিজেই নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন তা ছাড়া।"

বোঝা যায় য়া'কূব (আ) বিশেষ বিশেষ অবস্থা দৃষ্টে কতিপয় খাদ্যবস্তু হারাম করে নিয়েছিলেন। নূহ (আ)-এর জাতি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিল। তাদের যৌন শক্তি সংযত করা ও মেযাজে ভারসাম্য সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে রোযা ইত্যাদির বিধান কঠিন করে দেয়া হয়েছিল। অনুরূপভাবে, মূসা (আ)-এর জাতি ছিল অত্যন্ত বিদ্রোহী স্বভাবের অধিকারী। তাদের মেযাজে ভারসাম্য সৃষ্টি করার জন্য কঠোর অনুশাসন প্রবর্তিত হয়েছিল। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا ـ (النساء : ١٦٠)

"য়াহুদীদের যুলুমের কারণে আমি কয়েকটি জিনিস তাদের ওপর হারাম করে দিয়েছি, যা (ইতিপূর্বে) তাদের জন্য হালাল ছিল; এজন্যও যে, তারা লোকদেরকে আল্লাহ্‌র পথে চলতে অনেক বেশি বাধা দিতো।" (নিসা ঃ ১৬০)

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও বিভিন্ন মেযাজ ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সব চাইতে বড় নেকী কোন্‌টি, তাদের এই প্রশ্নের বিভিন্ন জবাব দিয়েছেন। যেমন কোন ব্যক্তিকে বলেছেন, পিতামাতার সেবাই সবচেয়ে বড় নেকীর কাজ। কাউকে বলেছেন, জিহাদ, কাউকে ইহ্‌সান তথা আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক গভীরতর করাকে বৃহত্তম নেকী বলেছেন। এভাবে তিনি যে ব্যক্তির জন্য যে জিনিসটির প্রয়োজন বোধ করেছেন, সেই জিনিসটির ওপরই বেশি জোর দিয়েছেন। অবস্থার পরিবর্তনে আইন ও বিধানের মধ্যে পরিবর্তনের দৃষ্টান্তও বহু হাদীসে পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই।

নবীগণ জাতির চিকিৎসক

আসলে নবীগণ হচ্ছেন জাতির চিকিৎসক। তাঁরা জাতির রোগ ও মেযাজ অনুযায়ী খাদ্য ও ঔষধ গ্রহণের পরামর্শ দেন।

শাহ অলীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী বলেন ঃ

انما مثله كمثل الطبيب يعمل الى خفظ المزاج المعتدل فى جميع الاحوال فتختلف احكامه باختلاف الا شخاص والزمان فيأمر

الشاب بمالا يأمر الشائب ويأمر فى الصيف بالنوم فى الجو لما يرى ان الجو مظنة الاعتدال حينئذ ويامر فى الشتاء النوم داخل البيت لما يرى انه مظنة البرد حينئذ ـ

"রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে, যেমন একজন চিকিৎসক, যিনি সর্বাবস্থায় ভারসাম্যপূর্ণ মেযাজ সংরক্ষণের কাজে নিয়োজিত থাকেন, তাঁর ব্যবস্থা বিভিন্ন ব্যক্তি ও সময়ের বিবেচনায় ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। যুবকের জন্য তিনি যে ব্যবস্থাপত্র দেন বৃদ্ধের জন্য হুবহু একই ব্যবস্থাপত্র দেন না। গরমকালে উন্মুক্ত স্থানে ঘুমাবার পরামর্শ দেন, শীতকালে ঘরের মধ্যে শয়ন করার নির্দেশ দেন, অবস্থা ভেদে যা ভারসাম্য বজায় রাখার অনুকূল।[৭৯]

রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপত্র প্রদানের সীমারেখা

কিন্তু রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপত্র প্রদানের ব্যাপারে আম্বিয়া (আ)-এর ভূমিকা না এমন পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হয়, যাতে তাঁরা নিজেদের ইচ্ছামতো যে কোন নীতি-নিয়ম নির্ধারণ করার অধিকারী হন, আবার তাঁরা এমন একেবারে অধীনও নন, যাতে প্রত্যেকটি ছোট-বড় ফায়সালার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নির্দেশের মুখাপেক্ষী থাকতে হয়; বরং অহীর মাধ্যমে তাঁদেরকে আল্লাহ্‌র হিদায়াতের মূলনীত জানিয়ে দেয়া হয়। কোন ব্যাপারে সুস্পষ্ট হিদায়াত এসে গেলে ভাল, অন্যথায় তাঁরা উপরোল্লিখিত মূলনীতির আলোকে নিজেদের ইজতিহাদের মাধ্যমে ফায়সালা প্রদান করেন। তাঁদের ফায়সালা হিদায়েতে ইলাহীর মর্যাদা প্রাপ্ত হয়– যদি কোন বিশেষ কল্যাণ বা ব্যাপারের কারণে এই ফায়সালাও খতম হয়ে যায় অথবা উহাকে মূলনীতি করে দেয়া হয়। অন্যথায় অন্যান্য ইলাহী আইনের ন্যায় এই ফায়সালার কার্যকারিতাও বর্তমান থেকে যায়।

ইজতিহাদী ভুল সম্পর্কে অবহিতি

যদি কোন সময় অবস্থা পর্যালোচনার ব্যাপারে নবীগণের পদস্খলন হয়ে যায়, যার ফলে কোন অ-উত্তম ফায়সালা গৃহীত হয়ে যায়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহ্ তাঁদেরকে সে সম্পর্কে অবহিত করেন এবং সংশোধনের ব্যবস্থা করেন। কুরআনের বেশ কয়েকটি উদাহরণে দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সমষ্টিগত ব্যাপারে 'রাহমত' -এর প্রেরণায় কোন নির্দেশ দেন, অথচ 'আদল' অর্থাৎ ইনসাফের বিবেচনায় নির্দেশটি যথাযথ ছিল না, এমতাবস্থায় অহীর মারফত তাঁকে আল্লাহ্ সে ব্যাপারে অবহিত করেন। অথবা ব্যক্তিগত ব্যাপারে তিনি এমন কোন কাজ করেন, যা তাঁর মর্যাদার

---

৭৯. হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ্ ঃ ৮৮ পৃষ্ঠা।

সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে এ ব্যাপারে অবহিত করা হয়। এই কথাটি বলে তিনি পরোক্ষে স্বীকার করলেন যে, উদাহরণ দিলে ভাল হয়; না দেওয়ার কথাটা বলে মনোকষ্ট বাড়ানো অযৌক্তিক। অতএব নিঃসন্দেহে আমরা এ কথা বলতে পারি যে, নবীগণ ভুল ও স্খলন থেকে সংরক্ষিত থাকেন এবং দীনের ব্যাপারে যে সব কথা তাঁরা বলেন সেগুলির মর্যাদা ঠিক নিম্নোক্ত পর্যায়ের ঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى -

(অর্থাৎ তিনি নিজের মনগড়া কোন কথা বলেন না, যা কিছু তিনি বলেন, তা সবই তাঁর কাছে আল্লাহ্‌র প্রেরিত অহী)

আল্লামা ইব্‌ন কায়্যিম (র) বলেন ঃ

ان الراى انما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبابان الله كان يُريه وانما هو منا الظن والتكليف -

দীনের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর রায় সঠিক হবার কারণ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্‌ তাঁকে পথ দেখিয়ে থাকেন। অন্য দিকে আমাদের রায় আমাদের ধ্যান-ধারণার ফসল এবং হুকুম পালনের ব্যাপার।[৮০]

মোটকথা, পূর্বের বহু বিধান, রস্‌ম-রেওয়াজ এবং জনগণের পছন্দনীয় ও প্রিয় বিষয় আইনের মর্যাদা লাভ করে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অংশে পরিণত হয়।

শেষ হিদায়াতের সময় আরবের প্রচলিত আইনের স্বরূপ

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর আবির্ভাবকালে আরবে নিম্নোক্ত ধরনের আইন ও বিধান জারী ছিল ঃ

১. বাদীর কাছ থেকে তার দাবির প্রমাণের জন্য সাক্ষী চাওয়া হতো। সাক্ষী না থাকলে এবং বিবাদী বাদীর দাবি অস্বীকার করলে বিবাদীকে কসম করতে হতো।

২. অপরাধের দণ্ড বিধানের নীতি ছিল প্রতিশোধমূলক। আর এটা দীয়াত (دِيَة) (শোণিত পণ) বা مُعَاوَضَة (মোআবিদা) ক্ষতিপূরণের আকারেও হতে পারতো। চোরের ডান হাত কাটার রেওয়াজ ছিল। যিনাকারীর শাস্তি নির্ধারিত ছিল পাথরের আঘাতে হত্যা। কিন্তু পরবর্তী কালে বিশ ঘা চাবুক মারা ও মুখে চুনকালি মাখিয়ে ফেরানো হতো।

৩. বিয়েতে ঈজাব এবং কুবূলের পদ্ধতি প্রচলিত ছিল এবং অন্যান্য পদ্ধতিরও প্রচলন ছিল। যথা সাময়িক বিবাহ বা مُتْعَة (মুত'আ) যে কারণে ব্যভিচারের প্রসার ঘটতো এবং পারিবারিক বন্ধন ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত। অনুরূপভাবে স্ত্রীদের কোন সংখ্যা

৮০. ই'লামুল মূশিঈন ঃ ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২।

নির্ধারিত ছিল না, নিজেদের ইচ্ছায় বিয়ে করার অধিকার মেয়েদের ছিল না। কোন কোন মাহরাম (যার সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ)-এর সঙ্গে বিয়ের রীতি ছিল। মহর (مَهر)-এর ব্যাপারে নারীর অধিকার অত্যন্ত সীমিত ছিল। তালাকের ব্যাপারে পুরুষের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। ঈলা[৮১],' যিহার[৮২] ইত্যাদির প্রচলন ছিল।

৪. বায়' (بَيع = বেচাকেনা), হিবা (هِبة = দান), রিহান (رَهن = বন্ধক), ইজারা (إجارة = ভাড়া) ইত্যাদির মাধ্যমে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করার নীতি ছিল। এমন সব শর্তে বেচা-কেনা হত যাতে বিবাদ সৃষ্টি হতো, জুয়া খেলার প্রচলন ছিল। দ্রব্য বিনিময়ের বহু রীতির মধ্যে কয়েকটির উদাহরণ নিম্নে দেয়া গেল ঃ

বায় সালাম (بَيع سَلم = অগ্রিম মূল্য প্রদান-নির্ধারিত ভবিষ্যতে সামগ্রী হস্তান্তরের অঙ্গীকারে), বায় সারাফ (بَيع صَرف = মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রা বিক্রি), পণ্যদ্রব্যের উপর পাথর নিক্ষেপে ক্রয়, পণ্য স্পর্শে বিক্রি (مُلامَسة), বিক্রেতা পণ্যদ্রব্য নিক্ষেপ করলে বিক্রি (مُنابَذة), ক্ষেতের অপক্ক শস্য বা গাছে ঝোলা ফলের পক্ক শস্য বা ফলের বিনিময় (مُزابَنة) ইত্যাদি। পূর্বেই বলা হয়েছে, কোন কোন ধরনের লেনদেন দু'পক্ষের মধ্যে বচসার, ঝগড়ার সৃষ্টি করতো প্রায়শ।

৫. নগদ ভাড়ায় জমি ইজারা (إجارة) বা শস্য ভাগের শর্তে বর্গা দেবার রেওয়াজ ছিল।

৬. ঋণ (قَرض) ও সুদের (ربوا) প্রচলন ছিল।

৭. অসিয়্যাত (وَصية)-এর মাধ্যমেও সম্পত্তি হস্তান্তর করা হতো।

৮. মামলার বিচার বা বিরোধ নিস্পত্তির জন্য কোন প্রাতিষ্ঠানিক বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল না। গোত্রের সর্দার জনমতের মাধ্যমে বিভিন্ন নির্দেশ দিতো বা কার্যকর করার ব্যবস্থা করতো। বহির্ব্যাপারে সরদার গোত্রের প্রতিনিধিত্ব করতো। প্রয়োজনে সরদারের সাহায্যের জন্য বয়স্ক ও অভিজ্ঞ লোকদের একটি মজলিস-ই-শূরা (شُورٰى পরামর্শ সভা) গঠন করা হতো। মোটকথা, অভ্যন্তরীণ ও বাইরের যাবতীয় বিষয় সরদারের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকতো।

স্থানীয় বিধি-বিধানের ব্যাপারে আল্লাহ্ প্রেরিত নবী রাসূলদের কর্মপন্থা কি ছিল তা শাহ অলীউল্লাহর নিম্নোক্ত আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে যায় ঃ

والذى اتى به الانبياء قاطبة من عند الله تعالى فى هذا الباب هو ان ينظرالى ماعند القوم من اداب الاكل والشرب واللباس والبناء ووجوه الزينة ومن سنة النكاح وسيرة المتناكحين ومن طريق

৮১. ঈলা ঃ কসম করে স্ত্রীর সাথে যৌন সম্পর্কচ্ছেদ করা।

৮২. যিহার ঃ স্ত্রীকে মায়ের পিঠের (কোন প্রত্যঙ্গের) তুল্য বলে তার সংস্রব ত্যাগ করা।

البيع والشراء ومن وجوه المزاج و عن المعاصى وفصل القضايا ونحو ذلك فان كان الواجب بحسب الراى الكلى منطبقا عليه فلا معنى لتحويل شئ من موضعه ولاالعدول عنه الى غيره بل يجب ان يحث القوم على الاخذ بما عندهم وان يصوب رايهم فى ذلك ويرشدوا الى ما فيه من الصالح وان لم ينطبق عليه ومست الحاجة الى تحويل شئ اواخماله لكونه مفضيا الى تاذى بعضهم من بعض او تعمقا لذات الدنيا واعراضا عن الاحسان او من المسليات التى تودى الى اهمال مصالح الدنيا والاخرة ونحو ذلك فلا ينبغى ان يخرج الى مايباين مالو فيهم بالكلية بل يحول الى نظير ما عندهم او نظير مااشتهر من الصالحين الشهود لهم بالخير عند القوم ـ

"নবীগণ সবাই মহান আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এ সম্পর্কে যা নিয়ে আসেন তা হচ্ছেঃ দেখতে হবে কওমের মধ্যে প্রচলিত বিধি-বিধানে কি রয়েছে পানাহার সম্পর্কে, পোশাক, বাসগৃহ, সাজ-সজ্জা, নিকাহের পদ্ধতি, বিবাহ প্রয়াসী পক্ষদ্বয়ের চরিত্র যাচাই, বেচাকেনার পদ্ধতি, পাপের শাস্তি বিধান, বিরোধ নিষ্পত্তি ইত্যাদি সম্পর্কে সেগুলি যদি সামগ্রিকভাবে শরীয়তের পলিসির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তাহলে নিরর্থক হবে কোন পরিবর্তন বা অন্য কোন আইনের প্রবর্তন, বরং ওয়াজিব হবে তাদের মধ্যে প্রচলিত বিধি-বিধানের ওপর স্থির থাকতে তাদেরকে উৎসাহিত করা, তাদের রায়ের যথার্থতা ঘোষণা করা এবং যাতে কল্যাণ রয়েছে তার দিকে তাদেরকে হিদায়েত করা। কিন্তু যদি দেখা যায়, তাদের মধ্যে প্রচলিত বিধি-বিধান শরীয়তের নীতি-পদ্ধতির সাথে বনে না, কারণ সে বিধানগুলি তাদেরকে পারস্পরিক ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়, অথবা তাদেরকে পার্থিব ভোগে নিমগ্ন করে, অথবা সর্বোৎকৃষ্ট কর্ম (إحسان) থেকে বিরত করে অথবা পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ প্রচেষ্টাকে নস্যাত করে ইত্যাদি। যার ফলে এই বিধান ও রীতিগুলিকে পরিবর্তন করা অথবা এগুলিকে পুরোপুরি খতম করে দেবার প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে নবীগণের পক্ষে সমীচীন হয় না তাদের বিধি-বিধান বহাল রাখা; বরং তাঁরা মনোনিবেশ করবেন তাঁদের কাছে যেসব নযীর রয়েছে তার দিকে অথবা যাঁরা সৎকর্মশীল বলে কওমের সাক্ষ্যপ্রাপ্ত তাদের কর্মবিধানের নযীরের দিকে।

অন্যত্র শাহ সাহেব(র) শেষ হিদায়াতের প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

ان كنت تريد النظر فى معانى شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحقق اولاً حال الامميين الذين بعث فيهم التى هى مادة

تشريعه وثانيا كيفية اصلاحه لها بالمقاصد المذكورة فى باب التشريع والتيسير واحكام الملة ـ

"যদি তুমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শরীয়তের গূঢ় অর্থ উপলব্ধি করতে চাও তাহলে প্রথমত যে নিরক্ষর আরবদের কাছে তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন তাদের অবস্থার অনুসন্ধান চালাও; তাদের অবস্থাদি তাঁর শীয়তের উপকরণস্বরূপ; দ্বিতীয়ত তাঁর প্রবর্তিত সংস্কারের প্রকৃতি অনুধাবন করো, তবে তুমি দেখবে, শরী'আত প্রণয়নের ক্ষেত্রে, বিধানকে সহজসাধ্য করতে গিয়ে এবং তাতে করে মিল্লাতকে মযবূত করাবার প্রয়াসে কি সব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তিনি সামনে রেখেছিলেন।[৮৩]

ইসলামী বিধানে সার্বকালিনতা ও সার্বজনীনতা

আল্লাহ্‌র শেষ হিদায়াত ইসলাম যেহেতু শুধুমাত্র আরবদের জন্য ছিল না বরং দুনিয়ার সমস্ত জাতির জন্য ছিল, তাই এই শরীআর মূলনীতি নির্ধারণের বেলায় আরব দেশ ও আরব জাতিসহ পৃথিবীর সব জাতের মানুষের মনন ও স্বাভাবিক প্রবণতার প্রতি নজর রাখাও ছিল অপরিহার্য। কারণ মানবগোষ্ঠীকে আল্লাহ্ অভিন্ন মৌলিক উপাদানে সৃষ্টি করেছেন এবং আল্লাহ্ তাদেরকে এক উম্মত (اُمة وَاحدة) বলে ঘোষণা করেছেন। এজন্য এ বিধানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সামনে রাখা হয়েছেঃ

এক, এমন কোন নির্দেশ না দেয়া, যাতে অসহনীয় কষ্ট ও পরিশ্রম থাকে।

দুই, মানবের মৌলিক প্রয়োজন, প্রকৃতিগত বাসনা ও প্রবণতার প্রেক্ষিতে এমন কিছু কিছু উপলক্ষ্য রাখা, যাকে জাতীয় 'ঈদ উৎসব হিসাবে উদযাপন করা যেতে পারে এবং এর মধ্যে জায়িয ও মুবাহ্‌র সীমা অতিক্রম না করে আনন্দ ও সাজ-সজ্জার অনুমতি দেয়া।

তিন, আনুগত্যমূলক ক্রিয়াদি (طَاعات) বিধিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে মানবের স্বাভাবিক আকর্ষণ ও প্রবণতার প্রতি নজর রেখে কতিপয় সহায়ক এবং উদ্দীপকের অনুমতি দেয়া, যাতে দোষাবহ কিছু না থাকে।

চার, স্বাভাবিকভাবে যেসব জিনিস দ্বারা মানুষের মধ্যে ঘৃণা ও অপছন্দের ভাব সৃষ্ট হয় অথবা মানবিক প্রকৃতি ও মেযাজ যেগুলিকে গুরুভার মনে করে, সেগুলিকে অবৈধ করা।

পাঁচ, اِستقامة -এর ব্যবস্থা অর্থাৎ মানুষকে হক (সত্য) এবং সত্য বিশ্বাস ও সৎকর্মে অটল রাখার জন্য এবং মানব প্রকৃতিকে ইসলামী ছাঁচে ঢালাইয়ের কাজে সহায়তার জন্য শিক্ষা লাভ, শিক্ষা দান, সৎ কাজের আদেশ করা এবং অসৎ কাজ নিষেধ করাকে সর্বকালিন এবং সার্বজনীন দায়িত্বরূপে স্থির কর।

---

৮৩. হুজ্জাতুল বালিগাহ্, পৃষ্ঠা ১২৩।

ছয়, কোন কোন বিধান পালনের দু'টি মান নির্ধারণ করা ঃ আযীমাত (عَزِيمة) অর্থাৎ উৎকৃষ্ট মান এবং রুখ্‌সাত (رُخصة) অর্থাৎ নিকৃষ্ট মান। যাতে করে কোন বিধান পালনের বেলায় মানুষ দু'টো মানের যে কোনটি ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারে।

সাত, কোন কোন ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দু'টি বিভিন্ন ধরনের আমল বা কর্মের বর্ণনা পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে অবস্থার প্রেক্ষিতে যে কোনটির অনুসরণের অবকাশ রাখা।

আট, কোন কোন নিষিদ্ধ কর্মের ক্ষেত্রে বস্তুগত লাভের বিবেচনা পবিত্যাগ করার হুকুম দেয়া।

নয়, বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমিকতা ও ক্রমোন্নতির নীতি প্রতিষ্ঠিত রাখার নির্দেশ যাতে ইসলামী দা'ওয়াতের সূচনাতেই একই সঙ্গে সবগুলো বিধান প্রবর্তন এবং একই সঙ্গে সবগুলো নিষিদ্ধ কর্মের নিষেধাজ্ঞা জারী করে বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া জাগান না হয়।

দশ, গঠনমূলক সংশোধনের ক্ষেত্রে জাতীয় চরিত্রের সবল ও দুর্বল উভয় দিকের প্রতি নজর রাখা।

এগারো, বহু সৎ কাজের বিস্তারিত ও পূর্ণ বিবরণ দেয়া হয়েছে, তাকে মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনার ওপর ন্যাস্ত করা হয়নি; কারণ এভাবে ছেড়ে দিলে বহু কঠিন সমস্যা দেখা দিতো।

বারো, কোন কোন বিধান প্রবর্তনের ক্ষেত্রে অবস্থা ও মাসলিহাত (কল্যাণ বহতা مصلحة)-এর প্রতি নজর রাখা হয়েছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও মেযাজের প্রতি নজর রাখা হয়েছে। শরীয়তের বিধানগুলি গভীর পর্যবেক্ষণ করলে তাতে এমন বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে, যেগুলি সামগ্রিক বিবেচনায় গ্রহণ করা হয়েছিল এবং তার সাথে কোন বিশেষ স্থান বা জাতের প্রয়োগিক সম্পর্কের কোন প্রশ্ন ছিল না।

মোটকথা, সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় পর্যালোচনা করার পর কুরআনী তত্ত্ব ও মৌলনীতি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা যত গভীর ও সূক্ষ্ম হবে ততই সুস্পষ্ট হবে যে, ইসলামী বিধানগুলো সর্বকালীন এবং সার্বজনীন এবং এ কথাটি বোঝা যাবে যে, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাইরের কোন পথনির্দেশের প্রয়োজন দেখা দেবে না।

সুন্নাত ঃ ফিক্‌হের দ্বিতীয় উৎস

সুন্নাতের সংজ্ঞা

সুন্নাতের আভিধানিক অর্থ প্রচলিত রীতি-পদ্ধতি। ফকীহদের পরিভাষায় সুন্নাত বলতে বোঝায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিজের কথা (قَول), কর্ম (فِعل), এবং تَقرير

অর্থাৎ অন্যদের এমন কথা ও কর্ম, যেগুলি সম্পর্কে জেনেশুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নীরবতা অবলম্বন অর্থাৎ মৌন সম্মতি প্রদান করেছন। সাহাবীগণের কথা ও কর্মের স্বপক্ষে তাঁদের কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথা ও কর্মের কোন সনদ অবশ্যই রয়েছে, এই ভিত্তিতে সাহাবীগণের কথা এবং কর্মও সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন উসূল গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত হয়েছে ঃ

السنة تطلق على قول الرسول وفعله وسكوته وعلى اقوال الصحابة وافعالهم -

"সুন্নাত বলা হয় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথা ও কর্ম এবং তাঁর নীরবতাকে আর সাহাবায়ে কিরামের কথা ও কর্মকে।"[৮৪]

তবে হাদীস বলতে ফকীহগণের মতে শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণীই বোঝায়। এই বিশেষ অর্থে এ ছাড়া তাদের দৃষ্টিতে অন্য কোন অর্থে 'হাদীস' শব্দের ব্যবহার হয় না।[৮৫]

কিন্তু মুহাদ্দিসগণের মতে হাদীসের অর্থ ব্যাপক। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথা, কর্ম ও নীরবতা সবই হাদীসের অন্তর্ভুক্ত, তাকে সুন্নাত বা হাদীস যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন।

সুন্নাত ঃ নকশা অনুযায়ী নির্মিত ইমারতের তুল্য

আসলে কুরআন হচ্ছে যেন নীলনকশা এবং সুন্নাতে রাসূল যেন সেই নকশা অনুযায়ী নির্মিত ইমারত। যখন থেকে আল্লাহ্র হিদায়াতের সিলসিলা (ধারা) শুরু হয়েছে, নকশা (কিতাব)-এর সাথে প্রকৌশলী (রাসূল) পাঠাবার নীতিও তখন থেকে বরাবর কার্যকর থেকেছে এবং মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নুবুওয়াতে এসে সেই ধারার সমাপ্তি ঘটেছে।

কুরআনে সুন্নাতের ভিত্তি

কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলিতে সুন্নাতের ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় ঃ

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ -

(سورة النحل : ٤٤)

"আর তোমার প্রতি আমি যিক্‌র (কুরআন) নাযিল করেছি, যাতে তুমি লোকদের জন্য যে শিক্ষা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা তাদের কাছে সুস্পষ্ট করে (بَيَان) দিতে পার এবং যাতে তারা চিন্তা-গবেষণা করে।"

---

৮৪. নূরুল আনওয়ার ইত্যাদি।

৮৫. ঐ।

এই আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কুরআনের ব্যাখ্যাতা গণ্য করা হয়েছে।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ اَرَاكَ اللّٰهُ ـ

(النساء : ١٠٥)

"হে নবী! আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি সত্য সহকারে, যাতে আল্লাহ্ তোমাকে যা বাত্‌লে দিয়েছেন সেই অনুযায়ী তুমি ফায়সালা (حكم) করতে পারো।"

নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ্‌র রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাঁর প্রচারের বিষয়বস্তু বলে দিয়েছেন এবং তাঁর উপর মুবাল্লিগ (প্রচারক) -এর দায়িত্ব অবতীর্ণ করেছেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ـ (المائدة : ٦٧)

"হে রাসূল! তোমার রব (رَبّ)-এর পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা কিছু নাযিল হয়েছে তা প্রচার (تَبْلِيغ) করো।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে অথবা উভয়ের মাধ্যমে কিংবা প্রচলিত রেওয়াজগুলির ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করে সেগুলিকে প্রতিষ্ঠিত রাখা বা পরিবর্তিত আকারে প্রচলিত রাখার মাধ্যমে কুরআনের অর্থ ও উদ্দেশ্য তুলে ধরতেন, এটিই ছিল তাঁর ব্যাখ্যা (بَيان), সিদ্ধান্ত দান (حُكم) এবং প্রচার (تَبْلِيغ)-এর পদ্ধতি, এবং সেই বয়ান, হুক্‌ম এবং তাবলীগ-এর সমষ্টি হচ্ছে সুন্নত, যার ভিত্তি কুরআন মজীদ। এ কারণে সুন্নাতের নামে এমন কোনো জিনিস গ্রহণযোগ্য হবে না যা কুরআন মজীদের বিপরীত। যেমন আল্লামা শাতিবী বলেন ঃ

ليس فى السنة الا واصله فى القران ـ

"সুন্নাতে এমন কোনো বিষয় নেই, যার মূল কুরআনে নেই (আল মাওয়াফিকাত, ৪র্থ খণ্ড)।

সুন্নাতের ব্যাপারে সাহাবীগণের কর্মপদ্ধতি

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পর সাহাবীগণ সুন্নাতকে সক্রিয় ও কার্যকর রাখেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) (আল্লাহ্‌র হিদায়াতের প্রকৃতি উপলব্ধির ব্যাপারে যিনি ছিলেন সবচেয়ে অগ্রবর্তী)-এর কর্ম পদ্ধতি সম্পর্কে নিম্নোক্ত বর্ণনা পাওয়া যায় ঃ

كان ابو بكر اذ ورد عليه حكم نظر فى كتاب اللّٰه تعالى فان وجد فيه مايقضى به قضى به وان لم يجد فى كتاب اللّٰه نظر فى سنة

رسول اللّه ـ فان وجد فيها ما يقضى به قضى به فان اعياه ذلك فسال الناس هل علمتم ان رسول اللّه قضى فيه قضاء فربما قام اليه القوم فيقولون قضى فيه بكذا وكذا ـ

"হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সামনে যখন কোনো আইনগত বিষয় আসতো তিনি প্রথমে কুরআন মজীদে তার সমাধান খুঁজতেন এবং তাতে যে সমাধান পেতেন তাই দিতেন। না পেলে (তাঁর জানা) সুন্নাতের দিকে মনোনিবেশ করতেন। সুন্নাতে কোনো সমাধান না পেলে লোকদেরকে জিজ্ঞেস করতেন-এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কোনো সিদ্ধান্ত কেউ জানে কি না? অনেক সময় সাহাবীদের মধ্য থেকে কিছু লোক বলে দিতেন– এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।"[৮৬]

হযরত আবূ বকর (রা) সুন্নাতের সন্ধান লাভে আনন্দিত হয়ে বলতেন ঃ

الحمد للّه الذى جعل فينا من يحفظ على سنن نبينا ـ

"আল্লাহ্‌র শোকর, যিনি আমাদের মধ্যে নবীর সুন্নাত সংরক্ষণকারী লোক বিদ্যমান রেখেছেন।"[৮৭]

হযরত উমর (রা) একবার কুরআনের অর্থ অনুধাবন প্রসঙ্গে সুন্নাতকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করার ব্যাপারে বলেন ঃ

سيأتى قوم يجادلونكم بشبهات القران فخذوهم بالسنن فان اصحاب السنن اعلم بكتاب اللّه ـ

আগামীতে এমন সবলোক জন্ম নেবে যারা কুরআনের ব্যাখ্যায় নানা সন্দেহের সৃষ্টি করে তোমাদের সাথে বিতর্ক করবে। তাদের কাছে সুন্নাতের প্রমাণ উপস্থিত করবে। কারণ সুন্নাতের বাহকেরা কুরআন সম্পর্কে বেশি জানে[৮৮]। হযরত উমর কর্তৃক নিযুক্ত গভর্নর ও কর্মকর্তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

انما ابعث ليبلغونكم دينكم وسنة نبيكم اوكما قال ـ

আমি শাসনকর্তা পাঠাই এই উদ্দেশ্যে যে, তারা তোমাদেরকে তোমাদের দীন ও তোমাদের নবীর সুন্নাত পৌছাবেন অর্থাৎ সুন্নাত প্রচারও তাদের দায়িত্বভুক্ত; অথবা যেমন করে তিনি বলেছিলেন।[৮৯]

৮৬. হুজ্জাতুলাহিল বালিগাহ্ ১৪৮ পৃষ্ঠা এবং ইলামুল মু'কিঈন প্রথম খণ্ড, ২২ পৃষ্ঠা।

৮৭. ঐ (প্রথমোক্ত) পৃষ্ঠা ১৪৭ এবং তারীখুল খুলাফা।

৮৮. মুকদ্দমাতুল মীযান, ইসলামী কানন নম্বর ১ম খণ্ড থেকে, ৩০৫ পৃঃ

৮৯. ইলামুল মুকিঈন, ১ম খণ্ড।

তিনি সুন্নাতকে আইনের মর্যাদা দিয়ে বলেন ঃ

ايها الناس قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة الا ان تضلوا بالناس يمينا وشمالا ـ

হে লোকেরা! তোমাদের জন্য রাসূল (সা)-এর সুন্নাত নির্দিষ্ট হয়েছে। ফরযগুলি নির্ধারিত হয়ে গেছে, সুস্পষ্ট চলার পথে তোমাদেরকে তুলে দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এখন যদি তোমরা লোকদের কথায় ডানেবাঁয়ে গোমরাহ হয়ে যাও[৯০] (তা তোমাদের ব্যাপার)।

অথচ হযরত উমর (রা) এমন ব্যক্তিত্ব, যিনি অবস্থা ও চাহিদার প্রেক্ষিতে কুরআন মজীদের কোনো কোনো খুঁটিনাটি বিষয়ের ভিত্তিতে আমল মূলতুবী করে দিয়েছিলেন, যাতে ব্যাপক (عَام) হুকুম খাস (خَاص) হুকুমে পরিণত হয়ে যায়। যথা দুর্ভিক্ষ চলাকালে চোরের হাত কাটা মওকুফ করেছিলেন এবং (مُؤلفة القلوب) (ইসলামে স্থিত রাখবার জন্যে যাদের মন জয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল যাকাত-সাদাকার মাল দিয়ে) কে যাকাত-সাদাকা দেওয়া রাসূল (সা)-এর সময়ের জন্য খাস বলে গণ্য করেছিলেন। তথাপি সামগ্রিকভাবে তিনি সুন্নাতকে শারী'আতের উৎস রূপে ব্যবহার করেছেন। অন্যান্য সাহাবা এবং তাবে'ঈগণও সুন্নাতের ব্যাপারে এই একই কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। সুন্নাতের ধরন-প্রকৃতি ও প্রয়োগের ক্ষেত্র নির্ধারণের ব্যাপারে তাঁরা আমাদের পথনির্দেশক।

ইমামগণের দৃষ্টিভঙ্গি

ফিক্‌হের ইমামতগণও সুন্নাতের প্রতি একই দৃষ্টিভংগী গ্রহণ করেছেন। যেমন ইমাম আবূ হানীফা (র) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে ঃ

لو لا السنن ما فهم احد منا القران ـ

সুন্নাত না হলে আমাদের কেউ কুরআন বুঝতো না।[৯১]

নিম্নোক্ত বক্তব্যটি আরো বেশি সুস্পষ্ট ঃ

لم تزل الناس فى صلاح مادام منهم من يطلب الحديث فاذا طلبوا العلم بلاحديث فسدوا ـ

"যতদিন মানুষ হাদীসের জ্ঞানান্বেষণ করবে ততদিন তারা সুকৃতির মধ্যে অবস্থান করবে। আর যখন তারা হাদীস ছাড়া জ্ঞান অর্জন করবে তখন বিকৃতির শিকার হবে।"[৯২]

---

৯০. আল ইতিসাম, ১ম খণ্ড, ইসলামী কামূস নম্বর ১ম খণ্ড, ৩০৬ পৃষ্ঠা থেকে।

৯১. মুকদ্দমাতুল মীযান, ইসলামী আইন নম্বর ৩০৮ পৃষ্ঠা থেকে। ৯২. ঐ ।

ইমাম শাফেঈ (র) বলেন ঃ

اجمع المسلمون على ان من استبان له سنة عن رسول اللّه (صلعم) لم يحل له ان يدعها بقول احد ـ

মুসলিমদের মধ্যে এ ব্যাপারে ঐকমত্য (اجماع) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, যখন কারোর কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্নাত সুস্পষ্ট হয়ে যাবে তখন তার জন্য অন্য কারো কথার ভিত্তিতে সে সুন্নাত পরিহার করা জায়িয হবে না।[৯৩]

আল্লামা সুয়ূতী (র) ইমাম শাফে'ঈর (র) নিম্নোক্ত উক্তি উদ্ধৃত করেছেন ঃ

"রাসূলুল্লাহ্ (সা) যা কিছু বলেছেন সবই কুরআন থেকে গৃহীত।"[৯৪]

ইমাম মালেক (র) বলেছেন ঃ

كل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل مالم يوا افقه السنة فاتركوه ـ

যা কিছু কিতাব ও সুন্নাতের সাথে সামঞ্জস্যশীল হয় তা গ্রহণ করো। আর যা কিছু এ দুয়ের বিরোধী হয় তা প্রত্যাহার করো।[৯৫]

ইমাম আহ্‌মদ ইব্‌ন হাম্বল (র) বলেন ঃ

من رد حديث رسول اللّه (صلعم) فهو على شفا هلكة ـ

যে ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর হাদীস প্রত্যাখ্যান করে সে যেন ধ্বংসের কিনারে এসে দাঁড়ায়।[৯৬]

উপরের আলোচনা থেকে দুটি কথা জানা যায় ঃ

এক. কুরআনের অর্থ অনুধাবন করার ক্ষেত্রে সুন্নাত প্রাথমিক গুরুত্বের অধিকারী।

দুই. আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কুরআনের পর সুন্নাত একটি উৎসের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত।

কুরআনের ব্যাখ্যায় সুন্নাতের অবস্থান সম্পর্কে 'আল্লামা ইব্‌ন কায়্যিমের দীর্ঘ বয়ানের তরজমা নিম্নে দেওয়া গেল ঃ

"রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ব্যাখ্যা ও সুস্পষ্ট বর্ণনা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত।

এক. খোদ অহীর বর্ণনা। সাহাবীদের কাছে যা অস্পষ্ট এবং অজানা থাকতো, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতেন।

---

৯৩. ই'লামুল মুকিঈন ২য় খণ্ড।

৯৪. আল ইত্‌কান।

৯৫. জামে' আহলিল ইলম, ইসলামী কানূন।

৯৬. কিতাবুল মানাকিব, ইবনুল জাওযী।

দুই. তিনি অহীর অর্থও ব্যাখ্যা-বর্ণনা করতেন, নিম্নোক্ত আয়াতগুলিতে এর নযীর মেলে ঃ وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ

"এবং যারা তাদের ঈমানের সাথে ظلم-এর সংমিশ্রণ ঘটায়না" এই ظلم -এর ব্যাখ্যা তিনি করেছেন 'শির্‌ক'। يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا

(যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে) "তার হিসাব হবে খুবই সহজ" তিনি এই সহজ (يسير) হিসাবের ব্যাখ্যা করেছেন "কেবল আল্লাহ্‌র আদালতে উপস্থাপনা।" حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ

(রমযানের মাসে রাতে তোমরা পানাহার করো) "যতক্ষণ না কালো সুতার মধ্য থেকে সাদা সুতা তোমাদের কাছে প্রতিভাত হয়।"

তিনি ব্যাখ্যা করেছেন ঃ خيط الابيض মানে সুবহে সাদিক خيط الاسود মানে সুব্‌হে কাযিব। وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى

তিনি (রাসূল) তাঁহাকে (জিবরীলকে) দেখেছেন আরো একবারের অবতরণে সিদ্‌রাতুল মুনতাহার নিকট। এখানে رَاٰهُ তে যে সর্বনাম (ه) তার মানে জিবরীল।

اَوْ يَاْتِىَ بَعْضُ اٰيَاتِ رَبِّكَ ـ

"অথবা আসবে তোমার প্রতিপালকের بعض ايات অন্য কোন নিদর্শন।" এই بعض ايات অর্থে কিয়ামতের আলামত- সূর্যের পশ্চিম আকাশে উদয় বলে ব্যাখ্যা করেছেন ঃ مَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ

"পবিত্র অর্থাৎ পুণ্যময় কথার উপমা হচ্ছে যেন একটি পবিত্র বৃক্ষ" شجرة طيبة অর্থ, তিনি বলেছেন খেজুর গাছ।

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ـ

"মু'মিনদেরকে আল্লাহ্‌ অবিচল (স্থির) রাখবেন প্রতিষ্ঠিত কথার ওপর (ওয়াহদানিয়াতের ওপর) দুনিয়ার জীবনে এবং আখিরাতে।"

হযরত (সা) আয়াতের ব্যাখ্যায় আখিরাতে قَول ثَابت-এর অর্থ করতে গিয়ে বলেছেন, কবরে মানকির নাকীরের প্রশ্নের জবাবে মু'মিনকে আল্লাহ স্থির অবিচল রাখবেন।

يُسَبِّحُ الرَّعْدُ [رَعد (Thunder) আল্লাহ্‌র সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ করে] بِحَمْدِه তিনি বলেছেন, رَعد একজন ফিরিশতা, যিনি বরষা-বাদলের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত।

اِتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ

[তাহারা (ইয়াহুদী আর খৃষ্টান) গ্রহণ করেছে তাদের ধর্মগুরু আর সন্যাসীদেরকে اَرْباب (رَب -এর বহুবচন রূপে) আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে]

ইয়াহুদী এবং খৃষ্টানরা তাদের যাযকদের হারামকে হালাল আর হালালকে হারাম করে দেয়ার ক্ষমতা রাখে বলে মনে করতো এবং তাদের সিদ্ধান্ত মেনে নিত– এটাই হচ্ছে তাদেরকে رب রূপে গ্রহণ করার অর্থ।

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّااسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ ـ

[তোমরা যত পার قوة (শক্তি) অর্জনের ব্যবস্থা করো তাদের (ইসলামের শত্রুদের মুকাবিলার) জন্য] রাসূল (সা) قوة -এর ব্যাখ্যা করেছেন 'তীরান্দাজী' (তাঁর যুগে এটি ছিল শক্তি অর্জনের একটি মোক্ষম উপায়)।

مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً يُّجْزَبِهٖ ـ

[যে ব্যক্তি ঘৃণ্য (গুনাহ্‌র) কাজ করে তাকে তেমনি (ঘৃণ্য) প্রতিদান দেয়া হবে] তিনি বলেছেন, এই جزاء বা প্রতিদানের অর্থ হচ্ছে কষ্ট দুঃখ-শোক, ভীতি, রোগ ইত্যাদি, যা দুনিয়ার জীবনে গুনাহ্‌গার ভোগ করবে।

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ ـ

[যারা উৎকৃষ্ট কর্ম করে তাদের জন্য উৎকৃষ্ট পুরস্কার রয়েছে এবং রয়েছে অধিক কিছু] আয়াতে "যিয়াদাহ" শব্দের ব্যাখ্যা তিনি করেছেন– 'আল্লাহ্‌র দীদার বা সাক্ষাত'।

وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ـ

[তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব] আয়াতে দোয়া (دعاء) শব্দের অর্থ তিনি করেছেন 'ইবাদত'।

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ اِدْبَارَ النُّجُوْمِ ـ

[এবং রাতের একাংশে তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা (تَسْبِيح) বর্ণনা করো এবং নক্ষত্ররাজির পশ্চাতে (অস্তের পর] اِدبار النجوم -এ তাসবীহের মানে তিনি বলেছেন, ফজরের নামাযের পূর্বে দুই রাকাত নামায।

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ ـ

এই আয়াতে اَدْبَار السُّجود মানে মাগরিবের পরের দুই রাকাত নামায বলে তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

এগুলি ছাড়া আরো রাসূল (সা)-এর ব্যাখ্যার বহু নযীর পাওয়া যায়।

তিন. রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের কাজের মাধ্যমে ব্যাখ্যা পেশ করেছেন, যেমন কোন ব্যক্তি বিভিন্ন নামাযের সময় জানতে চাইলে নিজে যথাসময়ে তাকে নিয়ে নামায পড়ে সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

চার. প্রশ্নের উত্তরে বিধান নাযিল হয়েছে, যেমন এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ করলো অথচ প্রয়োজনীয় চার জন সাক্ষী অথবা আদৌ কোন সাক্ষী হাযির করতে পারলো না– জিজ্ঞেস করলো, এর কি বিধান? (উত্তরে লি'আন (لِعان) সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হল, যাতে নির্দেশ রয়েছে, স্বামী চার বার হলফ করে বলবে তাঁর অভিযোগ সত্য, পঞ্চমবারে আল্লাহ্‌র লা'নাত কামনা করবে যদি অসত্য হয়। অদ্রূপ স্ত্রীও চার বার হলফ করবে এবং বলবে তার স্বামীর অভিযোগ অসত্য, পঞ্চম বার লা'নাত করবে যদি সত্য হয়– (ফলে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে)।

পাঁচ. অহীর মাধ্যমে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন কিন্তু সেই অহীর বাক্যগুলি কুরআনের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। যেমন এক ব্যক্তি লম্বা জুব্বা পরে এবং বিস্তর খোশবু লাগিয়ে হজ্জের ইহরাম করল। জিজ্ঞাসিত হয়ে হযরত (সা) অহীপ্রাপ্ত হলেন এবং বললেন, সে যেন জুব্বা খুলে ফেলে এবং খোশবু ধুয়ে ফেলে।

ছয়. প্রশ্ন ছাড়াই তিনি বহু বিধান বর্ণনা করেছেন। যেমন গাধার গোশ্‌ত এবং মুত্‌অ (مُتعة) মেয়াদী বিয়ে নিষিদ্ধ করেছেন, শিকার হারাম ঘোষণা করেন। অনুরূপভাবে স্ত্রীরূপে ফুফীর বর্তমানে তার ভাইঝিকে এবং তদ্রূপ খালার বর্তমানে তার ভগ্নীকে বিয়ে করা হারাম করেন।

সাত. রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে কোনো কাজ করলেন এবং উম্মতকে তা করতে মানা করলেন না; সুতরাং কাজটি বৈধ গণ্য হল।

আট. নিজে কোনো কাজ করলেন এবং উম্মতকে তা শেখালেন। এতে বৈধতার এক ধরনের প্রমাণ পাওয়া গেল।

নয়. কোনো জিনিসের হারাম হবার ব্যাপারে নীরব থেকে তার মুবাহ (مُباح) হবার বিষয়টির প্রতি অব্যক্ত ইংগিত দিলেন।

দশ. কুরআন মজীদ কোনো নির্দেশ দিলো অথবা কোনো জিনিসকে হারাম বা মুবাহ ঘোষণা করলো, কিন্তু সংশ্লিষ্ট কাল, পাত্র, শর্ত ইত্যাদি সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করলো, এমন সব ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেগুলির বর্ণনা দিয়েছেন। আল্লাহ্ অনেক ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত (مُجمل) বিধান প্রদান করে বিস্তারিত (مُفصل) বর্ণনার দায়িত্ব ছেড়ে দেন, নিজের রাসূলের ওপর। যেমন– وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذٰلِكُمْ. (তোমাদের জন্য হালাল করা হল অন্যান্য মেয়েদের বিবাহ ওরা ব্যতীত অর্থাৎ পূর্বে বর্ণিত মেয়েরা ব্যতীত); কুরআনে এই مَاوراء -এর সংশ্লিষ্ট বর্ণনা নেই।

আল্লামা শাতিবীর বর্ণনা

এ সম্পর্কে নিম্নে 'আল্লামা শাতিবীর বর্ণনার সার সংক্ষেপ দেয়া হলো ঃ

"অর্থ ও ব্যুৎপত্তির দিক থেকে সুন্নত কুরআন মজীদের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। সুন্নাত কুরআন মজীদের অস্পষ্ট বচনের ব্যাখ্যা করে, জটিল আয়াতের সুস্পষ্ট বর্ণনা দেয় অথবা সংক্ষিপ্ত নির্দেশের ভাষ্য প্রদান করে।" এর প্রমাণ মিলে ঃ

সামগ্রিকভাবে সুন্নাত কুরআনের বয়ান (بَيان)। যেমন আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেনঃ

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ -

(আমরা তোমার কাছে যিক্‌র [কুরআন] নাযিল করেছি যাতে তুমি মানুষের জন্য অবতীর্ণ আয়াতের বয়ান করে দিতে পারো। لِتبين শব্দে রাসূলকে বর্ণনার (بَيان) দায়িত্ব অর্পণের কথা রয়েছে– এবং রাসূলের বর্ণনাও সুন্নাত।

কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ - (এবং তুমি (রাসূল) সচ্চরিত্রের সুউচ্চ পর্যায়ে অধিষ্ঠিত।)

হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন (خُلقها القُرآن) অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) 'খুলুক' (চরিত্র)-এর অবয়ব হচ্ছে কুরআন। মানব চরিত্রের উপাদান হচ্ছে– তার কথা কর্ম ও সমর্থন এবং সুন্নাত বলতেও এগুলোকেই বোঝায়। সুতরাং সুন্নত হচ্ছে কুরআনের 'বয়ান' এবং রাসূল (সা)-এর কথা, কর্ম এবং সমর্থন কুরআন থেকেই উদ্ভূত।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ব্যাখ্যার বহু ধরন ও পদ্ধতি রয়েছে। হাদীস সাহিত্যের বিশাল পরিসর থেকে তা বিস্তারিত জানা যেতে পারে। আপাত দৃষ্টিতে হয়তো হযরত (সা)-এর কোনো কোনো ব্যাখ্যার সূত্র কুরআন মজীদে পাওয়া যায় না, কিন্তু যে বিশেষজ্ঞরা শরী'আতে ইসলামের জ্ঞান রাখেন ও তার সার্বজনীন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে পরিচিত; তাদের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সূত্র সহজেই ধরা পড়ে।

আইন প্রণয়নের সুন্নাতের স্থান অনুধাবনের উপায়

আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সুন্নাতের ভূমিকা জানার জন্য রাসূল (সা)-এর যুগের

অবস্থা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান আহরণ করা প্রয়োজন। উক্ত অবস্থার আলোকেই উপলব্ধি করা যাবে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সমসাময়িক সমাজে প্রচলিত রীতি রেওয়াজের কোন্‌টিকে কিভাবে এবং কতটুকু অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন। সুন্নাতের মাধ্যমে আমরা অনেকাংশে তৎকালীন অবস্থাও অনুধাবন করতে পারি। কিন্তু তৎকালীন বিভিন্ন রীতি-রেওয়াজের বিস্তারিত আয়াত জানা এবং সেই প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গ্রহণ, বর্জন, সংশোধন ইত্যাদির যথার্থ সীমানা চিহ্নিত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ।

ফকীহদের লেখায় এ ধরনের আলোচনা পাওয়া যায় না। যাহোক, রাসূলুল্লাহ্

(সা)-এর প্রবর্তিত শরী'আতের গূঢ়তত্ত্ব ও প্রকৃতি জানতে হলে তাতে তাঁর সুন্নাতের ভূমিকা আর সে সুন্নাতের প্রেক্ষাপট 'আরব সমাজের অবস্থা জানা অপরিহার্য। এ সম্পর্কে শাহ্ অলীউল্লাহ্ (র)-এর কিতাব 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা'র একটি উদ্ধৃতি পূর্বে দেয়া হয়েছে। দেখুন ..... তিনি এ কথাটিও গুরুত্ব সহকারে বলেছেন। আইন প্রণয়নের সময় রীতি আরবের রেওয়াজ ও বিধানের আসল আকৃতি কি এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাতে কি সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং বর্জন করেছিলেন, তার একটি খতিয়ান সামনে রাখা গেলে কোন পরিবর্তিত বা নতুন পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অবলম্বিত কর্মপদ্ধতি কার্যকর করা সম্ভব হবে।

রাসূল (সা)-এর উক্তিগুলির প্রকারভেদ

রাসূল (সা)-এর উক্তিগুলিকে সাধারণভাবে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। এক. যেগুলির সম্পর্ক রয়েছে নুবুওয়াতের দায়িত্ব ও রিসালাতের সাথে। কুর্‌আনের মজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ـ

(অর্থাৎ রাসূল যা তোমাদেরকে দিয়েছেন তা গ্রহণ করো এবং তিনি যা নিষেধ করেছেন তা পরিহার করো) এই আয়াতের সম্পর্ক হচ্ছে উল্লেখিত প্রথম ভাগের অর্থাৎ 'আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগী, চরিত্রের নৈতিকতা, লেনদেন, পরকাল ইত্যাদির সাথে। সুতরাং এসবের সাথে সম্পর্কিত উক্তি নুবুওয়তের দায়িত্বের সাথে সম্পর্কিত বলে তা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। দুই. নুবুওয়াতের দায়িত্ব ও রিসালাতের সাথে যেসব উক্তির সম্পর্ক নেই, বরং যে উক্তি কোন পরামর্শ বা মতামত ভিত্তিক, যেমন تَأبِير النَّخل (পুং জাতীয় খেজুরের ফুলের রেণু স্ত্রী জাতীয় খেজুর ফুলে ছড়ানো (Pollination) সম্পর্কে হযরত (সা)-এর বিরূপ মন্তব্যের দরুণ সাহাবা ঐ প্রক্রিয়া বন্ধ করলেন, পরিণামে ফলন কম হলো, তখন হযরত (সা) বললেন ঃ

انما انا بشر اذا امرتكم بشئ من دينكم فخذوه واذا امرتكم بشئ من رائى فانما انا بشر ـ

"আমি একজন মানুষ মাত্র, যখন তোমাদের দীনের ব্যাপারে আমি কোনো হুকুম দেই তখন তা গ্রহণ করো এবং যখন নিজ মতের ভিত্তিতে কোনো হুকুম দেই (তা গ্রহণ করা অপরিহার্য নয়, কারণ) আমি একজন মানুষইত (ভুল ভ্রান্তি হতে পারে)। এই শ্রেণীর উক্তির মর্যাদা প্রথম শ্রেণীর উক্তির মতো হতে পারে না। পরামর্শ ও মতামত হতে পারে। যেমন বদর-এর যুদ্ধ বন্দীদের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায় করা

হয়েছিল পরামর্শ ক্রমে; কিন্তু আল্লাহ্ অসন্তোষ প্রকাশের সাথে অনুমোদন দান করলেন। অবস্থা ও প্রয়োজন বিশ্লেষণ বস্তুনিষ্ঠ না হয়ে মানবিক দুর্বলতা প্রসূত হতে পারে। (অবশ্যই নবী-রাসূলের ভুল-ভ্রান্তি নিবারণ বা সংশোধনের ব্যবস্থাও আল্লাহ্ রেখেছেন যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।)

দ্বিতীয় শ্রেণীর উক্তি বা বয়ান বা ফায়সালা যার সম্পর্ক থাকে সাধারণত নিম্নরূপ ব্যাপারগুলির সাথে ঃ

এক. সাময়িক বা রাজনৈতিক প্রয়োজনে যে ফায়সালা দেওয়া হয়।

দুই. যে সব ফায়সালা পদ্ধতিগত এবং অবস্থার পরিবর্তনের সাথে বদলে যেতে থাকে। যেমন, যুদ্ধ কৌশল, রাষ্ট্রের কোন বিভাগের বিন্যাস ইত্যাদি।

তিন. ব্যক্তি, জাতি বা দেশ ভিত্তিক আচরণ বা রীতি সম্বন্ধে ফায়সালা।

চার. যেসব কথা আরবে কাহিনী আকারে প্রচলিত ছিল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) গল্প বলার স্বাভাবিক প্রবণতা বশত কিংবা কারো চারিত্রিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সেগুলি বর্ণনা করেছেন।

পাঁচ. আরবদের কোন কোন অভিজ্ঞতা যথা চিকিৎসা কৃষি ও বাগান রচনা সম্পর্কে তিনি যা বর্ণনা করেছেন।

একজন আইন প্রণেতার জন্য হযরত (সা)-এর উভয় ধরনের উক্তির ব্যাখ্যা বা ফায়সালর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ প্রয়োজন। অন্যথায় আইন তার বাস্তব কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলতে পারে। সে সব ক্ষেত্রে অবস্থা ও যুগের তাগিদ অনুযায়ী আইনের বিন্যাস করতে হয়।

সুন্নাত সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফার (র)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ

ইমাম আবূ হানীফা (শ্রেষ্ঠতম আইন প্রণেতা) সম্পর্কে একথাটি প্রচলিত যে, তিনি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সুন্নাতের প্রতি তেমন দৃষ্টি রাখেননি। কথাটি সত্য নয়। এতে যদি কিছুমাত্র সত্যতা থাকে তবে হযরত (সা)-এর উপরোক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর উক্তি বা ফায়সালার প্রেক্ষিতে। ইমাম আবূ হানীফার ফিক্‌হ মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সাথে যত বেশি সামঞ্জস্যশীল হতে পেরেছে, অন্য কোনো ইমামের ফিকহের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। হানাফী ফিকহের অধিকতর জনপ্রিয়তার মূলে রয়েছে এই সামঞ্জস্যশীলতা। একদিকে ইসলামী আইনের সর্বব্যাপকতা এবং অন্য দিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণীসমূহের ধরন ও স্বরূপ অনুধাবন করলে অনিবার্যভাবে একথা মেনে নিতে হবে যে, আইনের জগতে কিয়াস ও রায়-এর গুরুত্ব কম নয়। অথচ এই কিয়াস ও রায় অধিকতর প্রয়োগের কারণে ইমাম আবূ হানীফা (র)-কে অভিযুক্ত করা হয়।

আইন প্রণয়নে (ফিক্‌হ) সুন্নাতসম্পর্কিত জ্ঞাতব্য বিষয়

ফকীহগণ আই প্রণয়নের জন্য সুন্নাত সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিষয়াবলীর জ্ঞান অপরিহার্য গণ্য করেছন ঃ

১. নাসেখ ও মান্‌সূখ,

২. মুজ্‌মাল ও মুফাস্‌সাল,

৩. খাস ও আম,

৪. মুহ্‌কাম ও মুতাশাবিহ্‌,

৫. বিধানসমূহের শ্রেণী ও মর্যাদা (যেমন ওয়াজিব সুন্নাত, মুবাহ ইত্যাদি)।

কুরআন মজীদ থেকে যুক্তি ও প্রমাণ সংগ্রহের যে পদ্ধতি ও মূলনীতি ফকীহগণ নির্ধারণ করেছেন তার মধ্যেও উপরোক্ত বিষয়গুলোর জ্ঞান অপরিহার্য। অদ্রূপ সুন্নাতের ক্ষেত্রেও সেসবের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। অধিকন্তু রেওয়ায়েত (رِوَايَة = প্রক্রিয়া বর্ণনা) ও দেরায়েতের (دِرَايَة = যুক্তি প্রয়োগ, বিশ্লেষণ) বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সঠিক হাদীস সনাক্ত করার কাজ বিস্তর অনুসন্ধান সাপেক্ষ এবং বিপুল গুরুত্বের দাবিদার। অনুরূপভাবে কুরআন মজীদের সাথে সামঞ্জস্যের দৃষ্টিতে সুন্নাতের স্থান ও মর্যাদা নির্ধারণের কাজও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

প্রসংগত উল্লেখ্য, কুরআন ও সুন্নাতের যে অংশ ঘটনাবলী ও ওয়াজ-নসীহতের সাথে সম্পর্কিত, কতিপয় ফকীহের মতে আইন প্রণয়নের জন্য সেগুলি সম্পর্কে অবহিত হওয়া জরুরী নয়। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, সমাজ জীবনকে উপলব্ধি করার এবং সেই দৃষ্টিতে আইনের স্থান ও মর্যাদা নির্ধারণ করার উপরন্তু আইনকে ফলপ্রসূ করার জন্য উক্ত প্রকার আয়াত ও হাদীসে অনেক পথ নির্দেশনা পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ইন্তিকালের পর বহুকাল যাবৎ (প্রায় একশ বছর) হাদীস সংকলনের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়নি। যদিও হাদীসের চর্চা হত। যখনই কোন উদ্ভূত সমস্যা বা প্রশ্নের মীমাংসার প্রয়োজন পড়ত অথবা সাহাবা (রা) কাহাকেও নেক কাজের উৎসাহ দান এবং কোন বদ কর্মের প্রতিরোধের জন্য হাদীসের ব্যবহার করতেন। চর্চা যথেষ্ট হলেও বহুদিন যাবৎ হাদীসের সংকলন এবং গ্রন্থায়ন সত্ত্বেও হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে এত বেশি সর্তকতা অবলম্বিত হয়নি। অন্যপক্ষে, ব্যক্তিগত স্বার্থে অথবা ইসলামী সমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পরবর্তী কালে জাল (مَوضوع = বানানো) হাদীস প্রচার করা হয়। কোন কোন বর্ণনাকারী সদুদ্দেশ্যে অর্থাৎ কোন সৎকাজে উৎসাহ প্রদানের জন্য জাল হাদীস বর্ণনা করেন।

পরবর্তীকালে যখন হাদীসের সংগ্রহ শুরু হলো তখন আসল আর নকল হাদীসের যাচাইয়ের জন্য প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণ কতকগুলি মানদণ্ড উদ্ভাবন করলেন, যা উসূল-ই হাদীস নামে ইসলামী জ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখা রূপে পরিচিতি লাভ করেছে।

হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা বিচারের জন্য রাবী (رَاوِى = বর্ণনাকারী) দের বিশ্বস্ততা যাচাইয়ের গরজে তাদের জীবনী সংগ্রহ করা হলো, তাঁদের ব্যক্তিগত চরিত্রের বিচার করা হল। তাতে সৃষ্টি হলো ইসলামী জ্ঞানের আরো একটি শাখা, যার নাম হচ্ছে "আসমাউ রিজালিল হাদীস"অর্থাৎ হাদীস বর্ণনাকারীদের নাম সংক্ষেপে "রিজাল" (رِجَال)। এতে লক্ষ লক্ষ রাবীর জীবনী সংগৃহীত হলো।

এভাবে হাদীসের বিচার করা হলো। যেমন এক ব্যক্তি বলছেন, তিনি অমুকের কাছ থেকে হাদীসটি শুনেছেন; কিন্তু দেখা গেল এই ব্যক্তির জন্মের পূর্বে সেই অমুক মারা গেছেন বা প্রমাণিত হলো তাদের দুজনার সাক্ষাতই ঘটে নাই। তাহলে হাদীসটি সত্য হতে পারে না রিওয়াতের দিক খেকে। তারপর দিরায়াত এর দিক থেকে বিচার হবে। দিরায়াতের মানদণ্ডগুলো নিম্নরূপ। হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে ঃ

১. যদি হাদীসটি কুরআন মজীদের কোন নীতি বা হুক্‌ম-এর বিরোধী না হয়।

২. যদি বাস্তব ঘটনাবলী ও চাক্ষুসভাবে দৃষ্ট অবস্থার বিপরীত না হয়।

৩. যদি সর্বসম্মত মূলনীতির বিরোধী না হয়।

৪. যদি কোন মুতাওয়াতির (مُتَوَاتِر)[৯৭] হাদীস ও সাহাবীগণের কার্যক্রমের বিরোধী না হয়।

৫. যদি قَلْبِ سَلِيم অর্থাৎ সুস্থ সত্যাশ্রয়ী হৃদয়জাত বুদ্ধির বিপরীত না হয়।

৬. যদি তাতে সুকসংস্কার প্রীতি ও অলীক কল্পনার প্রশ্রয় মূলক ভাবধারা না থাকে।

৭. যদি তাতে খুবই মামুলি ধরনের সৎকাজের জন্য তার পুরস্কারের কথা না থাকে।

৮. যদি হাদীসটি বর্ণনায় এমন গূঢ় কিছু না থাকে, যার ব্যাখ্যা বিশ্লেষ চলে না।

৯. যদি তাতে কারোর মর্যাদা (مَنَاقِب) ও শ্রেষ্ঠত্ব (فَضَائِل) বর্ণনায় বাড়াবাড়ি না থাকে।

১০. যদি তাতে কারো এমন ধরনের দোষের বর্ণনা না থাকে, যা কোন মানদণ্ডে গ্রহণযোগ্যবলে বিবেচিত হয় না।

১১. যদি তাতে এমন ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী না থাকে, যাতে নির্ধারিত বছর ও মাসের উল্লেখ রয়েছে।

১২. যদি হাদীসের বর্ণনা, ব্যবহৃত শব্দ ও বাক্যগুলি আরবী বাক্যরীতি ও ব্যাকরণের সাথে অসামঞ্জস্য না হয়।

১৩. যদি হাদীসের অর্থ ও তাৎপর্য নুবুওয়াতের মর্যাদার বিরোধী না হয়।[৯৮]

---

৯৭. মুতাওয়াতির সেই সহী হাদীস, যা প্রতি যুগে ও প্রতিটি স্তরে এত বেশি সংখ্যক রাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে তাদের পক্ষে মিথ্যা হাদীস তৈরী করার জন্য দলবদ্ধ হওয়া অকল্পনীয় –অনুবাদক

৯৮. ইজালা-ই নাফেআ এবং মুকদ্দামা ফতহুল মুল্‌হিম পৃষ্ঠা১৬ ইত্যাদি।

মুহাদ্দিসগণ উক্ত মানদণ্ডগুলি সামনে রেখে হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা বিচার করেছেন এবং তাঁদের গ্রন্থাদিতে হাদীসের جَرح وتَعديل (সমালোচনা ও সত্যতা নির্ধারণ)-এর বিস্তারিত বিবরণ দেখা যায়। কতিপয় মুহাদ্দিস বানোয়াট ও জাল হাদীসের সংকলন রচনা করেছেন। এ জাতের সংকলনসমূহে নিম্নোক্ত বর্ণনা পাওয়া যায় ঃ

كل حديث رايته يخالف العقول اويناقض الاصول فاعلم انه موضوع فلا يتكلف اعتباره اى لاتعتبر روايته ولاتنتظر فى جرحهم او يكون مما يدفعه الحسُّ والمشاهدة اومبائنا لنص الكتاب او السنة المتواترة او الاجماع القطعى حيث لايقبل شئ من ذلك التاويل ـ

"সুস্থ বুদ্ধির খেলাফ ও উসূল বিরোধী হাদীসকে বানোয়াট তথা জাল হাদীস মনে করতে হবে। তার রাবীদের ওপর আস্থা স্থাপন করা যাবে না। এমন হাদীসের বিচার বিশ্লেষণেরও কোন দায়িত্ব নেই, নিদ্বির্ধায় তাকে দোষ বলে পরিত্যাগ করতে হবে, যদি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ও প্রত্যক্ষ ব্যাপার ও অবস্থা বর্ণিত হাদীসকে রদ করে দেয়। কিংবা তা আল্লাহ্‌র কিতাব, রাসূলের মুতাওয়াতির সুন্নাত ও চূড়ান্ত 'ইজমা'-এর বিরোধী প্রমাণিত হয়। এসব দোষে দুষ্ট হাদীস সম্পর্কিত কোনো ব্যাখ্যা গৃহীত হবে না।[৯৯]"

হাদীসের অবস্থান নির্ধারণের ব্যাপারে সাহাবী (রা) গণের জীবনের গুরুত্ব

সাহাবার (রা) এবং তাঁদের অনুসারীদের সম্পর্কে কুরআন মজীদের ইরশাদ ঃ .

وَالسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّلَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ـ (التوبة : ١٠٠)

"মুহাজি ও আনসারদের মধ্যে যারা অগ্রগামী (সর্ব প্রথম ঈমান এনেছেন) এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছেন, তাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট আর আল্লাহ্ তাদের জন্য চিরন্তন নিয়ামতের জান্নাতসমূহ তৈরী করে রেখেছেন, যার নিম্নদেশ থেকে নদী প্রবাহিত। তারা চিরকাল এই নিয়ামত ও আনন্দময় জীবনে অবস্থান করবে। এটি অনেক বড় সাফল্য।"

আয়াতে اَلسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ (অগ্রগামী,সর্বপ্রথম ঈমান আনেন যারা) এবং اَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ (যাঁরা তাদের অনুসরণ করেন) বলে যে দুটি দলের উল্লেখ রয়েছে,

৯৯. মুকদ্দমাহ ফতহুল মুল্‌হিম ১৬ পৃষ্ঠা, তাযকিরাতুল মওদূ লি ইবনিল জাওযী।

তার মধ্যে প্রথম দলটি কুরআন মজীদ ও সুন্নাতে নববীর স্থান নির্ধারণ করেছেন এবং দুটির আলোকে আইন রচনা করেছেন। মুহাজির ও আনসারদের প্রথম শ্রেণী ছিল এই দলের কেন্দ্রীয় শ্রেণী। এরপর দ্বিতীয় দলটির স্থান। তারা নিষ্ঠা ও সততার সাথে এমনভাবে প্রথম দলটির অনুসরণ করেন যে, যা কিছু তাঁরা স্থির করে দিয়েছিলেন তাকে সনদ হিসেবে স্বীকার করে নেন এবং আইন উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে তাকে দলীল হিসেবেও ব্যবহার করেন। এই উভয় দলের জন্য رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ বাক্যটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলীল এবং অনেক বড় গ্যারান্টি। বিশেষ করে وَرَضُوْا عَنْهُ তে তাঁদের প্রকৃতি ও আল্লাহ্‌র আইনের প্রকৃতির মধ্যে সমতা ও সামঞ্জস্যের দলীল রয়েছে। اَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ (নিষ্ঠাসহকারে যারা অনুসরণ করেছে) এই শ্রেণীতে তাঁরাই গণ্য হবেন, যাঁরা রাসূলের সাহাবীগণের জীবনকে সনদ হিসেবে স্বীকার করে নেবেন এবং আইন প্রণয়ন ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে তাঁদের আলোক বর্তিকার সাহায্য নেবে। এরি ভিত্তিতে ফকীহগণ সাহাবীগণের কথা ও কর্মকে "সুন্নাত" এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। উসূলে ফিক্‌হের কিতাবগুলিতে সাহাবীগণের সম্পর্কে ফকীহদের এই অভিমত উল্লেখিত হয়েছে ঃ

يجب اجماعا فيما شاع فسكتوا مسلمين ولايجب اجماعا فيما ثبت الخلاف بينهم -

"যে বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রচলিত এবং সাহাবীগণ সে সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করেন এবং মেনে নেন, তাকে মেনে নেওয়া সর্বসম্মতভাবে (اِجماعا) ওয়াজিব। আর যে বিষয়ে তাঁদের মধ্যে মতভেদ প্রমাণিত হয়েছে তাকে মেনে নেওয়া সর্বসম্মতভাবে ওয়াজিব নয়।"[১০০] কেন মেনে নিতে হবে তার কারণ নিম্নরূপ ঃ

لان اكثر اقوالهم مسموع بحضرة الرسالة وان اجتهدوا فرأيهم اصوب لانهم شاهدوا موارد النصوص ولتقدمهم فى الدين وبركة صحبة النبى صلى اللّه عليه وسلم وكونهم فى خير القرون -

"কারণ তাঁদের অধিকাংশ কথা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছ থেকে শ্রুত। আর যদি তাঁরা ইজতিহাদ করেন তাহলে তাদের রায় সব চাইতে প্রকৃষ্ট। কারণ, তাঁরা কুরআন মজীদের বাক্যসমূহের (نَصّ বহুবচন نُصوص স্পষ্ট ও অবিসংবাদিত বাক্য) অবতরণের স্থান-কাল সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছেন। ঈমানে তাঁরা অগ্রবর্তী, নবী (সা)-এর সাহচর্য এবং তাঁর কাছ থেকে প্রশিক্ষণ লাভ করে তাঁরা ধন্য তাঁদের যুগ ছিল 'খায়রুল কুরূন' তথা সর্বোত্তম যুগ।"[১০১]

---

১০০. তাওযীহ তাল্‌বীহ, ২য়খণ্ড, ১৭পৃষ্ঠা।

১০১. তাওযীহ তালবীহ, ২য় খণ্ড, ১৭ পৃষ্ঠা।

এসব কারণে তাঁরা কোনো কথা নিজস্ব অভিমতের ভিত্তিতে বললেও অন্যদের কথার তুলনায় তা অনেক বেশি গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হয়। তাঁদের এই শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দেবার পরও ফকীহগণ স্থান-কাল নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিজেদের মত প্রকাশের অধিকার সংরক্ষিত রেখেছেন। তাঁহাদের মতে, সাহাবীদের রায় যদি এমন পর্যায়ের হয় যেখানে কিয়াস করার কোনো অবকাশ থাকে না, তাহলে সেক্ষেত্রে তাঁদের অনুসরণ ওয়াজিব, যদি কিয়াসের অবকাশ থাকে তাহলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কিয়াস করা যেতে পারে।"[১০২]

অবশ্য সব মানুষ যেমন সমান হয় না, সব সাহাবীও সমান ছিলেন না। জ্ঞান-গরিমা, বিদ্যা-বুদ্ধি, আমানতদারী, বিশ্বস্ততা, তাকওয়া এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাচর্য ও নৈকট্যের ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে পার্থক্য ছিল। কাজেই তাঁদের অনুসরণ এবং তাঁদের কথা ও কর্মের স্থান ও মর্যাদা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে অবশ্যি তাঁদের মধ্যে পার্থক্য করা হবে।

ইজ্‌মা' ঃ ইসলামী ফিক্‌হের তৃতীয় উৎস

ইজ্‌মা'র অর্থ ও তাৎপর্য

ইজ্‌মা'র আভিধানিক অর্থ দৃঢ় সংকল্প ও ঐকমত্য। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

فَاَجْمِعُوْا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ - (يونس : ٧١)

"তোমরা [নূহ (আ)-এর কাওম] নিজেদের ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্ত করে নাও এবং নিজেদের শরীকদেরকে জমায়েত করো।"

ফকীহ্‌গণের পরিভাষায় কোনো বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও সিদ্ধান্ত দানের যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের ঐকমত্যকে ইজ্‌মা' বলে। উসূলে ফিক্‌হের কিতাবসমূহে এই সংজ্ঞ উল্লিখিত হয়েছে ঃ

وهو اتفاق اهل الحل والعقد [১০৩] من امة محمد صلى الله عليه وسلم على امر من الامور -

"রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উম্মতের মধ্যে যারা বিশেষজ্ঞ ও সিদ্ধান্ত দানের যোগ্যতা সম্পন্ন, তেমন ব্যক্তিবর্গের কোনো বিষয়ে ঐকমত্যের নাম ইজমা।"[১০৪]

---

১০২. হুসামী, ৮৬ পৃষ্ঠা।

১০৩. حَلَّ = গ্রন্থি খোলা, عقد = গ্রন্থি লাগানো, সুতরাং যারা গিট বাঁধতে এবং খুলতে পারে তারা আভিধানিক অর্থে اهل الحل والعقد শরী'আতের ভাষায় আহলুল হাল্‌লি ওয়াল আক্‌দ বলতে বোঝায় জটিল সব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দানের যোগ্য ব্যক্তিগণ।

১০৪. মিনহাজুল উসূল (দ্র. হাশিয়া আত্‌তাকরীর ওয়াত্ তাহ্‌রীর, ২য় খণ্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা)।

অবস্থা ও চাহিদা দৃষ্টে মুসলিম মিল্লাতের স্বার্থ ও কল্যাণ সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ে ইজমা' হতে পারে। আসলে আইনকে অবস্থা ও সময়ের ছাঁচে ঢালাইয়ের জন্য ইজমা' এক ধরনের ইখ্‌তিয়ার, যা মূল শরী'আত প্রণেতা দান করেছেন এমন সব লোকদেরকে, যাঁরা ফিক্‌রী (চিন্তাগত) ও ইল্‌মী যোগ্যতার নিরিখে এই ইখতিয়ার ব্যবহারের যোগ্যতা রাখেন।

ইজমা'র গুরুত্ব ও প্রয়োজন

কুরআনী মূলনীতি এবং নবী (সা)-এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ব্যাপক হওয়া সত্ত্বেও তাতে নিত্য নতুন অবস্থা ও সমস্যার বিবরণ নেই। কুরআন ও সুন্নার ব্যাপকতা কেবল তিনটি বিষয়ে যা নিম্নের উদ্ধৃতি থেকে সুস্পষ্ট হচ্ছে ঃ

هو التنصيص على قواعد العقائد والتوفيق على اصول الشرع وقوانين الاجتهاد - لادراج حكم على كل حادثة فى القران -

অর্থাৎ "তা (اكملت لكم دينكم -এর অর্থ) হচ্ছে– ১. আকাইদ ও তৎসংক্রান্ত নীতির ব্যাখ্যা, ২. শরী'আতের মূলনীতির বর্ণনা এবং ৩. ইজতিহাদের নীতিমালার রূপরেখা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা; এমন নয় যে, ভবিষ্যতের সব সম্ভাব্য ব্যাপারের বিধান কুরআনে ভরে দেয়া হয়েছে।"

এ থেকে বোঝা গেল, যুগে যুগে যেসব প্রশ্নের উদ্ভব হবে তার জবাব খুঁজতে হবে ইজতিহাদের মাধ্যমে। এই ইজতিহাদ এককভাবেও হতে পারে, সমষ্টিগতভাবেও হতে পারে। একের ইজতিহাদমূলক রায়-এ অপরের সম্মতিও পাওয়া যেতে পারে, অর্থাৎ إجماع স্থাপিত হতে পারে।

কুরআনে ইজ্‌মা'র ভিত্তি

কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলিতে ইজমা'র ভিত্তি পাওয়া যায় ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ -

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌র আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যকার নেতৃস্থানীয়দের আনুগত্য করো" (আন-নিসা ঃ ৬৩)।

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَاتَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ -

"(হিদায়েত বা সৎপথ সুস্পষ্ট হয়ে যাবার পর) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাসূলের বিরোধিতা করে এবং মু'মিনদের পথ ছেড়ে অন্যপথে চলতে থাকে, আমি তাকে সেদিকেই নিয়ে যাবো যেদিকে সে যাওয়া পছন্দ করে নিয়েছে এবং তাকে জাহান্নামে পৌছিয়ে দেবো" (আন-নিসা ঃ ১১৫)।

وَكَذَالِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ -

"আর এভাবে আমি তোমাদের মধ্যবর্তী (অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ) উম্মত হিসাবে তৈরী করেছি, যাতে তোমরা সমস্ত মানুষের জন্য সত্যের সাক্ষ্যদানকারী হও" (আল-বাকারা ঃ ১৪৩)।

এই আয়াতগুলি এবং এই ধরনের আরো বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে ফকীহগণ ইজমা' ও তার গুরুত্ব প্রমাণ করেছেন। অধিকন্তু এর স্বপক্ষে তাঁরা এমন সব হাদীস পেশ করেছেন, যেগুলি মূলত জামা'আতের গুরুত্ব সুস্পষ্ট করে।[১০৫]

ইসলামের শূরা (شُورى) ব্যবস্থা

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হুকুম দেয়া হয়েছে ঃ

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ -

"কাজেকর্মে তাদের (সাহাবার) সাথে পরামর্শ করো। (পরামর্শের পর কোনো বিষয়ে) যখন তুমি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হও তখন আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করো। সে কাজে এগিয়ে যাও। (আলে-ইমরান ঃ ১৫৯)

কুরআন মজীদে হযরত (সা) এবং মুসলিমদের ব্যবহারিক জীবনের একটি রীতির প্রশংসাসূচক বর্ণনা রয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতাংশে।

وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ - (الشورى : ٣٨)

"এবং তাদের সব ব্যাপার পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে (সম্পন্ন হয়)।

এই শুরা (شُورى) মু'মিনদের সমষ্টিগত পারিবারিক বা সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় জীবনের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নীতি। রাসূল (সা) অহীর সাহায্যে সব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা তাই হতো। কিন্তু আল্লাহ্ সব বিষয়ে অহী নাযিল না করে বরং তাঁর রাসূলকে আদেশ দিচ্ছেন সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করার জন্য এবং এ আদেশ পালনের জন্য মু'মিনদের প্রসংশা করছেন। এই شُورى হচ্ছে اِجماع -এর ভিত্তি; এতে যে ঐকমত্য স্থাপিত হবে তা মেনে চলা মু'মিনদের জন্য ওয়াজিব।

---

১০৫. এজন্য উসূলে ফিকহের কিতাবগুলি দেখুন।

রাসূল (সা) বলছেন ঃ لَايَجْتَمِعُ اُمَّتِىْ عَلَى الضَّلَالَةِ ـ

"আমার উম্মত কখনো গোমরাহীর (পথভ্রষ্টতার) উপর একমত হবে না।"

مَارَاٰهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ ـ

"মুসলিম উম্মাহ যে ব্যাপারকে ভালো মনে করবে আল্লাহ্‌র কাছেও তা ভালো।"

এই দুটো হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর উম্মতের প্রতি যে আস্থা প্রকাশ করেছেন তা অবিসংবাদিতভাবে উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তি সম্পর্কে হতে পারেনা। এ কথাটিই ফকীহগণ স্পষ্ট বলেছেন ঃ

لاَ اعتبار بقول العوام فى الاجماع لا وفاقا ولاخلافا عند الجمهور لانهم ليسوا من اهل النظر فى الشرعيات ولايفهمون الحجة ولايعقلون البرهان ـ

"ইজমা'র ক্ষেত্রে পক্ষে বিপক্ষে সাধারণ মানুষের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, সবাই শরী'আতের ব্যাপারে গভীর দৃষ্টির অধিকারী নয়, দলীল-প্রমাণ অনুধাবনের ক্ষমতাও সবার থাকার কথা নয়।" সংগত কারণেই ফকীহগণ কতগুলি শর্ত নির্ধারণ করেছেন।[১০৬]

সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর কর্মপদ্ধতি

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরে সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর কর্মধারা থেকেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ইজমা দলীল-এর মর্যাদাসম্পন্ন এবং ফকীহগণ বৈধ ইজমা'র জন্য যত সব কড়া শর্ত নির্ধারণ করেছেন, তা সবই সাহাবা-ই কিরাম (রা)-এর যুগেই বাস্তবায়িত হয়েছে। আবূ বকর (রা) ও উমর (রা) তাঁদের খিলাফত আমলে স্থানীয় উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী (রা)গণকে পারতপক্ষে মদীনার বাইরে যেতে দিতেন না যাতে নুতন কোন সমস্যা সামনে এলে তাঁদের সবাইকে নিয়ে পরামর্শ করা সম্ভব হতো এবং তাঁদের ঐকমত্যে (اِجماع) যা স্থিরীকৃত হতো সবাই তা মেনে নিত এবং তাই বাস্তবায়িত হতো। উমর (রা)-এর খিলাফত আমলে বিপুল পরিমাণ নতুন সমস্যা দেখা দেওয়ায় ইজমা'-এর দৃষ্টান্ত অনেক বেশি পাওয়া যায়। এই আমলে হজ্জের জমায়েতকেও ইজমা'-এর কাজে লাগান, মিল্লাতের শ্রেষ্ঠ মননশীল বহু ব্যক্তিত্বের সমাবেশ উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে ইজমা'য়ে উপনীত হওয়ার পক্ষে অতীব উপযোগী ছিল এবং বরাবরই থাকবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পরবর্তী যুগে হজ্জের সম্মেলনকে ইজমা-এর জন্য যথাযথভাবে ব্যবহার করা হয়নি।

১০৬. হুসূলুল্ মামুল মিন ইলমিল উসূল, ৩৯পৃষ্ঠা, খুলাসা ঃ ইরশাদুল ফুহূল লিতাহকীকিল হাক্কে মিন ইলমিল উসূল ঃ শাওকানী।

ইজমা'র যৌক্তিকতা

জনৈক ফকীহের নিম্নোক্ত মন্তব্যে ইজমা-এর যৌক্তিকতা সুস্পষ্ট ঃ

لان الاجماع انما عرف حجة كرامة لهذه الامة لحاجتهم الى ذلك لان النبى صلى اللّه عليه وسلم خاتم الانبياء ومتى وقعت حادثه ليس فيها نص قاطع وعملوا فيها بالاجتهاد وهو محتمل للخطاء وجازان يكونوا على الخطاء كان قولا بخروج الحق عن جميع الامة وانه لايجوز ومس الحاجة الى تجديد الرسالة ولاوجه اليه لاخبار اللّه تعالى بكون رسولنا خاتم الانبياء فصار الاجماع حجة لهذه الحاجة ـ

"উম্মতে মুহাম্মদীর মর্যাদা এবং তাদের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে ইজমা'কে (حُجة) অর্থাৎ দলীলরূপে নির্ধারিত করা হয়েছে। রাসূলে করীম (সা) ছিলেন শেষ নবী। (তাঁর ওফাতের পর) উম্মতের সামনে যদি এমন কোন পরিস্থিতি দেখা দেয় যে সম্বন্ধে কোনো সুস্পষ্ট বিধান (نَص) (কিতাবে এবং সুন্নাতে) না থাকে, তখন উম্মত (ব্যক্তিগতভাবে) চিন্তা-ভাবনা বা ইজতিহাদ করতে বাধ্য হবে। অথচ ইজতিহাদে ভুলের সম্ভাবনা যথেষ্ট। যদি তারা নিজ নিজ ইজতিহাদ অনুযায়ী কাজ করে তবে সমগ্র উম্মতের সত্য চ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং এ ভুল সংশোধনের জন্য রিসালাতের নবায়নের অর্থাৎ পুনরায় রাসূল প্রেরণের প্রয়োজন হবে, যা বর্তমানে অসম্ভব, কারণ আল্লাহ্ আমাদের রাসূল (সা)-কে পাঠিয়ে রেসালাতের সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন। এই পরিস্থিতি মুকাবিলার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা শরীআ'তের অন্যতম উৎস এবং حجة রূপে গণ্য করেছেন ইজমা'কে যা আসলে (Consensus বা ইজতিহাদের সমষ্টিগত রূপ। এতে রয়েছে উম্মতে মুহাম্মদীর প্রতি বিশেষ রাহমাতের প্রকাশ।[১০৭]

ইজমা'কারীদের যোগ্যতা

ফিক্‌হের পরিভাষায় যাঁরা আহ্‌লুল হাল্লি ওয়াল আক্‌দ (اَهل الحَل العَقد) অর্থাৎ যাঁরা তাঁদের যোগ্যতার দাবিতে ইজমা'তে শরীক হতে পারেন এবং যাঁদের সিদ্ধান্ত ইজমা'রূপে মুসলিম জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে এবং গ্রহণ আবশ্যিক হবে, তাঁদের যোগ্যতা হতে হবে অতি উন্নতমানের এবং সে যোগ্যতা দু রকমের ঃ

এক. ইল্‌মী (علمى) বা জ্ঞানগত যোগ্যতা, যথা ঃ এক, حِكمة -এর পর্যায়ে কুরআন মজীদের জ্ঞান; অন্তত পক্ষে গভীর জ্ঞান (এ উভয় পর্যায়ের আলোচনা ইতিপূর্বে হয়েছে)। কুরআনের শুধুমাত্র অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা যথেষ্ট নয়।

---

১০৭. আত্‌তাক্‌রীর ওয়াত তাহ্‌রীর, ৩য় খণ্ড, ১১২ পৃষ্ঠা।

দুই. সুন্নাতকে রেওয়ায়েত ও দেরায়েতের মানদণ্ডে যাচাই করার পদ্ধতি সম্পর্কে পুরোপুরি অবগতি এবং তা প্রয়োগের সঠিক স্থান-কাল নির্ণয়ের যোগ্যতা।

তিন. রাসূল (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর জীবন ধারার সাথে পরিচিতি তাঁদের ইজমা' ও ফায়সালা সম্পর্কে পূর্ণ অবগতি।

চার. কিয়াসের মাধ্যমে বিধান উদ্ভাবনের নীতি-পদ্ধতির জ্ঞান।

পাঁচ. দেশ ও জাতির স্বভাব-প্রকৃতি, অবস্থা, চাহিদা, রীতি-রেওয়াজ, অভ্যাস ও আচার-আচরণ সম্পর্কে অবগতি।

এই ইলমী যোগ্যতা সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে ঃ

الاجماع المعتبر فى فنون العلم هو اجماع اهل ذلك الفن العارفين به دون غيرهم فالمعتبر فى الاجماع فى المسائل الفقهية قول جميع الفقهاء وفى المسائل الاصولية قول جميع الاصولين وفى المسائل النحوية قول جميع النحويين ومن عدا اهل ذلك الفن هو فى حكم العوام -

"জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ইজমা'র ক্ষেত্রে এমন সব লোকের ইজমা' নির্ভরযোগ্য হবে, যারা সংশ্লিষ্ট জ্ঞান শাখায় গভীর অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হবেন, অন্যদের ইজমা' গৃহীত হবে না; যথা ফিক্‌হ সংক্রান্ত বিষয়ে ইজমা' হবে ফকীহগণের মতের ঐক্যে, তদ্রূপ উসূল সংক্রান্ত মাসায়েলে উসূলবিদগণের এবং ব্যাকরণ সংক্রান্ত সমস্যায় ব্যাকরণবিদগণের ঐকমত্যের ভিত্তিতে। সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রে জ্ঞানহীন ব্যক্তিরা عوام বা সাধারণ মানুষের শামিল।[১০৮]

২. 'আমালী (عملى) যোগ্যতা অর্থাৎ شورى তে অংশ গ্রহণে যোগ্য বিবেচিত হবেন এমন ব্যক্তিত্ব, যাঁর ক্রিয়াকলাপ উন্নত চরিত্রের পরিচায়ক, যিনি শরী'আতের সকল নির্দেশ পালনকারী ও সকল নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে দূরে অবস্থানকারী অর্থাৎ যথার্থ মুত্তাকী; তবে তাক্‌ওয়ার কোনো বিশেষ মানদণ্ড নির্ধারিত নেই, ফাসেকী অর্থাৎ শরী'আত বিরোধী কর্ম, অশ্লীলতা, বিদআতসমূহ থেকে মুক্ত থাকা এবং অশালীনতা আর পাপের স্পর্শ থেকে সাবধানতা অবলম্বন যথেষ্ট। ফকীহগণের বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

ان كان معلنا بفسقه فلا يعتد بقوله فى الاجماع وان كان غير مظهر له يعتد بقوله فى الاجماع -

---

১০৮. হুসূলুল মামুল মিন 'ইলমিল উসূল, ৪০পৃষ্ঠা, মুলাখ্‌খাস ইরশাদুল ফুহূল ইলা তাহ্‌কীকিল হাক্কি মিন 'ইলমি'ল উসূল লিশ শওকানী।

"যদি প্রকাশ্যে ফাসেকীতে লিপ্ত থাকে তাহলে ইজমা'র ব্যাপারে তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু যদি তার ফাসেকী অপ্রকাশিত থাকে (এবং ইলমী ও দৃশ্যত আমালী যোগ্যতা থাকে) তাহলে ইজমা'তে তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে।"[১০৯]

তেমনি অশালীন, নির্লজ্জ, পাপ বর্জনে অসাবধান ব্যক্তির মত ইজমা'-এর ক্ষেত্রে অগ্রহণীয়।[১১০]

আসলে ফিস্ক ও বিদ'আত মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের ওপর অত্যন্ত গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ফলে তার ঈমানী সচেনতা ও বুদ্ধি লোপ পায় এবং তার মধ্যে সৃষ্টি হয় নাহক ও বাতিলের ফায়সালা করার ক্ষমতা, যাকে কুরআন মজীদে فُرْقَانٌ বলা হয়েছে ঃ

يَـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَتَّقُوْا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا ـ (انفال : ٢٩)

"হে ঈমানদারনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাকো (এবং তাঁর নাফরমানী থেকে দূরে থাকো) তাহলে তিনি তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি করবেন ফুরকান অর্থাৎ হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য এবং ফায়সালা করবার ক্ষমতা।" (আনফাল ঃ ২৯)

কমপক্ষে তিন ব্যক্তির ঐকমত্য ইজমা' রূপে গণ্য

ইজ্মা'-এর জন্য বিপুল সংখ্যক ব্যক্তির মতৈক্য জরুরী নয়। অধিক সংখ্যক যোগ্যতাসম্পন্ন না পাওয়া গেলে অন্তত পক্ষে তিন জনের মতৈক্যেও ইজ্মা' হতে পারে। তবে যতজনই উপস্থিত থাকেন তাঁদের সবার অবশ্যি সমগ্র মুসলিম উম্মা কর্তৃক নির্বাচিত হতে হবে অথবা মুসলিম উম্মার উলামার মধ্যে ইল্ম ও আমলের বিচারে বিশিষ্ট হতে হবে। সবাইকে অবশ্যি একমত হতে হবে, তাও জরুরী নয়। অধিকাংশের ঐকমত্যই যথেষ্ট, সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর কর্মধারা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। ইমাম গাযালী (র) বলেন ঃ انه ينعقد مع مخالفة الاقل ـ[১০৯]

"সংখ্যা লঘুর ভিন্নমত সত্ত্বেও (সংখ্যাগুরুর মতৈক্যে) ইজমা' স্থাপিত হয়। অন্যপক্ষে একথা সত্য, ইসলামের দৃষ্টিতে যে কোন সংখ্যা গরিষ্ঠের ফায়সালা নির্ভরযোগ্য নয়। ইসলামে শুধুমাত্র মাথা গুণতি অভিমত যাচাইয়ের বিশেষ কোন গুরুত্ব নেই, বরং অভিমত প্রদানকারীদের ধ্যানধারণা ইল্ম এবং আমলী যিন্দেগীর প্রকৃষ্টতা বিচার্য। সুতরাং ইজমার জন্য নির্বাচিত ব্যক্তিগণ হবেন ইল্ম ও আমলের ভিত্তিতে বাছাই করা ব্যক্তিত্ব। জ্ঞানী, প্রজ্ঞাসম্পন্ন এবং মুত্তাকী ব্যক্তির মতবিরোধেরও

---

১০৯. আত্তাকরীর ওয়াত্ তাহরীর, ৩য় খণ্ড, ৯৬ পৃষ্ঠা।

১১০. তাওযীহ তালবীহ, ৪৬ পৃষ্ঠা।

১১১. হুসূলুল মামূল মিন ইলমিল উসূল, ৪০ পৃষ্ঠা।

গুরুত্ব থাকে, কারণ তা হয় যুক্তি এবং দলীল ভিত্তিক, নেহায়েত স্বার্থান্ধতা বা বিরোধ-প্রবণতা প্রসূত হয় না এবং এই কারণে এই মতবিরোধ মুসলিম জগণের মধ্যে বিভেদ বা বিপর্যয় সৃষ্টি করেনা; বরং এই মতবিরোধ চিন্তাশীল মুসলিমদের জন্য চিন্তা চর্চার খোরাক জোগায়। উদাহরণ স্বরূপ ইসলামী ফিক্‌হের ইমামগণের মতানৈক্যের কথা বলা যেতে পারে। তাঁদের মতানৈক্য গবেষণার জোয়ার এনে দিয়েছে, যাতে ফিক্‌হ সাহিত্য এক বিরাট সমুদ্রের আয়তন লাভ করেছে।

ইজমা'র বাস্তব রূপ যুগের অবস্থার ওপর নির্ভরশীল

একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে ঃ ইজ্‌মা'তে শরীক হবার যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের নির্বাচন হবে কিভাবে? সন্দেহ নেই, ইসলামের কেবল একটি নির্বাচন পদ্ধতির নির্দেশ আমরা পাই। পূর্বে বলা হয়েছে, হযরত উমার (রা)-এর আমল পর্যন্ত 'আহ্‌লুল হাল্লি ওয়াল' আক্‌দ' বলে বিবেচিত ব্যক্তিগণকে পারতপক্ষে মদীনার বাইরে পাঠান হত না। এদের সিলেকশান বা নির্বাচন কিভাবে হত? ভোট বা ব্যালটের মাধ্যমে নয়, বরং খ্যাতি (reputation)-এর ভিত্তিতে– কে কতটা কুরআন আয়ত্ত করেছে, হযরতের সাহচর্যে কে কতটা সার্থক শিক্ষা অর্জন করেছে, ইসলামের খিদমতে কে কত অগ্রগামী ইত্যাদির বিবেচনায় তাঁদের নির্বাচন হয়েছিল এবং এই নির্বাচন ছিল হক্কানী মানুষের প্রকৃতিগত গুণগ্রাহীতার আদলে, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। তারপরও সাহাবা (রা) নানা কারণে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লেন, রাষ্ট্রের কেন্দ্র মদীনা থেকে সরে গেল বিভিন্ন স্থানে। সুতরাং ইজমা'তে অংশ গ্রহণের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা কোন এক কেন্দ্রস্থান থাকলেন না। কিন্তু বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন উলামাকে পরিকল্পিতভাবে কোন স্থানে সমবেত করা অত্যন্ত সহজসাধ্য, আঞ্চলিক সমাবেশও হতে পারে। লিখিতভাবে মতবিনিময়ের মাধ্যমেও ইজমা' সম্ভব। যেমন করেই মুসলিম জগৎ কোন বিতর্কিত বিষয়ে ইজমা'র প্রতিষ্ঠা করতে চাইবে, ইজমা'তে রায় প্রদানকারীদের নির্বাচন-নীতি হতে হবে মদীনার সেই নীতি– আহ্‌লুল হাল্লি ওয়াল আক্‌দ নির্বাচনের নীতি। মুসলিম বিশ্বের নেতৃবর্গ যোগ্য 'উলামার প্যানেল তৈরী করতে পারেন, ইজমা' সৃষ্টির জন্য মজলিস-এ-শূরা স্থাপন করা যেতে পারে। যুগের অবস্থা ও চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গৃহীত হবে।

ইজমা'র পরিধি

اهل الحل والعقد -এর ইজমা' মুসলিম উম্মার ব্যবহারিক জীবনের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে পারে। উলামা-ই-ইসলামের মতে, নিম্নোক্ত ব্যাপারগুলি ইজমা'-এর আওতাভুক্ত।

এক. অবস্থা ও চাহিদার প্রেক্ষিতে নতুন আইন রচনা।

দুই. পূর্ববর্তী কোন ইজমা' ভিত্তিক ফায়সালাতে পরিবর্তিত অবস্থা অনুযায়ী যথোপযুক্ত সংশোধন।

তিন. সাহাবী (রা) গণ যেসব বিধানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন দলীল ও যুক্তির ভিত্তিতে সেগুলির মধ্যে কোটি অবস্থা দৃষ্টে অগ্রাধিকার পেতে পারে তা স্থির করা।

চার. ফকীহগণের বিভিন্ন রায়ের মধ্যে অবস্থার প্রেক্ষিতে পরিবর্তন বা অগ্রাধিকার নির্ণয় করা।

উসূলের কিতাবগুলিতে নিম্নোক্ত বক্তব্য পাওয়া যায় ঃ

والاجماع فى كونه حجة اقوى من الخبر المشهور واذا كان يجوز النسخ بالخبر المشهور فجوازه بالاجماع اولى ـ

"মশহূর হাদীসের[১১২] তুলনা ইজমা' অধিকতর শক্তিশালী প্রমাণ। কাজেই মশহূর হাদীস যদি কোন বিধানকে নাস্‌খ (نَسخ = নাকচ) করতে পারে, তাহলে ইজমা' অধিকতর যৌক্তিক ভাবে নাস্‌খ করতে পারে।[১১৩]

ويتصور ان ينعقد اجماع بمصلحة ثم تتبدل تلك المصلحة فينعقد اجماع اخر على خلاف الاجماع الاول ـ

"এ কথাটি বোধগম্য, কোন কল্যাণকর ব্যাপারের প্রেক্ষিতে একটি ইজমা প্রতিষ্ঠিত হল, তারপর সেই ব্যাপারটি পরিবর্তিত হয়ে গেলে প্রথম ইজমা'র বিপরীত আর একটি ইজমা' প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।[১১৪]

এ উক্তির সমর্থনে প্রমাণ হিসাবে ফকীহগণ সাহাবীগণের (রা) কার্যক্রম থেকে বিভিন্ন উদাহরণ তুলে ধরেছেন।

ইজমা' ভিত্তিক ফায়সালার মর্যাদা

ইসলামী আইন ব্যবস্থায় ইজমা' খুব গুরুত্বের অধিকারী। উসূলের কিতাবসমূহে বলা হয়েছে ঃ

فان استنبط المجتهدون فى عصر حكما واتفقوا عليه يجب على اهل ذلك العصر قبوله ـ فاتفاقهم صار بينة على ذلك الحكم ـ فلايجوز بعد ذلك مخالفتهم ـ[১১৫]

---

১১২. বর্ণনার প্রতিটি স্তরে যে হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা অন্তত তিনজন, তাকে মশহূর হাদীস বলে। একে এক অর্থে খবরে ওয়াহিদও বলা হয়। খবরে ওয়াহিদের সাহায্যে ইয়াকীন (পূর্ণ বিশ্বাস) অর্জিত হয় কিনা এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। –অনুবাদক

১১৩. আত্‌তাকরীর ওয়াত্ তাহরীর, ৩য় খণ্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা।

১১৪. আত্ তাকরীর ওয়াত্ তাহরীর, ৩য় খণ্ড, ৭০ পৃষ্ঠা।

১১৫. তালবীহ এর টীকা তওযীহ, ৫০ পৃষ্ঠা।

"মুজতাহিদগণ যখন কোনো যুগে কোনো বিধান উদ্ভাবন করেন এবং তাঁরা তাতে একমত হন তখন সমকালীন মুসলিমদের জন্য তা গ্রহণ করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। এর বিরোধিতা করা জায়িয নয়, কারণ এই মতৈক্য সংশ্লিষ্ট বিধানের দলীল স্বরূপ।"

তবে ইজমা' ভিত্তিক ফায়সালা যেহেতু যুগের চাহিদা অনুযায়ী হয়ে থাকে এবং সমকালীন ফকীহগণের চিন্তা-চেতনার প্রভাব থাকে তার ওপর, তাই বিশেষ করে সমকালীন লোকদের জন্য এই ইজমা'র অনুসরণ করা ওয়াজিব হবে। পরবর্তী যুগে কিংবা একই যুগে অবস্থার পরিবর্তনে ফয়সলা বদলে যেতে পারে।

মৌন (سكوتى) ইজমা'

ইজমা'র একটি ধরন হচ্ছে 'ইজ্‌মা সুকূতী' (নীরব বা মৌন সম্মতিমূলক ইজমা) নিম্নোক্ত উক্তিতে এর সংজ্ঞা পাওয়া যায় ঃ

وهو ان يقول بعض اهل الاجتهاد بقول وينتشر ذلك فى المجتهدين من اهل ذلك العصر فيسكتون ولايظهر منهم اعتراف ولاانكار -

"ইজতিহাদের যোগ্যতাসম্পন্ন এক বা একাধিক ব্যক্তি কোনো রায় প্রকাশ করলেন এবং এ রায় অন্যান্য মুজতাহিদদের মধ্যে প্রচার লাভ করলো অথচ তাঁরা নীরবতা অবলম্বন করলেন, না স্বীকৃতি দিলেন আর না অস্বীকার করলেন; একে বলে ইজমা' সুকূতী। এরূপ ইজমাও حجة বা দলীলরূপে বিবেচিত হয়।[১১৬]

বলাবাহুল্য, এই নীরবতা স্বীকৃতির প্রমাণ রূপে বিবেচিত হবে, যদি মত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে। মত প্রকাশ বিঘ্নিত বা শর্ত সাপেক্ষ হলে নীরবতার অন্য কারণ ও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে নীরবতা সম্মতিসূচক বিবেচিত হবে না।

একটি বিভ্রান্তি

সাধারণ প্রচলিত একটি ভ্রমাত্মক মত এই যে, ইজমা'র জন্য যেহেতু সমগ্র উম্মতের ঐকমত্য জরুরী, অথচ বাস্তবে তা সম্ভব নয়; তাই ইজমা'ও সম্ভব নয়। হযরত শাহ্ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (র) এই বিভ্রান্তির জবাব দিতে গিয়ে বলেন ঃ

"লোকেরা যে ধরনের ইজমা'র কথা কল্পনা করে অর্থাৎ সমগ্র উম্মতে মুসলিমা; তাতে সুস্পষ্ট ঐকমত্যে পৌছবে এবং কেউ দ্বিমত পোষণ করবে না, এ ধরনের চিন্তা উদ্ভট এবং এটা আদৌ বাস্তব ভিত্তিক নয়। তবে অধিকাংশ ইজমার ক্ষেত্রে দেখা গেছে

---

১১৬. হুসূলাল মামূল মিন ইল্‌মিল উসূল, ৩৮পৃষ্ঠা।

শহরের মুফতীদের মধ্যে থেকে সিদ্ধান্ত দান করার যোগ্যতা সম্পন্ন গোষ্ঠীর ঐকমত্য স্থাপিত হয়েছে। উমর ফারূক (রা)-এর সময় যেসব মাসায়েল সম্পর্কে একথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয় যে, সিদ্ধান্ত দান করার যোগ্যতা সম্পন্ন গোষ্ঠী একমত হয়েছিলেন, সেক্ষেত্রেও এই ধরনের ইজমা'র সন্ধান পাওয়া যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে হয়েছে এমন ধরনের ইজমা', যে ক্ষেত্রে বহু সংখ্যক উলামার ফতোয়া এবং বাকি লোকদের নীরবতা রয়েছে। তারপরের পর্যায়ে হচ্ছে এমন ধরনের ইজমা', যে ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন দুটি বক্তব্য থাকে, যা তৃতীয় বক্তব্যেকে নাকচ করে দেবার ব্যাপারে মতৈক্যে পৌছায়। আর এরপর হচ্ছে, হারামাইন শারীফাইন (মক্কা ও মদীনা)-এর অধিবাসীগণ ও খলীফাগণের মতৈক্য।"

মোটকথা, ইজমা'র ব্যাপারটি তেমন জটিল নয়, যেমনটি মনে করা হয়ে থাকে। আবার ব্যাপারটি খুব সহজও নয়। অযোগ্য লোকদের একটা কমিটির কোনো ফায়সালাকে কখনো ইজমার মর্যাদা দেয়া যেতে পারে না।

ইসলামী ফিক্‌হের চতুর্থ উৎস ঃ কিয়াস

কিয়াসের তাৎপর্য ও সংজ্ঞা

কিয়াসের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে পরিমাপ, তুলনা, নমুনা, সাদৃশ্য, তর্কশাস্ত্রের syllogism ইত্যাদি। ফকীহগণের পরিভাষায় 'ইল্লাত' (علة) বা কার্যকারণের ভিত্তিতে পূর্ববর্তী ফায়সালা ও নযীরের আলোকে নতুন সম্যার সমাধানের সন্ধান করাকে কিয়াস বলা হয়। এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ ঃ

تقدير الفرع بالاصل فى الحكم و العلة ـ

"হুকুম ও ইল্লাত এর বিবেচনায় মূল (اصل। অর্থাৎ পূর্বতন হুকুম)-এর আদলে শাখা (فرع অর্থাৎ নতুন প্রশ্ন)-এর স্বরূপ নির্ণয় করা।[১১৭] আরো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা হচ্ছেঃ

الحاق امر بامر فى الحكم الشرعى لاتحاد بينهما فى العلة ـ

শরী'আত-এর বিধানের ক্ষেত্রে একটি ব্যাপারকে অন্য একটি ব্যাপারের সাথে যুক্ত করে দেয়া উভয়ের ইল্লতের মধ্যে ঐক্যের কারণে, উদ্ভূত কোন কোন প্রশ্নের জবাব সহজে লাভ করা যায় কুরআন ও সুন্নায় সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখিত বিধানের শব্দাবলী ও অর্থ থেকে। এর জন্যে ফকীহ খুব গভীরে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন না। অন্যপক্ষে এমন কতিপয় সমস্যা দেখা দিতে পারে, যে ক্ষেত্রে সদৃশ বিধান সহজ নয়, বরং إستنباط অর্থাৎ উদ্ভাবনের প্রয়োজন পড়ে এবং ইল্লাতের সন্ধান করতে হয়। আসলে এটি হচ্ছে কিয়াসের প্রকৃত ক্ষেত্র।

---

১১৬. নূরুল আনওয়ার, ২২৪ পৃষ্ঠা।

কুরআনে কিয়াসের ভিত্তি

কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতগুলিকে কিয়াসের ভিত্তি হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে ঃ فَاعْتَبِرُوْا يٰأُولِى الْاَبْصَارِ ـ (الحشر : ٤)

"কাজেই হে চক্ষুষ্মান (চিন্তাশীল) ব্যক্তিরা! তোমরা (এ থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করো"। فاعتبروا (শিক্ষা গ্রহণ করো) কথাটির ব্যাখ্যায় ফকীহগণ বলেছেন ঃ

رد الشئ الى نظيره اى الحكم على الشئ بما هو ثابت لنظيره ـ

"কোনো ব্যাপারকে তার نظير বা সদৃশ্যের সাথে যুক্ত করে দেয়া অর্থাৎ নযীরের বেলায় যে হুকুমটি প্রতিষ্ঠিত, এর বেলায়ও সেই হুকুমটি প্রয়োগ করা[১১৮]।"

আয়াতের فَاعتبروا কথাটির মধ্যে اِستنباط অর্থাৎ উদ্ভাবনের আদেশের ইংগিত রয়েছে। এই উদ্ভাবন ক্ষমতাকে কুরআন মজীদে 'তাফাক্কুহ' (تَفقه) নামে অভিহিত করা হয়েছে ঃ

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةَ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ ـ (التوبة : ١٢٢)

ভাবার্থ ঃ মুসলিমদের মধ্যে থেকে একটি طَائِفة (ছোটদলকে) দীনের ব্যাপারে গভীর অন্তর্দৃষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে (শিক্ষা) সফর করা উচিৎ। এই طائفة হচ্ছে পূর্ববর্তী আয়াতের اُولى الاَبصار বা চিন্তাশীল ব্যক্তিরা, যাদের উপর আল্লাহ্ আহকাম উদ্ভাবনের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন এবং রাসূল (সা) যাদেরকে হিকমত (তত্ত্বজ্ঞান) শিক্ষা দিতেন। যেমন– ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ـ (ال عمران : ١٦٤)

কুরআন মজীদে এই ক্ষুদ্র দলকে কখনো কখনো اولوا الالباب অর্থাৎ মস্তিষ্কধারীও বলা হয়েছে। তাদের সম্বন্ধে اَلذين يَستنبطونه অর্থাৎ যারা উদ্ভাবনকারী এইরূপ শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

কিয়াসের মাধ্যমে আহকাম উদ্ভাবনের ব্যবস্থা এজন্য করা হয়েছে যেন ইসলামী শরী'আত সর্বকালীন ব্যবস্থা রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে আর মুসলিমগণকে কখনও নতুন কোন জীবন ব্যবস্থার সন্ধানে হয়রান হতে না হয়।

প্রসংগত উল্লেখ্য, কুরআন ও সুন্নাহ্‌র বহু বিধানের সাথে তাদের 'ইল্লাত' ও লক্ষ্য (غَاية) বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। যেমন মদ্য পান হারাম এই বিধানের ইল্লত হচ্ছে سكر অর্থাৎ এই ইল্লত যত সব বস্তুতে থাকবে সবই হারাম, যেমন গাঁজা, আফিম ইত্যাদি; আর এই হুকুমের غاية বা লক্ষ্য হচ্ছে عَداوة وبَغضاء (শত্রুতা এবং হিংসা) থেকে সমাজকে রক্ষা করা।

---

১১৮. তালবীহ তওযীহ, ৫৪ পৃষ্ঠা।

কিয়াসের বিরুদ্ধে মতবাদ

কিয়াসের পক্ষে বলিষ্ঠ প্রমাণ এমন সব আয়াতেই রয়েছে, যেগুলোকে কিয়াসের বিরুদ্ধেও পেশ করা হয়ে থাকে। যেমন ঃ

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ - (النحل : ٨١)

"সমস্ত ব্যাপারে বর্ণনা প্রদানের জন্য আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি।"

وَلَارَطْبٍ وَّلَايَابِسٍ اِلاَّ فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ - (الانعام : ٥٩)

"শুকনা ও ভিজা প্রতিটি জিনিস সুস্পষ্ট কিতাবে রয়েছে।"

এ কথাটি সত্য, উভয় আয়াতেই কুরআন মজীদের সর্বজনীনতা, সর্বকালীনতা এবং ব্যাপকতা ঘোষণা করা হয়েছে; কিন্তু তাই বলে কুরআন মজীদের এই শব্দগুলো এবং আভিধানিক অর্থের উপর ভিত্তি করে একথা বলা অকল্পনীয় যে, কুরআন মজীদ ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎকালের সর্ব বিষয়ের বিস্তারিত আহকাম-এর ধারক বলে দাবি করে। অবশ্য মৌলিক ও ব্যাপক নীতি (اُصول) এবং (كُلِيات) নির্ধারণে কুরআন মজীদ স্বয়ং সম্পূর্ণ। শাখা প্রশাখা (جُزئيات) -এর ব্যাখ্যা রাসূল (সা)-এর উপর এবং প্রয়োজনে কিয়াসের সাহায্যে বিধান উদ্ভাবন মানুষের عَقل سَليم -এর উপর ন্যস্ত।

অন্যপক্ষে মুফাস্‌সিরীন كِتاب مُبين -এর অর্থ বলেছেন لَوح مَحفوظ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সংরক্ষিত ফলক, যাতে সব কিছুই বিধৃত রয়েছে আর تِبيان মানে মৌলিক ও সার্বিক নীতি। অভিজ্ঞ জনেরা এই গভীরতার ইংগিত করেছেন ঃ

لاينقضى عجائبه ولايخلق على كثرة الرد -

"কুরআনের বিস্ময়কর বিষয়াদির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও গভীর তত্ত্বের কোনো দিন পরিসমাপ্তি হবে না এবং পুনরাবৃত্তি করার কারণে এই কালাম পুরানোও হয়ে যাবে না। (বরং প্রত্যেক বারের পাঠে চিন্তাশীল পাঠক ও গবেষকের জন্য তা গভীর তত্ত্ব ও অভিজ্ঞতার নতুন নতুন পথ উন্মুক্ত করে যাবে)।"

রাসূল (সা)-এর কিয়াস অন্যদের জন্য দলীল নয়

কিয়াসের প্রমাণ হিসাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কর্মপদ্ধতিকে পেশ করা যায় না। যেহেতু তিনি ছিলেন অহীর প্রকাশস্থল ইলাহী হিকমতের জ্ঞানের অধিকারী। যেহেতু তাঁকে ইজতিহাদী ভুল থেকে সুরক্ষিত রাখা হতো এবং যেহেতু উম্মতের মধ্যে কেউ এইসব গুণের অধিকারী ছিলেন না; তাই শুধু তাঁর কিয়াস অন্যদের কিয়াসের বৈধতার দলীল হতে পারে না। অবশ্যি তাঁর হাদীস অন্যদের জন্য কিয়াসের সুযোগ সৃষ্টি করে।

হযরত মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা)-কে ইয়ামানে পাঠাবার সময় তাঁকে পরীক্ষা করবার উদ্দেশ্যে নিম্নরূপ প্রশ্নগুলি করেছিলেন এবং তার জবাব দিয়েছিলেন মু'আয (রা) যা থেকে কিয়াসের বৈধতা প্রমাণিত হয় ঃ

بِمَ تقضى ؟ قال بما فى كتاب اللّه ـ قال فان لم تجد فى كتاب اللّه تعالى ؟ قال اقضى بما قضى به رسول اللّه ـ قال فان لم تجد ما قضى به رسول اللّه ؟ قال اجتهد برائى ـ قال عليه السلام الحمد للّه الذى وفَّق رسولَ رسوله بمايرضى به رسوله ـ

রাসূল (সা) হযরত মু'আয (রা)-কে বললেন, "কি দিয়ে বিচার করবে?" [রাসূল (সা)-এর প্রেরিত কর্মকর্তারা একাধারে বিচার প্রশানিক এবং প্রচারকের দায়িত্ব পালন করতেন] বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কিতাবে যা আছে তা দিয়ে; হযরত (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ আল্লাহ্‌র কিতাবে যদি [কোন নির্দেশ] না পাও তবে? হযরত মু'আয জবাব দিলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ফায়সালার ভিত্তিতে করবো; হযরত সুধালেন ঃ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যে ফায়সালা করেছেন, তার মধ্যে যদি [উদ্ভূত বিষয়ের ব্যাপারে কোন ফায়সালা] না পাও তবে? উত্তর ঃ আমি ইজতিহাদ করে 'রায়' দেব।"

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) [খুশি হয়ে] বললেন, "মহান আল্লাহ্‌র শোকর, তিনি তাঁর রাসূলের [প্রেরিত]কে এমন তাওফীক দিয়েছেন, যাতে তাঁর রাসূল সন্তুষ্ট।"

অন্য একটি রিওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে ঃ হযরত মু'আয (রা) এবং হযরত আবূ মূসা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইয়ামানের একটি এলাকার কাযী নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন। এ সময় তাঁর প্রশ্নের জবাবে তাঁরা যা বলেছিলেন তা হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

اذا لم نجد الحكم فى السنة نقيس الامر بالامر فما كان اقرب الى الحق عملنا فقال عليه السلام اصبتما ـ

"সুন্নাতে কোনো নির্দেশ না পেলে আমরা (উদ্ভূত) একটি (সদৃশ) বিষয়ের ওপর কিয়াস করবো এবং যা সত্যের সব চাইতে নিকটবর্তী তার উপর আমল করবো।" রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন, তোমাদের উত্তর সঠিক হয়েছে। কিয়াসের অবৈধতা প্রমাণের জন্য একটি হাদীস পেশ করা হয়, যাতে রয়েছে ঃ

قال لم يزل امر بنى اسرائيل مستقيما حتى كثرت فيهم اولاد السبايا فقاسوا مالم يكن بما قد كان فضلوا واضلوا ـ

"রাসূল (সা) বললেন, যতদিন পর্যন্ত বানূ ইসরাঈলের মধ্যে যুদ্ধ বন্দীদের সন্তানদের আধিক্য হয়নি ততদিন তাদের সব ব্যাপার ঠিকমতই চলতে থাকে। [বন্দীদের এসব সন্তান, যারা ছিল মূর্খ কুশিক্ষিত] তারা যা হয়নি, তার কিয়াস করলো তার ওপর; ফলে তারা নিজেরা গোমরাহ হয় এবং অন্যদেরকেও গোমরাহ করে।[১১৯]

কিন্তু এই হাদীসে কিয়াস অবৈধ বলা হয়নি, বলা হয়েছে অযোগ্যদের কিয়াসের পরিণতির কথা। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরে সাহাবীগণের কিয়াসের প্রমাণ এত বেশি পাওয়া যায় যে, ফকীহগণ দাবি করেন, কিয়াসের স্বপক্ষে ইজ্‌মা'র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ নিচে দেয়া হলো ঃ

হযরত আবূ বকর (রা)-কে কালালা (كَلَالَة) (যে মৃত ব্যক্তির বাপ ও সন্তান কেউ জীবিত নেই)-এর উত্তরাধিকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে সে প্রসংগে যে বিধান তিনি দিলেন তৎসম্পর্কে বললেন ঃ

اقول فيها برائى فان يكن صوابًا فمن اللّه وان يكن خطًا فمنى ومن الشيطان -

"আমি নিজের 'রায়' (অর্থাৎ কিয়াস) থেকে একথা বলছি। যদি এটা সঠিক হয় তাহলে হবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। আর যদি ভুল হয় তাহলে তা আমার পক্ষ থেকে এবং শয়তানের পক্ষ থেকে (মনে করবে)।"[১২০]

অনুরূপভাবে হযরত উমর (রা) দাদার উত্তরাধিকার সম্পর্কে সে ফায়সালা দিলেন সে সম্পর্কে বললেন ঃ اقضى فيه برائى -

"আমি নিজের রায়ের মাধ্যমে এ ব্যাপারে ফায়সালা করছি।"[১২১]

হযরত উসমান (রা) একবার হযরত উমর (রা)-কে বলেন ঃ

ان اتبعت رايك فسديد وان تتبع راى من قبلك فنعم الراى -

"যদি আপনি নিজের রায় মেনে চলেন তাহলে ঠিকই করেন। আবার যদি আপনার পূর্ববর্তীর রায় মেনে চলেন তাহলে তো আরো ভালো।"[১২২]

হযরত আলী (রা) একটি বিষয়ে বলেন, প্রথমে আমার ও উমর (রা)-এর রায় এ ব্যাপারে একই ছিল। কিন্তু এখন আমি ভিন্নমত পোষণ করি।[১২৩]

যে স্ত্রীলোককে তালাক গ্রহণ করার ইখতিয়ার দেয়া হয়েছিল তার সম্পর্কে হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ "আমি নিজের মতের ভিত্তিতে ফতোয়া

---

১১৯. দারাসী ও নূরুল আনওয়ার।

১২০. মিনহাজুল উসূল। ১২২. ঐ।

১২১. মিনহাজুল উসূল। ১২৩. ঐ।

দিচ্ছি। যদি সঠিক হয় তাহলে তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। আর ভুল হলে তা হবে আমার ও শয়তানের পক্ষ থেকে। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল দোষ মুক্ত।[১২৪]

এভাবে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা), যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) ও অন্যান্য উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবীগণের রায় (কিয়াস)-এর অনেক বর্ণনা মিলে। কাজেই এর পরে কিয়াসের বৈধতার প্রশ্নে আর' কোনো প্রকার সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ থাকতে পারে না। তাঁরা নিজেদের ছাত্রদেরকে এবং উচ্চ পদস্থ ও যোগ্যতা সম্পন্ন সরকারী প্রশাসকদেরকেও কিয়াস করার নির্দেশ দিতেন। যেমন হযরত উমর (রা) কাযী শুরইহ্‌কে কূফার কাযী নিযুক্ত করে বলেন ঃ

"কোনো বিষয় সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নায় সুস্পষ্ট বিধান না পেলে দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় তুমি ইজতিহাদের মাধ্যমে ফয়সালা করো।[১২৫]

অনুরূপভাবে হযরত উমর (রা) হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-কে বসরার গভর্ণর নিযুক্ত করার সময় যে ফরমান দিয়েছিলেন, তাও কিয়াসের ব্যাপারে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ঃ- اعرف الاشباه والنظائر وقس الامور برائك -

"যে সব সমস্যার উদ্ভব হয় সেগুলির সদৃশ ফায়সালা ও নযীরের খোঁজ করো এবং তার প্রেক্ষিতে কিয়াস করে নিজের রায় স্থির করো।"[১২৬]

কিয়াস সম্পর্কে সাহাবীগণের সাবধানবাণী

আবূ বকর সিদ্দীক(রা) একবার বলেন ঃ

اى سماء تظلنى واى ارض تقلنى اذا قلت فى كتاب اللّه برأى -

"যখন আমি আল্লাহ্‌র কিতাবের ব্যাপারে নিজের রায় অনুযায়ী কিছু বলবো তখন কোন্ আকাশ তার ছায়াতলে আমাকে রাখবে এবং কোন্ মৃত্তিকা আমাকে উঠাবে?[৪]"

হযরত উমর (রা) বলেন ঃ

اياكم واصحاب الرائ انهم اعداء السنن اعيتهم الاحاديث ان يحفظوها فقالوا بالرأى -

"রায় ওয়ালাদের খপ্পর থেকে তোমরা নিজেদেরকে বাঁচাও। তারা সুন্নাতের শত্রু। হাদীসের সংরক্ষণে তারা ক্লান্ত, তাই তারা রায়ের ভিত্তিতে কথা বলে।"[১২৭]

---

১২৪. তারীখু তাশরীইল ইসলামী।

১২৫. ঐ।

১২৬. মিনহাজুল উসূল।

১২৭. ঐ। ১২৮. ঐ।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

يذهب قراءكم وصلحاءكم ويتخذ الناس رؤوسا جهالا يقيسون الامور برأيهم -

"তোমাদের উলামা ও সৎ ব্যক্তিরা বিদায় নেবে এবং লোকেরা মূর্খদেরকে নেতারূপে গ্রহণ করবে। তারা সব বিষয়ে নিজেদের রায়ের মাধ্যমে কিয়াস করবে।"১২৯

উপরোক্ত মন্তব্যগুলোর সারসংক্ষেপ হচ্ছে এই যে, যে সব বিষয়ে প্রকৃত পক্ষে কিয়াস-এর প্রয়োজন অনুভূত হবে, সে সব ক্ষেত্রেই কেবল কিয়াস চালাতে হবে।

আর হযরত উমরের (রা) বক্তব্য মতে 'সদৃশ্য ও নযীর' (اَشباه ونَظائر)-এর ভিত্তিতে কিয়াস করা হবে। শরী'আত সম্পর্কে জ্ঞান লাভের শ্রম কাতরতা কিংবা ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থের বশে কিয়াসের কৃত্রিম ক্ষেত্র তৈরী করা এবং কিয়াসের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা– এসব অবস্থায় কিয়াস গ্রহণযোগ্য হবে না। এ ব্যাপারে ইতিপূর্বে 'ফকীহের গুণাবলী' শিরোনামে কিছু কথা আলোচনা করা হয়েছে। এখানে কিয়াস সম্পর্কে ফকীহগণ কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ম-কানুন সীমা-পরিসীমা সংক্রান্ত কিছু কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাবে।

ফকীহগণ বিধান উদ্ভাবনের চারটি চাবিকাঠির কথা বলেছেন ঃ১৩০

১. ইল্লাত (عِلة), ২. কারণ (سَبب), ৩. শর্ত (شَرط) এবং ৪. আলামত (علامة)। এদের প্রত্যেকের সংজ্ঞা ও পারস্পাকি সম্পর্ক নিম্নরূপ ঃ

এক. ইল্লাত ঃ আভিধানিক অর্থে ইল্লাত হচ্ছে এমন কোনো আনুসংগিত অবস্থা (عَارض) যা বস্তুর (مَحل) মধ্যে (وَصف) গুণগত পরিবর্তন সৃষ্টি করে। যেমন রোগ একটি মানুষের আনুসংগকি, সাময়িক অবস্থা, যা মানুষের স্বাস্থ্যের মধ্যে পরিবর্তন আনে এবং এ জন্য তাকে ইল্লত বলে। ফকীগণের পরিভাষায় যে عَارض -এর উপস্থিতিকালে হুকুম বা বিধানের স্থিতি হয় তাকে 'ইল্লাত' বলে।

ফকীহ্‌দের ভাষায় এর সংজ্ঞা হচ্ছে ঃ

ماشرع الحكم عند وجوده (العارض) لابه -

"যার অস্তিত্বের কালে (কারণে নয়) হুকুমের বিধান (সেই হচ্ছে علة)।১৩১

এর দ্বিতীয় সংজ্ঞা হচ্ছে ঃ

مايضاف اليه وجوب الحكم ابتداء -

---

১২৯. মিনহাজুল উসূল।

১৩০. উসূলে ফিকহের যে কোন গ্রন্থ দেখুন।

১৩১. আত্‌তাকরীর ওয়াত্ তাজীর, ১৪১ পৃষ্ঠা।

"হুকুম নির্ধারণ যার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত করা যায় (তাকেই বলে ইল্লাত)।[১৩২]

দুই. কারণ ঃ আবরীতে 'সাবাব' বা কারণের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে এমন রাস্তা বা পদ্ধতি যা গন্তব্যে পৌছে যায়। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَاٰتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا (الكهف : ٨٤)

"আর আমি তাকে (ذو القرنين -কে) সব রকমের সাজ-সরঞ্জামদিয়েছিলাম।" অর্থাৎ এমন সব কিছু দান করেছিলাম যা তাকে শাসন কর্তৃত্বে (গন্তব্যে) পৌছিয়ে দিয়েছিল।[১৩৩]

ফিক্‌হের পরিভাষায় বলা হয় ঃ مايكون طريقا الى الحكم "যে পথে হুকুমে পৌছানো যায়, তাকে সবাব বলা হয়।'[১৩৪]

উল্লেখ্য, (ক) পথ এবং (খ) পথ চলা, এ দুটি আলাদা ব্যাপার। পথ হচ্ছে سَبَب চলা হচ্ছে "عِلَّة" গন্তব্যে পৌছে যাবার সম্পর্ক হচ্ছে চলার সাথে, সরাসরি পথের সাথে নয়; বরং পথ চলার মাধ্যমে। এই হচ্ছে عِلَة আর سَبَب এর পার্থক্য। একটি উদাহরণ দেয়া যাক ঃ ধরুন কুয়া থেকে পানি তুলতে হবে, তজ্জন্য দরকার কুয়া, বালতী আর রশি– এইগুলি হচ্ছে سَبَب কিন্তু পানি উঠানোর সম্পর্ক হবে মানুষর কাজের (ইল্লাত) সাথে, রশি, বালতির (সাবাব) সাথে সম্পর্ক সরাসরি নয়, বরং মানুষের কাজের (ইল্লাত) মাধ্যমে। তাই ফিক্‌বিদগণ বলেন ঃ

كل ما كان طريقا الى الحكم بواسطة يسمى له سببا ويسمى الواسطة علة -

"কোনো মাধ্যমের সহায়তায় হুকুম পর্যন্ত পৌছার যে পথ তা হচ্ছে কারণ (سبب) এবং মাধ্যমটিই ইল্লাত।"[১৩৫]

তিন. শর্ত ঃ আভিধানিক অর্থে শর্ত এমন একটি অবস্থা, যার ওপর বস্তুর অস্তিত্ব নির্ভরশীল হয়। অন্যদিকে হুকুমের অস্তিত্ব যার ওপর নির্ভরশীল হয়, তাকে ফিক্‌হের পরিভাষায় বলা হয় শর্ত।

مايضاف الحكم اليه وجودا عنده -

"শর্ত এমন একটি বস্তু, যার অস্তিত্বের সাথে হুকুমের অস্তিত্ব সম্পর্কিত হয়।"[১৩৬]

১৩২. কিতাবুল তাহকীক, ২২৬ পৃষ্ঠা।
১৩৩. কিতাবুল তাহ্‌কীক, ২৬২ পৃষ্ঠা।
১৩৪. হুসামী, ১২৯ পৃষ্ঠা।
১৩৫. উসূলুশ শাশী, ৯৬ পৃষ্ঠা।
১৩৬. কিতাবুত্ তাহ্‌কীক, ২৭৪ পৃ.

ফকীহ্‌দের একটি মন্তব্য এই ঃ

الحكم يتعلق بسببه ويثبت بعلته ويوجد عند شرطه -

"হুকুম তার সাবাব-এর সাথে সম্পৃক্ত হয়, ইল্লাতের মাধ্যমে হুকুম প্রমাণিত হয় এবং শর্তের অস্তিত্বের সাথে হুকুম স্থির হয়।"[১৩৭]

চার. আলামত ঃ আলামত মানে নিশান। যেমন–মিনার হয় মসজিদের নিশান। ফিক্‌হের পরিভাষায় হুকুমের অস্তিত্বের সন্ধান প্রদানকারী জিনিসকে আলামত বলা হয়।

ফকীহ্‌দের একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য ঃ

هى (علامة) مايعرف وجود الحكم من غير ان يتعلق به وجوده ولاوجوبه -

"যে জিনিসটি হুকুমের অস্তিত্বের সন্ধান দেয় কিন্তু হুকুমের স্থিতি প্রমাণের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখে না।"[১৩৮]

হিকমত ও ইল্লাতের পার্থক্য

১. হিক্‌মত এমন একটি কল্যাণকর বিষয়, যা সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে আল্লাহ্‌র বিধানের ভিত্তি হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। হিকমত প্রচ্ছন্ন ব্যাপার, তাই একে চিহ্নিত করা কঠিন। কিন্তু নীতি, সীমারেখা, শর্তাবলী ইত্যাদি হিকমতের পথনিদের্শ করে। বরং এগুলি হিকমত উপলব্ধি করার মাধ্যমে পরিণত হয়।

২. অন্যদিকে মূলনীতি ও সীমারেখার কল্যাণকর পথনির্দেশ থেকে ইল্লাতের সন্ধান পাওয়া যায় এবং কল্যাণের সাথে ইল্লাতের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। ইল্লাত এমন একটি একক, যার মধ্যে রয়েছে বহুর অস্তিত্ব। এর বুদ্ধি সম্মত হওয়াটা অপরিহার্য।

হিকমতকে ইল্লাত গণ্য করা হয় না

প্রচ্ছন্নতার কারণে হিকমত সাধারণত মানব বুদ্ধির অগম্য। এ কারণে হিকমত কিয়াসের ভিত্তি হিসাবে গণ্য হতে পারে না।

ফকীহগণ বলেন ঃ

لايصلح القياس لوجود المصلحة ولكن لوجود علة مضبوطة يدور عليها الحكم -

---

১৩৭. উসূলুশ শাশী, ৯৬ পৃ.

১৩৮. কিতাবুত্ তাহ্‌কীক, ২৭৯ পৃ.

"মাসলাহাতের (কল্যাণ ও প্রয়োজন) ভিত্তিতে কিয়াস করা সংগত নয়। বরং মযবূত ইল্লাতের ভিত্তিতে কিয়াস করতে হবে। আর ইল্লাতকে কেন্দ্র করেই হুকুম আবর্তিত হবে।[১]"

হিকমতের (মাস্‌লিহাত) ভিত্তিতে কিয়াস কোনো কোনো আহকামের ক্ষেত্রে বড়ই জটিলতার সৃষ্টি করবে, কোনো কোনোটার মধ্যে বৈপরিত্যের আশংকা রয়েছে। যেমন– সফরে নামাযে কসর (قَصر)-এর হুকুম (চার রাকাত ফরয-এর পরিবর্তে দুই রাকাত পড়া) এবং সফরে রমযানের রোযা না রাখার (إفطار) অনুমতি–উভয়ের ইল্লাত হচ্ছে সফর। উভয় ক্ষেত্রে হিকমত (মাসলিহাত) হচ্ছে মানবের কিঞ্চিৎ পরিশ্রম ও কষ্ট লাঘব। কিন্তু এই পরিশ্রম ও কষ্ট তাদেরও হয় যারা দেশে অবস্থান করে রোযা রাখা অবস্থায় পরিশ্রমের কাজ করে। যেমন করে শ্রমিক-মজুর, কর্মকার, ছুতার ইত্যাদি পেশাজীবী লোকেরা। তাই হিকমতকে ইল্লতে পরিণত করলে এ ধরনের মেহনতী লোকদেরকেও মুসাফিরদেরকে প্রদত্ত সুবিধা অর্থাৎ নামায কাস্‌র এবং রমযানের রোযা না রেখে ইফ্‌তার করার অনুমতি দিতে হবে কষ্ট লাঘব করার মাসলিহাতের ভিত্তিতে। কিন্তু কুরআনে বর্ণিত ইল্লাতকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করলে এই জটিলতা দেখা দেয় না।

অথবা যেমন আল্লাহ্‌র আহকামের একটি হিকমত (মাসলাহাত) হচ্ছে মানবের জীবন রক্ষা। যদি এই হিকমতকে সব ক্ষেত্রে 'ইল্লাতে পরিণত করা হয় তাহলে জিহাদ ফরয করার কোন মানে হয় না, কারণ জিহাদে প্রাণনাশ হয়। কিন্তু জিহাদেও প্রাণের হিফাযত হয়। অত্যাচারের বিরুদ্ধে জিহাদে কতিপয় লোকের প্রাণের বদলে একটি সমাজ বা একটি জাতির সমগ্র জনসমষ্টির জীবন রক্ষা করা যায়। কবি বলেছেন ঃ

"কখনো প্রাণ আবার
কখনো প্রাণ সমর্পণই জীবন।"

বুদ্ধির সাথে 'ইল্লতের সম্পর্ক

অবশ্যই মানবের সুস্থ বুদ্ধি (عَقل سَليم)-র পরিধিতে থাকতে হবে, যদি অবোধগম্য হয়, তাহলে বিধান উদ্ভাবন সম্ভব হবে না। ফকীহদের সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ ঃ

يجب ان يكون علة الحكم صفة يعرفها الجمهور ولاتخفى عليهم حقيقتها ولاوجودها من عدمها ـ

"ইল্লাত হুকুমের এমন একটি বৈশিষ্ট্য (صِفة) হতে হবে, যাকে অধিকাংশ লোক জানতে পারবে। তার প্রকৃত স্বরূপ প্রচ্ছন্ন থাকবে না এবং তার অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের মধ্যেও প্রচ্ছন্নতা থাকবে না।"[১৪০]

১৩৯. হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা, ১২৯ পৃ.
১৪০. হুজ্জাল্লাহিল বালেগাহ, ৯৪ পৃ.।

'ইল্লাতের কাঠামো

ইল্লাতের কাঠামোতে কখনো মানুষের অবস্থার দিকে নজর দেয়া হয় এবং তার সাথে যে জিনিসের ওপর মানুষের কর্ম অনুষ্ঠিত হয় তার প্রতি নজর দেয়া হয়।

এক, যে ইল্লাতের কাঠামোতে মানুষের অবস্থার দিকে নজর দেয়া হয়, সে অবস্থা হবে মানুষের অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্যের (صِفت) অন্তর্ভুক্ত। যেমন عَقل (সুস্থবুদ্ধি) এবং بُلوغ (প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া); এ দু'টো মানুষের সাথে বরাবর যুক্ত থাকে, অন্যপক্ষে وَقت আসে আর যায়। এই তিনটি সমন্বিতভাবে 'ইল্লাত হয় সালাত ওয়াজিব হওয়ার হুক্‌মের। ফিক্‌হের ভাষায় বলা হয় ঃ

من ادرك وقت صلوة وهو عاقل بالغ وجب عليه ان يصليها ـ

"যে ব্যক্তি সুস্থবুদ্ধি ও সাবালক অবস্থায় নামাযের সময় পেয়েছে তার জন্য নামায পড়া ওয়াজিব।"

এক্ষেত্রে নামায ওয়াজিব হওয়ার বিধানের 'ইল্লাত হচ্ছে وقت + بلوغ + عقل

ومن شهد الشهر وهو عاقل بالغ مطيق وجب عليه ان يصومه ـ

"যে ব্যক্তি সুস্থ বুদ্ধি ও সাবালক অবস্থায় রমযানের মাস পেয়েছে এবং সে রোযা রাখার শক্তি রাখে, তার জন্য রোযা রাখা ওয়াজিব।"

এ ক্ষেত্রে সাওম ওয়াজিব সংক্রান্ত হুক্‌মের সমন্বিত 'ইল্লাত হচ্ছে ঃ

شهر رمضان + طاقة + بلوغ + عقل

ومن ملك نصابا وحال عليه الحول وجب ان يزكيه ـ

"যে ব্যক্তি নিসাব [যে সর্বনিম্ন পরিমাণ সম্পদ (نصاب) থাকলে যাকাত ফরয হয়]-এর মালিক হয়েছে এবং তার (নিসাবের) মালিকানায় একটি বছর গত হয়েছে, তার ওপর যাকাত ওয়াজিব।"

এ ক্ষেত্রে যাকাত ওয়াজিব হবার عِلة হচ্ছে নিসাবের মালিকানা; আর حولان حول (অর্থাৎ পূর্ণ এক বছর যাবৎ নিসাব পরিমাণ সম্পদ মালিকানায় থাকা) হচ্ছে شرط ; সর্ত পূর্ণ না হলে আদায় করা ওয়াজিব হবে না। তবে নিসাবের মালিক ইচ্ছা করলেই আগাম আদায় করতে পারে।

'ইল্লাত যে ক্ষেত্রে صِفة لَازِمة বা অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য, ফকীহদের ভাষায় তার কয়েকটি উদাহরণ এইরূপ ঃ يحرم شرب الخمر (মদ্য পান হারাম)

يحرم اكل الخنزير (শূয়োর খাওয়া হারাম)

يحرم اكل كل ذى ناب من السباع (প্রত্যেক ধারালো দাঁতের অধিকারী হিংস্র প্রাণী খাওয়া হারাম)।

يحرم كل ذى مخلب من الطير (প্রত্যেক নখর (যা দিয়ে শিকার ধরে) বিশিষ্ট পাখি হারাম)।

يحرم نكاح الامهات (মায়েদেরকে বিয়ে করা হারাম)

এই উদাহরণগুলিতে দেখা যাচ্ছে, যে صِفة-এর কারণে হারাম হওয়ার বিধান দেয়া হয়েছে তা সংশ্লিষ্ট পশু/পক্ষী/মানুষ হতে কোন দিন বিচ্ছিন্ন হয় না।

এবারে নিম্নের উদাহরণগুলো দেখুন ঃ

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا ـ (المائده : ٣٨)

"পুরুষ চোর ও মেয়ে চোর উভয়ের হাত কেটে দাও।"

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ـ (النور : ٢)

"যেনাকারী মেয়ে ও পুরুষের প্রত্যেককে একশো ঘা করে চাবুক মারো।"

এই দৃষ্টান্তগুলিতে দণ্ডবিধানের عِلة হচ্ছে سَرِقة/زِنا (যিনা/চুরি) যা দণ্ডযোগ্য ব্যক্তিদের অবিচ্ছেদ্য বা সার্বক্ষণিক صِفة নয়, বরং সাময়িক ব্যাপার।

কখনো দু'টো صِفة-এর সমন্বয়ে 'ইল্লাত হয়ে থাকে। নিম্নের উদাহরণগুলোতে ফকীহদের ভাষায় যে বিধান দেয়া হয়েছে তা দেখুন ঃ

يجب رجم الزانى المحصن "বিবাহিত যিনাকারীকে রাজম (পাথর মেরে বধকরা) করা ওয়াজিব।"

এক্ষেত্রে زِنا এবং اِحصان মিলে 'ইল্লাত গঠিত হয়েছে যার ভিত্তিতে رَجم -এর বিধান।

يجب جلد زانى غير محصن "অবিবাহিত যিনাকারীকে চাবুক মারা ওয়াজিব।"

يحرم الذهب والحرير على رجال الامة دون نسائها ـ

"সোনা ও রেশম উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম, মেয়েদের জন্য নয়।"

এক্ষেত্রে দু'টো বস্তুর একই صِفة এর ইঙ্গিত রয়েছে, যার জন্য হারাম হওয়ার বিধান পুরুষের জন্য দেওয়া হচ্ছে, মেয়েদের জন্য নয়, কারণ তাদের আল্লাহ্ প্রদত্ত صِفة ভিন্ন।

হিকমত ও ইল্লাত কিভাবে জানা যায়

গভীর গবেষণা ও পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে হিকমত ও 'ইল্লাতের সন্ধান পাওয়া যায়। হিকমতের ব্যাপারটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, শুধুমাত্র বুদ্ধিমত্তায় কাজ চলে না। এইসাথে আল্লাহ্ প্রদত্ত সূক্ষ্মদৃষ্টি এবং নবুওয়াতের প্রকৃতি অনুধাবনেরও প্রয়োজন হয়।

একজন উচ্চ পর্যায়ের সফল চিকিৎসকের বুদ্ধিমান সহকারী দীর্ঘকাল চিকিৎসকের সাহচর্যে থাকার পরে তাঁর কাছ থেকে বিভিন্ন রোগে যেসব ওষুধ ব্যবহার প্রয়োজন সেগুলির বৈশিষ্ট, গুণাবলী ও কার্যকারিতা জানতে পারেন। ঠিক তেমনি সাহাবীগণের মধ্যে যাঁরা বুদ্ধিমান ও ধীশক্তি সম্পন্ন ছিলেন, তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহচর্যে থেকে আল্লাহ্ ও রাসূলের বিধানের উদ্দেশ্য ও হিকমাত অবগত হয়েছিলেন। তাঁরা শারী'আত বিধানের স্থান-কাল-পাত্র দেখেছিলেন। বিধানগুলির মূলনীতি অনুধাবন করেছিলেন। উপরন্তু যে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু নুবূওয়াতের জ্যেতির উৎস তাঁর মারিফাত ও সাহাবা (রা) হাসিল করেছিলেন, তাই দীনের জ্ঞান ও তাৎপর্য অনুধাবন করার ব্যাপারে তাঁদের মর্যাদা ছিল সবার ওপরে। এ প্রসঙ্গে হযরত উমর (রা)-এর এ উক্তি যথার্থ ছিল ঃ - وافقت ربى فى ثلاث

"তিনটি বিষয়ে আমি আমার রবের সাথে মতৈক্যে উপনীত হয়েছিলাম।"[১৪১]

"মেয়েদের পরদার ব্যাপারে, বদরের যুদ্ধবন্দীদের প্রতি আচরণের ব্যাপারে এবং বিবিগণের (রা) প্রতি হযরত (সা)-এর অসন্তুষ্টির এক উপলক্ষে হযরত উমর (রা) যা মন্তব্য করেছিলেন, পরবর্তীতে ঠিক অদ্রূপ ওহী নাযিল হয়েছিল। এই তিনটি বিষয়ে আল্লাহ্ উমর (রা)-কে সমর্থন করেছিলেন বলে তিনি গর্ববোধ করতেন।"

হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা)-র উক্তিও এ প্রসঙ্গে যথার্থ ছিল ঃ

لو ادرك النبى صلى الله عليه وسلم ماحدثه نساء لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بنى اسرائيل -

"রাসূলুল্লাহ্ (সা) যদি কতিপয় মেয়ে যে অবস্থার সুষ্টি করেছে তা দেখবার জন্য বেঁচে থাকতেন তাহলে তাদের মসজিদে যাওয়া বন্ধ করে দিতেন যেমন বনূ ইসরাঈলের মেয়েদের মসজিদে যাওয়া বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল।"[১৪২] এ থেকে বোঝা যায়, নবী (সা)-এর দীর্ঘ সাহচর্যের ফলে সাহাবারা (রা) দীনের রূহ (spirit) আঁচ করতে সক্ষম ছিলেন।

সাহাবায়ে কিরামের পর যাঁরা তাঁদের জীবনের সাথে বেশি সম্পর্ক সৃষ্টি এবং তাঁদের বেশি নৈকট্য লাভ করেছিলেন, স্বাভাবিকভাবে সেই অনুপাতে তাঁরা অর্থাৎ

---

১৪১. বুখারী, ২য় জিল্‌দ, ৬৪৪ পৃষ্ঠা।

১৪২. বুখারী, ১ম জিল্‌দ, মেয়েদের মসজিদে যাওয়ার অধ্যায়।

তাবিঈগণ দীনের হিকমতের সাথে সম্পৃক্ত হবেন। অনুরূপ কথা বলা যায় তাবঈ তাবিঈ (تَبَع تَابعى)-গণের ব্যাপারে।

কুরআনে বর্ণিত হিকমত

কুরআন মজীদে কোথাও কোথাও সুস্পষ্টভাবে হিকমতের কথা আলোচিত হয়েছে। যেমন ঃ

وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يٰاُولِى الْاَلْبَابِ (البقره : ١٧٩)

"হে জ্ঞানবানগণ! তোমাদের জন্য কিসাসের মধ্যেই রয়েছে জীবন।"

প্রাণের বদলে প্রাণ নেওয়াকে কিসাস বলে। এর মধ্যে রয়েছে ব্যক্তি বিশেষের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থায় সমষ্টির জীবন রক্ষার হিকমত।

এমনিভাবে রমযানুল মুবারকের রোযা সম্পর্কিত একটি বিধানের আওতায় (রাতে স্ত্রী সঙ্গমের অনুমতি দেওয়ার হিকমত সম্পর্কে) বলা হয়েছে ঃ

عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ (البقرة : ١٩٧)

"আল্লাহ্ জেনে নিয়েছেন, তোমরা (তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ) নিজেদের নফসের ব্যাপারে খিয়ানত করছিলে" (অবৈধভাবে স্ত্রী সঙ্গমের গুনাহতে লিপ্ত হয়েছিলে)।

মানবের প্রকৃতিগত দুর্বলতার দরুন গুনাহ্ থেকে তাকে রক্ষা করাই রহমানুর রহীমের ইচ্ছাই হচ্ছে রমযান মাসের রাতে স্ত্রী সঙ্গমকে হালাল ঘোষণার হিকমত।

ভ্রাতৃত্ববোধ ও অঙ্গীকার পূর্ণ করার কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ

وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ ..... وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ـ اِلاَّ تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ ـ

(الانفال : ٧٢-٧٣)

"যদি তারা (মুসলিম-মাযলূমগণ) দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাহায্য চায়, তবে তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য ..... যারা কাফির তারা পরস্পর বন্ধু; যদি তোমরা তা না করো (অর্থাৎ কাফিরদের বিরুদ্ধে মাযলূম মুসলিমগণকে সাহায্য না করো) তাহলে পৃথিবীতে ফিতনা ও মহা বিপর্যয় দেখা দেবে।"

আবহমান কাল থেকে কুফর বনাম আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চরম অনর্থের উৎস হয়ে রয়েছে। তাই জিহাদের বিধান এবং এই বিধানে 'ইল্লাত' হচ্ছে ফিতনা।

আরো ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لاَتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ـ (البقرة : ١٩٣)

"তোমরা তাদের সাথে জিহাদ করো যে পর্যন্ত না ফিতনা ও ফাসাদ নির্মূল হয়ে যায় এবং (ফায়সালা যে পর্যন্ত না) একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য (তাঁর আহকামের আওতায়) নির্ধারিত হয়ে যায়।"

এই আয়াতেও জিহাদকে ফিতনা ও ফাসাদ নির্মূল করা তথা আল্লাহ্‌র সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার উপায় নির্দেশ করা হয়েছে। জিহাদের চূড়ান্ত রূপ লড়াই ও প্রাণনাশ। তাও কবূল করতে হবে মানবের বৃহত্তর স্বার্থে, নয়তো দুনিয়া অশান্তি, যুলুম ও বিপর্যয়ের জাহান্নামে পরিণত হবে। এই ফিত্‌না সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ـ (البقرة : ١٩١)

"আর ফিতনা হত্যার চাইতেও মারাত্মক।"

উরোক্ত আয়াতগুলিতে সুস্পষ্টভাবে জিহাদের 'ইল্লাত ও হিকমত' বর্ণিত হয়েছে।

কুরবানী সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ـ (الحج : ٣٧)

"ঐ কুরবানীর পশুগুলির গোশ্‌ত আল্লাহ্‌র কাছে পৌছে না এবং ওদের রক্তও না, তবে তাঁর কাছে পৌছায় তোমাদের তাকওয়া।"

অর্থাৎ হিকমতে ইলাহী হচ্ছে কুরবানীর মাধ্যমে বান্দাকে তাকওয়ার অনুশীলন করানো, প্রয়োজনে চরম কুরবানীর জন্য বান্দাকে প্রস্তুত করে নেয়া।

এ ছাড়াও কুরআন মজীদে সুস্পষ্টভাবে (صَراحة) এবং ইশারা-ইঙ্গিতে (كِناية) বহু আহকামের হিকমতের কথা বলা হয়েছে। বরং কুরআন পুরোপুরি হিকমত। আফসোস যদি এই দৃষ্টিতে কুরআন মজীদ পড়া ও পড়ানো হতো! বিভিন্ন কুরআনী আইনের প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ তাঁর দু'টি গুণের [আলীম (عَليم) সর্বজ্ঞানী ও হাকীম (حَكيم) প্রজ্ঞাসম্পন্ন] কথা উল্লেখ করেন, অনেক ক্ষেত্রে যুক্ত বা বিযুক্তভাবে। এ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, 'ইল্‌ম ও হিক্‌মত ছাড়া আইনের গিট খোলা (حَل) এবং আঁটা (عَقد) যায় না اهل الحل والعقد হওয়া যায় না।

সুন্নাতে হিকমতের উল্লেখ

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 'সুন্নাত' যেহেতু কুরআনী হিকমত সমন্বিত ব্যবহারিক রূপ তাই সুন্নাতের মধ্যেও হিকমতের সুস্পষ্ট বর্ণনা ও বিবরণ পাওয়া যায়। এখানে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বর্ণিত কয়েকটি হিকমত বর্ণনা করা হলো।

সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় নামায পড়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করে তিনি বলেন ঃ

فانها تطلع بين قرنى الشيطان -

"(সূর্য) শয়াতনের দুই শিঙের (মাথার দুই প্রান্তের) মাঝখান দিয়ে উদিত হয়।"

অর্থাৎ এ সময় সূর্য পূজক ও মুশরিকরা সূর্যের পূজার অনুষ্ঠান করে। কাজেই সময়ের দিক থেকে ইসলামের নামায মুশরিকদের পূজার সদৃশ হয়ে পড়ে বলে তা নিষিদ্ধ। একই কারণে সূর্যাস্তের সময়ও নামায নিষিদ্ধ।

ঘুম থেকে জেগে উঠে হাত ধোয়ার তাকিদ করে বলেন ঃ

فانه لايدرى اين باتت يده -

"কারণ, সে জানে না তার হাত কোথায় রাত্রি যাপন করেছে।" অর্থাৎ নাপাক কিছুতে হাত লাগার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং হাত ধুয়ে পবিত্রতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে হবে।

পানি দিয়ে নাক সাফ করা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

ان الشيطان يبيت على خيشومه -

"মানুষের নাকের হাড়ের ওপর শয়তান রাত কাটায়।"

পরিচ্ছন্নতার তাগিদের জন্য এ ধরনের বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মুহাররম মাসের দশ তারিখে রোযা রাখা প্রসঙ্গে বলেন ঃ এর মাধ্যমে মূসা (আ)-এর সুন্নাতের ওপর আমল করা হয়। এ দিন ফিরআউন ধ্বংস হয়েছিল এবং আল্লাহ্‌র এক বিশিষ্ট নবী তাঁর উম্মতসহ বিপদমুক্ত হয়ে রোযা রেখেছিলেন।

এ ধরনের আরো বহু হিকমত বর্ণিত হয়েছে। তাহলেও হিকমতের সন্ধান এবং নতুন নতুন সমস্যার সমাধানে হিকমতের আলোক প্রাপ্তি সুকঠিন ব্যাপার।

হিকমত সন্ধানের পদ্ধতি

প্রথম পদ্ধতি হচ্ছে শারী'আতের সম্যক জ্ঞান অর্জন তথা কুরআন ও সুন্নতের আহকামের প্রেক্ষাপটে যে সকল মূলনীতি এবং হিকমতের স্পষ্ট বর্ণনা বা ইঙ্গিত পাওয়া যায় তার সামগ্রিক অনুধাবন। দ্বিতীয় পর্যায়ে অনুধাবন করতে হবে কিভাবে উপরোক্ত মূলনীতি ও হিকমতসমূহের আলোকে সুযোগ্য খ্যাতমান ইমামগণ যারা বিধানের إستنباط বা উদ্ভাবন করেছেন। তৃতীয় পর্যায় হচ্ছে উদ্ভূত প্রশ্নাদির বিশ্লেষণ ফিকহের যে অধ্যায়ের সাথে প্রশ্নগুলি সংশ্লিষ্ট বা সাদৃশ্যপূর্ণ, ব্যাপকভাবে সে অধ্যায়ের অধ্যয়ন। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে যে জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে

মুজতাহিদের মূলধন। তৃতীয় পর্যায়ে তাঁর ইজতিহাদের শুরু। আশা করা যায় এ প্রক্রিয়ায় মুজতাহিদ যথার্থভাবে বিধান উদ্ভাবন করতে সক্ষম হবেন–তবে একটি শর্তে–শর্তটি হচ্ছে "তাক্‌ওয়া" যা আল্লাহ্‌র সহায়তা নিশ্চিত করবে। দিলে আল্লাহ্‌র আলো না থাকলে বিদ্বান তিনি যত বড়ই হোন না কেন, ইজতিহাদের পিচ্ছিল পথে পা বাড়ালে হয়ত তিনি নিজেও পথভ্রষ্ট হবেন, মুসলিম উম্মাহকে গোমরাহ করবেন– نَعوذ بِاللّٰهِ

কুরআন ও সুন্নাতে ইল্লাতের উল্লেখ

১. স্পষ্ট "বাক্য" মাধ্যমে–

কুরআন মজীদে অনেক ক্ষেত্রে 'ইল্লাতের বিবরণ "স্পষ্ট বাক্যে" করা হয়, যেমন গৃহকর্মে নিযুক্ত লোকদের ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেদেরকে নির্ধারিত তিনটি সময় ছাড়া অন্যান্য সময়ে বিনা অনুমতিতে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে ঃ

لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَاعَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ - (النور : ٥٨)

"এই তিন সময় ছাড়া অন্য সময় (যদি তারা অনুমতি ছাড়া গৃহে প্রবেশ করে) তোমাদের ও তাদের জন্য কোন দোষ নেই (কারণ) তোমাদের পরস্পরের কাছে বেশি বেশি যাতায়াত করার প্রয়োজন পড়ে।"

এই তিনটি সময় হচ্ছে ঃ এক, ফজরের নামাযের আগে। দুই, ইশার নামাযের পরে। তিন, দুপুরের সময়।

এই অনুমতির 'ইল্লত' হচ্ছে ঃ পরস্পরের কাছে যাতায়াতের অধিক্যজনিত অসুবিধা। এবং এই ইল্লাত বর্ণিত হয়েছে– طَوَّافُوْنَ عَلَيْكُمْ এই স্পষ্ট বাক্যে।

অথবা যেমন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বেড়ালের ঝুটা নাপাক না হবার 'ইল্লাত নিম্নোক্ত স্পষ্ট ও পূর্ণ বাক্যে প্রকাশ করেছেন ঃ

فانها من الطوافين عليكم والطوافات -

"সে (বেড়াল)-ও বেশি বেশি যাতায়াতকারী এবং কারিণীদের অন্যতম।"

সম্ভবত উপরোল্লেখিত আয়াতের ভিত্তিতে এটি ছিল রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কিয়াস। কারণ উভয় স্থানেই বেশি বেশি করে যাওয়া-আসাকে 'ইল্লাত হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

২. স্পষ্ট শব্দের মাধ্যমে 'ইল্লাত প্রকাশের কয়েকটি উদাহরণ নিচে সংযোজিত করছি ঃ

(ক) كَىْ (যেন) শব্দের মাধ্যমে যেমন 'ফাই' (যুদ্ধ ছাড়াই শত্রুদের থেকে যে সম্পদ পাওয়া যায়)-এর ব্যবস্থার 'ইল্লাত বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

كَىْ لَايَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ـ (الحشر : ٩)

"যাতে তোমাদের মধ্যে সম্পদশালীদের মধ্যেই সম্পদ পর্যায়ক্রমে সীমিত হয়ে না থেকে যায়।"

(খ) لِاَجْلِ বা مِنْ اَجْلِ ব্যবহারে 'ইল্লাত বর্ণনা করা হয়, যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ انما جعل الاستيذان لاجل البصر

"দৃষ্টির কারণে অনুমতি চাওয়ার হুক্‌ম দেয়া হয়েছে।" অর্থাৎ মেয়েদের উপর দৃষ্টি সংযত করাই উদ্দেশ্য।

انما نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحى لاجل الدافة ـ

"কুরবানীর গোশ্‌ত জমা করে রাখতে তোমাদেরকে মানা করা হয়েছে, যাতে (অন্যদের জন্য) ব্যাপকতা সৃষ্টি হয়।"

(গ) اذن শব্দের মাধ্যমে 'ইল্লাত বর্ণনা করা হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবী দেহ্‌য়া কাল্‌বীর একটি প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন ঃ

اذن يكفى همك ويغفر ذنبك ـ

"তাতে তোমার উদ্বেগ যথেষ্ট নিবারিত হবে এবং তোমার গুনাহ মাফ করা হবে।"

৩. স্পষ্ট হরফ (حرف = Preposition)-এর মাধ্যমে ইল্লাত প্রকাশ ঃ যেমন (ক) لِ (জন্য)। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ ـ (ابراهيم : ١)

"যাতে (তোমার কাছে এই কিতাব নাযিল করেছি) তুমি লোকদেরকে অন্ধকার থেকে আলোকের দিকে নিয়ে যাও।"

ফকীহ্‌গণ এই লাম (ل) অক্ষরটি সম্বন্ধে বলেন ঃ

فان اهل اللغة قدنصوا على انه للتعليل ـ

"অভিধানবিদরা স্পষ্ট বলেন ঃ 'লাম' তা'লীলের (ইল্লাত বর্ণনা করা) জন্য ব্যবহৃত হয়।"

(খ) "بَاء" (ب) হরফের সাহায্যে ইল্লাত বর্ণনা করা হয়। যেমন ঃ

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ـ (ال عمران : ١٥٩)

"আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে আপনি লোকদের জন্য হয়েছেন কোমল স্বভাব সম্পন্ন।"

(গ) "فاء" (ف) হরফের সাহায্যে ইল্লাত বর্ণনা করা হয়। এই 'ফা' অক্ষরটি গুণ বাচক বাক্যের সাথে যুক্ত হোক বা হুকুম বাচক বাক্যের সাথে সংযুক্ত হোক–উভয় অবস্থায় তা ইল্লাত নির্দেশের কাজ দিতে পারে। এর উদাহরণ হাদীসে নিম্নরূপ ঃ

زملوهم بكلومهم ودمائهم فانهم يحشرون ـ

"তাদেরকে (শহীদদেরকে) আহত ও রক্তাক্ত দেহ সহকারে আচ্ছাদিত (অবস্থায় দাফ্‌ন) করো। কারণ এদেরকে এই অবস্থায় (কিয়ামতের দিন) উঠানো হবে।" এক্ষেত্রে انهم يحشرون كذلك কথাটিতে শহীদানের সৌভাগ্যের (গুণের) প্রকাশ রয়েছে– যা বিনা গোসলে দাফন করার হুকুমের ইল্লাত।

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا ـ (المائدة : ٣٨)

"চোর পুরুষ বা স্ত্রীলোক হোক, তাদের হাত কেটে ফেলো।" এক্ষেত্রে চুরি হচ্ছে ইল্লাত এবং তার বিধান (হুকুম) হলো হাত কাটা, "ف"এই হুকুমবাচক শব্দ (فاقطعوا)-এর সাথে যুক্ত হয়েছে ইল্লাত নির্দেশক রূপে।

উল্লেখিত হরফগুলিকে স্থান-কালের ভিত্তিতেই ইল্লাত হিসাবে বিবেচনা করা হবে। কারণ এগুলির ব্যবহারের অন্যান্য ক্ষেত্রও রয়েছে।

اِنْ এবং اِنَّ ও স্থান-কাল ভেদে ইল্লাত নির্দেশের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। اِنَّ -এর উদাহরণ যেমন– কোরআন মজীদের ইউসুফ (আ)-এর উক্তি ঃ

وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِيْ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ ـ (يوسف : ٥٥)

"আমি নিজের নফসের সাফাই বর্ণনা করছি না, (কারণ) নফ্‌সতো অসৎকর্মের অতি বড় প্ররোচক।

এছাড়া যৌগিক শব্দও ইল্লাত নির্দেশের জন্য ব্যবহৃত হয়, যেমন–

لعلة كذا ـ لموجب ـ لسبب ـ لمؤثر ـ لكذا ـ بكذا ـ ইত্যাদি।

ইল্লাত নির্দেশে حروف -এর মর্যাদা ও স্তর

ফকীহগণ উল্লেখিত শব্দ ও حروف -এর মর্যাদা নির্ণয় করেছেন। যেমন– তাঁরা اِذَن ও كَىْ، لاَجْل -কে প্রথম স্তরের মর্যাদা দিয়েছেন। لاَمْ কে রেখেছেন দ্বিতীয়

স্তরে, ان ও باء (ب) কে তৃতীয় স্তরে এবং فاء (ف) কে চতুর্থ স্তরে। এগুলি ছিল সুস্পষ্টভাবে ইল্লাত নির্দেশের উদাহরণ। এখন ইশারার (اشارة) মাধ্যমে প্রকাশিত ইল্লাতের কিছু উদাহরণ তুলে ধরছি। এর বারটি পদ্ধতিগত নমুনা নিম্নরূপ ঃ

১. "فاء"-এর ব্যবহারে যে ক্ষেত্রে "হুকুম" এবং "সিফাৎ" (صفة) উভয়ের উল্লেখ করা হবে এবং فاء যুক্ত হবে হুকুম বাচক বাক্যে। রাসূল (সা)-এর বাণীতে এর উদাহরণ। যেমন ঃ لاتقربوه طيبا فانه يبعث يوم القيامة ملبيا ـ

"এই ব্যক্তি (মৃত হাজী)-র শরীরে খোশ্‌বু মাখাবেনা, কারণ (ف) হাশরের ময়দানে তাকে "লাব্বায়ক" উচ্চারণ অবস্থায় সমবেত করা হবে।"

বর্ণনাকারীর বর্ণনায় হুকুম বাচক বাক্যে فاء সংযোগের উদাহরণ ঃ سهى فسجد "ভুলে গেছে, কাজেই (ف) সে সিজ্‌দা করেছে", অর্থাৎ সিজদা-এ সাহুও (سهو) করেছে।

পূর্বে বর্ণিত কুরআন মজীদের উদাহরণ যেমন–

والسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا ـ (المائدة : ٣٨)

"চোর পুরুষ হোক বা নারী (ف) উভয়ের হাত কেটে দাও।"

উল্লেখ্য, কোনো কোনো ফকীহ এই আয়াতে "ف" কে صريح বলে বর্ণনা করেছেন, ইশারারূপে গণ্য করেন না।

বর্ণনাকারীর বর্ণনা হুকুম বাচক কথায় فاء-এর উদাহরণ ঃ زنى ماعز فرجم

"মাইয যিনা করেছিল, কাজেই (ف) তাকে রজম (প্রস্তরাঘাতে হত্যা) করা হয়েছিল।"

২. কোন ব্যক্তি রাসূল করীম (সা)-এর কাছে এসে স্বীকৃতি প্রদান করে রমাদানের রোযা রাখার অবস্থায় সে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে। একথা শুনে তিনি বললেন ঃ عتق رقبة। "একটি গোলাম আযাদ করে দাও।"

এ থেকে জানা গেলো, হুকুমের ইল্লাত হচ্ছে "সহবাস" স্বীকৃতি প্রদানের সাথে সাথে হুকুমটি দেয়া হয়েছিল– এটাই ইল্লত নির্দেশক ইংগিত।

৩. কোনো বিশেষ সিফাৎ বা বৈশিষ্ট্যের কারণে দুটি হুকুমের মধ্যে পার্থক্য করা হলো। এক্ষেত্রে ঐ সিফাৎটি হুকুমের পার্থক্যের ইল্লাত গণ্য হবে। যেমন–

للفارس سهمان وللرجل سهم ـ

"ঘোড়া সওয়ারের জন্য (জিহাদ লব্ধ সম্পদের বণ্টনের বেলায়) দুই ভাগ এবং পদাতিকের জন্য একভাগ।"

৪. হযরত রাসূল (সা) বললেন ঃ القاتل لايرث। অর্থাৎ হত্যাকারী উত্তরাধিকার পাবে না। لايرث এই হুকুমটি কত্‌ল কর্মটির সাথে যুক্ত হওয়াতে ইংগিত পাওয়া যাচ্ছে যে, হুক্‌মটির ইল্লাত হচ্ছে কত্‌ল।

৫. দুটি হুকুমের মধ্যে যখন ব্যতিক্রম (استثناء) অর্থসূচক অব্যয়ের (যথা ৸।) মাধ্যমে পার্থক্য করা হলে তাতে ইল্লাতের ইংগিত পাওয়া যায়।

وَ اِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلاَّ اَنْ يَّعْفُوْنَ ـ (البقراة : ٢٣٧)

"যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার আগে তালাক দাও এবং তাদের জন্য মহর (مَهر)-এর অর্থ নির্ধারিত করে থাকো তাহলে নির্ধারিত মহরের অর্ধেক দিতে হবে, ব্যতিক্রম হবে (৸।) যদি তারা মাফ করে দেয় (অর্থাৎ কিছুই) দিতে হবে না।"

এখানে يَعفون (মাফ করে দেওয়া) কথাটিতে সংযুক্ত ৸। মহরের অর্ধাংশ নাকচ হয়ে যাবার ইল্লাতের ইংগিত রয়েছে– صَراحه অর্থাৎ স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়নি।

৬. যখন কোনো হুকুমের চূড়ান্ত পর্যায় বর্ণনা করা হবে এবং তার সাহায্যে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কায়েম করা হবে, যেমন–

فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ وَلاَتَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ـ (البقرة : ٢٢٢)

"ঋতুকালীন সময়ে তাদের (স্ত্রীদের) থেকে আলাদা থাকো, যে পর্যন্ত না তারা পাক হয়ে যায়।" এ আয়াতে حَتى শব্দটি لاَتَقْرَبُوْهُنَّ এর হুকুমটির সীমারেখা টানা হয়েছে। এ থেকে জানা গেলো, স্ত্রীদের থেকে আলাদা থাকার হুকুমের ইল্লাত হচ্ছে حَيْض বা ঋতুর নাপাকী।

৭. যখন শর্তের পদ্ধতিতে বর্ণনা করা হবে এবং তা থেকে পার্থক্য বুঝা যাবে। যেমন রিবা (رِبًا = সুদ)-এর ব্যাপারে রাসূল (সা)-এর উক্তিতে দেখা যায় ঃ

مثلا بمثل فان اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ـ

"(অভিন্ন জিনিস হলে) সমপরিমাণে বিনিময় (কেনাবেচা) হবে, যদি জিনিস দুটো ভিন্ন হয়। (এই শর্তে) যেভাবে চাও বিক্রি করো" (সে ক্ষেত্রে কম-বেশি করা জায়িয হবে)।

এখানে বিনিময় পণ্যের "শ্রেণীর বিভিন্নতা" কম-বেশির বৈধতার ইল্লাত হিসাবে পণ্য হবে এবং রিবা হবে না।

৮. যখন لكن যোগে হুকুম বর্ণনা করা হবে এবং এর সাহায্যে দুটো কাজের মধ্যে পার্থক্য বুঝা যাবে। যেমন– কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْاَيْمَانَ ـ (المائدة : ٨٧)

"আল্লাহ্ (অভ্যাস বশত) অবচেতনভাবে উচ্চারিত অর্থহীন কসম এর জন্য তোমাদের পাকড়াও করবেন না। তবে তোমরা স্বেচ্ছাকৃতভাবে যেসব কসম করেছো (সেগুলির ব্যাপারে আল্লাহ্ তোমাদের পাকড়াও করবেন।"

৯. যখন এমন কোনো বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ থাকবে, যাকে ইল্লাতের অর্থে নিলে তার উল্লেখই অর্থহীন হয়ে যাবে। যেমন– খেজুর বিনিময়ের ব্যাপারে রাসূল (সা)-এর ফায়সালা ঃ ـ اينقص الرطب اذا جف قيل نعم قال فلا اذا

[হযরত (সা) জিজ্ঞেস করলেন] "তাজা খেজুর কি শুকিয়ে গেলে (পরিমাণে) কম হয়ে যায়? লোকেরা বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে এ অবস্থায় (জায়িয) নয়।"

এক্ষেত্রে খেজুরের শুষ্কতায় ও পরিমাণ হ্রাসের ব্যাপারটিকে যদি হুকুমের ইল্লাত না মনে করা হয় তাহলে তার উল্লেখই অর্থহীন হয়ে যায়।

১০. কখনো সন্দেহের কারণ বর্ণনা করার মাধ্যমেও ইল্লাতের প্রতি ইংগিত করা হয়। যেমন–হযরত উমর (রা) একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ শুধুমাত্র 'চুম্বন' করলেই কি রোযা ভেঙে যাবে ? জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ যদি 'কুল্লি' করার জন্য মুখের মধ্যে পানি নাও এবং (এমন ভাবে সাবধানে) কুল্লি করো যাতে হল্‌কের (কণ্ঠনালী) মধ্যে পানি না প্রবেশ করে তাহলে কি রোযা ভেঙে যাবে ? اكنت شاربه। তাতে কি বলা যাবে তুমি পানি পান করেছো? এই জবাবে উমর (রা)-এর সন্দেহ দূর করা হল। বলা হল, পানি পান করার সূচনা হয়. মুখে পানি নেয়াতে। কিন্তু পান না করলে যদি রোযা নষ্ট না হয় তবে সংগমের সূচনায় যে চুম্বনে হয় তার পর যদি সঙ্গম না হয় তাতে কেন রোযা ভাঙ্গবে ?

১১. হুকুমের সাথে মিলিয়ে যে صِفة (বৈশিষ্ট্য) উল্লেখ করা হয়েছে সেটাই হুকুমের ইল্লাত গণ্য হবে। যেমন ঃ ـ لايقضى القاضى وهو غضبان

"কাযী যেন ক্রোধান্বিত অবস্থায় কোনো ফায়সালা না দেয়।" এখানে ক্রোধকে ফায়সালা নিষিদ্ধ করার ইল্লাত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

১২. হুকুমকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে যে জিনিসটি বাধা হয়ে দাঁড়ায়, হুকুম উল্লেখ করার পর তা থেকে বাধা দেওয়াও ইল্লাতের দিকে ইংগিত করে। যেমন ঃ

اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوْا الْبَيْعَ ـ (الجمعة : ٩)

"জুমুআর দিনে যখন সালাতের আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহ্‌র যিকিরের দিকে তাড়াতাড়ি যাও এবং বেচাকেনা বন্ধ করো।"

এই আয়াতে যিকিরের (জুমুআর নামায) দিকে ত্বরায় যাওয়ার পথে বাধা হচ্ছে বেচাকেনা অর্থাৎ কাজ কারবার জারী রাখা। কাজ কারবার বন্ধ করার আদেশের মধ্যে নিহিত রয়েছে জুমুআর হুকুমের গুরুত্ব।[১৪৩]

ইজমার মাধ্যমে ইল্লাত নির্ধারণ

কুরআন ও সুন্নায় সুস্পষ্টভাবে (صراحة) অথবা ইংগিতে (إشارة) ইল্লাতের উল্লেখ যদি না থাকে তবে ইজমার মাধ্যমে ইল্লাত নির্ধারিত হতে পারে। যেমন মীরাসের ব্যাপারে ইজমার মাধ্যমে স্থির হয়েছে যে, আপন ভাই পিতৃ শরীক ভাইয়ের ওপর অগ্রাধিকার লাভ করবে, আর এর ইল্লাত হচ্ছে "امتزاج النسبين" (বাপ ও মা উভয় সম্পর্কের মিলন)। অথবা নাবালেগ ছেলে ও মেয়ের অভিভাবক হবে তার বাপ। আর এর ইল্লাত হলো অপ্রাপ্ত বয়স্কতা।

ইজতিহাদের সাহায্যে ইল্লাত বের করার কতিপয় পদ্ধতি

ফকীহগণ ইজতিহাদ ও ইস্‌তিমবাতের মাধ্যমে ইল্লাত বের করার জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলি নির্ধারিত করেছেন।

প্রথম পদ্ধতি হচ্ছে সম্পর্ক

সম্পর্ক ঃ সম্পর্কের মাধ্যমে ইল্লাত বের করা যেতে পারে। এ বিষয়টি অনুধাবন করার জন্য কয়েকটি প্রাথমিক বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন ঃ

(ক) ফকীহ্‌গণ এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, নসের (হুকুম) সমস্ত গুণের প্রভাব হুকুমের মধ্যে পড়ে না। যেমন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কোনো গ্রামীণ আরবের জন্য কোনো কথা বলেন, এতে তার গ্রামীণতার গুণের কোনো প্রভাব মূল হুকুমে পড়বে না। বরং গ্রামীণ ও অগ্রামীণ এক্ষেত্রে সমান হবে।

(খ) এ ব্যাপারেও ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, নসের মধ্যে যতগুলো গুণ থাকে তারা সবাই ইল্লাতে পরিণত হয় না। যেমন নিচের বহুল প্রচলিত হাদীসে দেখা যায় ঃ الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر ـ "গমের বদলে গম, যবের বদলে যব এবং খেজুরের বদলে খেজুর।" এখানে মাপ বা ওজন শ্রেণী, স্বাদ, মূল্য ও খাদ্যপ্রাণ কয়েকটি গুণাবলী সহকারে রয়েছে। কিন্তু তবুও একজন

---

১৪৩. তাওযীহ তালবীহ, শরহে মুসাল্লামুস সুবূত, মিনহাজুল উসূল ইত্যাদি।

ফকীহও সবগুলিকে ইল্লাত গণ্য করেননি। বরং বিভিন্ন ফকীহ বিভিন্ন জিনিসকে ইল্লাত গণ্য করেছেন।

(গ) ফকীহের জন্য বিনা প্রমাণে ইচ্ছা মতো যে কোনো গুণকে ইল্লাত গণ্য করা জায়িয নয়। কারণ হুকুমের ইল্লাতের মর্যাদা ঠিক তেমনি, যেমন দাবীর ক্ষেত্রে 'চাক্ষুষ দেখার' মর্যাদা।

চাক্ষুষ দেখা বা সাক্ষ্য নির্ভরযোগ্য হবার জন্য দুটি বিষয় অপরিহার্য। সাক্ষ্য দানকারীর।

১. সৎ হওয়া,

২. আদেল তথা ভারসাম্য গুণের অধিকারী হওয়া।

অনুরূপভাবে যে গুণটি ইল্লাতে পরিণত হচ্ছে তার মধ্যে 'সৎগুণ' ও 'ভারসাম্যতা' থাকা অপরিহার্য। এই দুটি থাকলে তবেই তা 'ইল্লাত' হবার যোগ্যতা অর্জন করবে।

ইল্লাতের মধ্যে সৎগুণের মানে হচ্ছে এই যে, তা এমন সব ইল্লাতের সাথে সামঞ্জস্যশীল হবে যেগুলি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে 'সুস্পষ্টভাবে', "ইশারা ইংগিতে" অথবা ইজ্‌মার সাহায্যে প্রমাণিত হবে। যেমন, বিয়ের অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে 'কম বয়স' হওয়া ইল্লাত। সম্পত্তির অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রেও এই একই গুণ অর্থাৎ 'কম বয়স" হওয়াই ইল্লাত। এর সাথে সামঞ্জস্যশীল নসের ক্ষেত্রে যে গুণটির ইল্লাত হওয়া প্রমাণিত হয় সেটি হচ্ছে বিড়ালের উচ্ছিষ্ট সম্পর্কিত বিধানের ক্ষেত্রে 'তাওয়াফ' (অত্যধিক আসা যাওয়া) গুণটি। এদের উভয়ের সামঞ্জস্য হচ্ছে 'আবশ্যকতা' ও 'প্রয়োজন'। উভয়ের মধ্যে এ গুণ পাওয়া যায়। অনরূপভাবে নতুন বিষয়ের (বিয়ে ও সম্পত্তির অভিভাবকত্ব) গুণের (ইল্লাত) সামঞ্জস্য নস্ বিধৃত গুণ থেকে প্রমাণিত হয়।

ইল্লাতের মধ্যে 'আদালত' বা ভারসাম্য গুণের মানে হচ্ছে, গুণের প্রভাব 'মুআল্লাল বিহি' (এই গুণকে যার ইল্লাত হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে) হুকুমের মধ্যে পূর্বেই প্রকাশিত হয়। তবেই তো তার ওপর নতুন বিয়ে বা মাস্‌আলার কিয়াসের বুনিয়াদ রাখা হবে। এর কতিপয় আকৃতি নিচে দেয়া হলো ঃ

১. ঠিক এই গুণের (ইল্লাত) প্রভাব ঠিক এই 'মুআল্লাল বিহি' হুকুমের মধ্যে প্রকাশিত হয়। যেমন 'তাওয়াফের' প্রভাব থাকে বিড়ালের উচ্ছিষ্টের মধ্যে।

২. ঠিক এই গুণের প্রভাব এই হুকুমের 'শ্রেণীর' মধ্যে প্রকাশিত হয়। যেমন 'কম বয়স' এর প্রভাব বিয়ের বিধানের শ্রেণীভুক্ত "সম্পত্তির অভিভাবকত্বের" মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। যেহেতু শ্রেণীর মধ্যে এ প্রভাবটি ছিল, তাই বিয়ের মধ্যেও একে প্রভাবশালী গণ্য করা হয়েছে।

৩. গুণ শ্রেণীগতভাবে এই হুকুমের (মুআল্লাল বিহি) ঠিক কেন্দ্রেই প্রভাব ফেলবে। যেমন– বেহুঁশ হয়ে যাবার কারণে যদি কোনো ব্যক্তি অনেক ওয়াক্তের নামায পড়তে সক্ষম না হয় তাহলে তার কোন কাযা নেই। এর মধ্যে গুণ (ইল্লাত) হচ্ছে বেহুঁশ হয়ে যাওয়া। এটি "উম্মাদনা" শ্রেণীভুক্ত। এক্ষেত্রে "উন্মাদনা"র প্রভাব বিধানের মধ্যে ছিল এবং নামাযের কাযা উন্মাদের ওপর ওয়াজিব ছিল না। অনুরূপভাবে ঠিক এই বিধানেও "উম্মাদনার" শ্রেণীর প্রভাব মেনে নেওয়া হয়েছে এবং দীর্ঘকাল বেহুঁশ থাকার পর সংজ্ঞা ফিরে এলে কাযা ওয়াজিব না হবার হুকুম দেয়া হয়েছে।

৪. গুণগত শ্রেণীর প্রভাব এই হুকুমের শ্রেণীর মধ্যে হবে। যেমন ওযর সম্পন্ন স্ত্রীলোকের ওপর নামায ফরয থাকে না। আর ফরযের এই বিধান খতম হয়ে যাওয়ার গুণগত হুকুমটি (ইল্লাত) ওযরের দিনগুলির কারণে সৃষ্টি হয়। সফরের কষ্ট এই গুণের শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল দুই রাকাত নামায থেকে অব্যাহতি দেওয়ার মধ্যে। যেহেতু সম্পূর্ণ নামাযটি থেকে অব্যাহতি দেওয়া তারই শ্রেণীর অন্তরগত, তাই গুণগত শ্রেণীর প্রভাব বিধান শ্রেণীর মধ্যে প্রকাশিত হবে।[১৪৪]

মনে রাখতে হবে, শ্রেণী বলতে নিকটবর্তী শ্রেণীকে বুঝানো হয়েছে। আর যদি উভয়ের শ্রেণী দূরবর্তী হয় তাহলে তাকে বলা হবে 'মানাসিবে মুরসাল'। অনেক ফকীহ একে স্বীকার করেন আবার অনেকে করেন না। ইমাম মালেক (র) এ থেকে "মাসালিহে মুরসালা" বা "ইস্‌তিস্‌লাহ" এর নীতি উদ্ভাবন করেছেন। এর বিস্তারিত বিবরণ আসবে "উৎস" সম্পর্কিত বর্ণনার পর্যায়ে।

ইমাম শাফেয়ীর (র) মতে "গুণগত" ভারসাম্যের অর্থ হচ্ছে, তার নির্ভুলতা ও গ্রহণীয়তার প্রতি মানসিক ঝোঁকপ্রবণতা সৃষ্টি করতে হবে। এ বিষয়টি প্রথম থেকে প্রকাশিত হওয়া জরুরী নয়। তারপর মানসিক ঝোঁকপ্রবণতা সৃষ্টির পর সতর্কতা অবলম্বনের জন্য নির্ধারিত নীতিমালার মানদণ্ডে তাকে যাচাই করে নেয়া যথেষ্ট হবে। অন্যদিকে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে প্রথম থেকে প্রকাশিত হওয়া জরুরী।

দ্বিতীয় পদ্ধতি 'তর্‌দ'

এর দ্বিতীয় পদ্ধতি 'তরদ ও আক্‌স' তরদিয়াত বা পশ্চাদ্ধাবনের মাধ্যমে ইল্লাত বের করা। এর পদ্ধতি হচ্ছে, গুণ পাওয়া গেলে হুকুমও পাওয়া যাবে এবং গুণ বদলে গেলে হুকুমও বদলে যাবে। এক্ষেত্রে গুণকে ভিত্তি বা নির্ভর এবং হুকুমকে নির্ভরকারী বলা হয়। এই পদ্ধতির দ্বিতীয় নাম হচ্ছে 'দাওরান' বা পাল্টে আসা। যেমন যতক্ষণ আংগুরের রসের মধ্যে 'সুকার' (নেশা) গুণটি সৃষ্টি হবে না ততক্ষণ তা হালাল হবে।

১৪৪. কিতাবুত তাহকীক, ২২৫ পৃষ্ঠা।

আর যখনই নেশা সৃষ্টি হয়ে যাবে তখনই তা হারাম হয়ে যাবে। এক স্থানে এটি 'দওরান'-এর দৃষ্টান্ত। আবার কখনো এই দাওরান দুই স্থানেও হয়। যেমন 'তাআম' (স্বাদ) সূদ হারাম হবার ইল্লাত। যেহেতু এই গুণটি (ইল্লাত) 'আপেল'-এর মধ্যে পাওয়া যায়, তাই এটি সূদ-সামগ্রীর মধ্যে গণ্য হবে। অন্যদিকে 'রেশমে' এই গুণ পাওয়া যায় না, তাই রেশম সূদ-সামগ্রীর মধ্যে গণ্য হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র) ও ইমাম গাযালী (র) প্রমুখ ফকীহগণ 'তরদ্ ও আক্‌স' পদ্ধতি বেশি ব্যবহার করেছেন। অন্যদিকে ইমাম আবূ হানীফা (র) এই পদ্ধতি বেশি ব্যবহার করেননি।

তৃতীয় পদ্ধতি শিব্‌হ

তৃতীয় পদ্ধতি হচ্ছে 'শিব্‌হ'। এটি এমন একটি গুণ, চিন্তা-ভাবনা ও আলোচনা পর্যালোচনার পরও যার মধ্যে হুকুমের সাথে সম্পর্ক প্রকাশিত হয় না। তবে অন্য কোন হুকুমের মধ্যে এর প্রতি শরীয়ত প্রণেতার আকর্ষণের সন্ধান পাওয়া গেছে।

এটি সম্পর্কের চাইতে কম পর্যায়ের এবং 'তর্‌দ ও আক্‌সের' তুলনায় উঁচু পর্যায়ের। একদিক দিয়ে সম্পর্কের সাথে এর সাদৃশ্য রয়েছে আবার অন্য দিক দিয়ে এর সাদৃশ্য রয়েছে 'তর্‌দ ও আক্‌সের' সাথে। এ কারণে একে 'শিব্‌হ' বলা হয়। যেমন নাজাসাত দূর করা সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী (র)-এর উক্তি।

طهارة تراد لاجل الصلوة فلا تجوز بغير الماء كطهارة الحدث -

"নামায পড়ার জন্য এই তাহারাত লাভ করার সংকল্প করা হয়। তাই পানি ছাড়া অন্য কোন প্রবহমান জিনিসের সাহায্যে এই তাহারাত অর্জন করা জায়িয নয়। এভাবে (পানি ছাড়া অন্য কিছুর সাহায্যে) অযুও জায়েয নয়।"

'নাজাসাত দূর করা' এবং 'হাদাস থেকে তাহারাত' লাভ করা, এদুয়ের মধ্যে তাহারাত সার্বজনীন জিনিস। এটি অর্জন করা হয় নামাযের জন্য। কিন্তু তাহারাতের সম্পর্ক হচ্ছে হুকুমের (পানি নির্ধারিত করা) সাথে। তার জন্য একমাত্র পানিই নির্ধারিত হয়েছে। চিন্তা-গবেষণা সত্ত্বেও তা প্রকাশিত নয়। তবে অন্যান্য বিধান যেমন কুরআন মজীদে হাত লাগাবার ও কা'বা ঘরের তাওয়াফ ইত্যাদি করার জন্য শরীয়ত প্রণেতা তাহারাতের গুণের ওপর নির্ভর করেছেন। এক্ষেত্রে পানি নির্ধারিত রয়েছে এথেকে মনে হয় 'সর্বজনীন গুণ' তাহারাতের ভিত্তিতে পানি নির্দিষ্ট করণের হুকুম এই অবস্থারও অন্তর্ভুক্ত হবে। শাফেয়ী ফিকাহ্ বিশেষজ্ঞগণ শিব্‌হের এই ব্যাখ্যাই দিয়েছেন।[১৪৫]

---

১৪৫. মিনহাজুল উসূল এবং আত্‌তাকরীর ওয়াত্ তাহজীর, ২০০ পৃষ্ঠা।

মূলত ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম শাফেয়ী (র)-এর একটি মতবিরোধের ওপর এ অবস্থাটির ভিত্ গড়ে উঠেছে। ইল্লাত সম্পর্কিত এ অবস্থাটির আলোচনা আমরা ইতিপূর্বে করেছি। অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে ইল্লাতের 'প্রভাবশালী' (মুয়াস্‌সিরাহ) হওয়া জরুরী। তবেই তা কার্যকর হতে সক্ষম হবে। অন্যদিকে ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, ইল্লাতের 'মাখলীয়া' হওয়াই যথেষ্ট। অর্থাৎ ইল্লাত ও তার নির্ভরতার প্রতি কেবল ঝোঁকপ্রবণতাই কার্যকর হবে। তার জন্য প্রভাবশালী হবার কোন প্রয়োজন নেই।

চতুর্থ পদ্ধতি কিয়াসুল ইশ্‌বাহ

চতুর্থ পদ্ধতি হচ্ছে কিয়াসুল ইশ্‌বাহ-এর আকৃতি নিম্নোক্তভাবে নির্ণয় করা যেতে পারে ঃ নতুন বিষয়টি দুটি মূল বিষয় সদৃশ হবে। একটির সাথে সাদৃশ্য হবে হুকুমের ক্ষেত্রে এবং অন্যটির সাথে হবে আকৃতির ক্ষেত্রে।

ইমাম শাফেয়ী (র) হুকুমের ক্ষেত্রে সাদৃশ্যেকে প্রাধান্য দেন। অন্যদিকে ইমাম আহমদ (র) ও ইমাম আবূ হানীফা (র) (একটি উক্তি অনুযায়ী) আকৃতির ক্ষেত্রে সাদৃশ্যকে অগ্রাধিকার দেন। যেমন নিহত গোলামের প্রসংগে ইমাম শাফেয়ীর মতে তার বিধান হবে অন্যান্য সকল গোলামের মতো। অর্থাৎ হত্যাকারীর ওপর তার মূল্য দেওয়া ওয়াজিব হবে। সেই মূল্য দীয়াত তথা 'রক্তমূল্যের' চাইতে বেশি হয়ে গেলেও। অন্যদিকে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আহমদ (র) যেহেতু আকৃতির ক্ষেত্রে সাদৃশ্যকে অগ্রাধিকার দেন,তাই তাদের মতে মূল্য "দীয়াতের" চাইতে বেশি ওয়াজিব হবে না।

পঞ্চম পদ্ধতি বিভক্তি ও পরীক্ষা

পঞ্চম পদ্ধতি হচ্ছে, "তাকসীম ও সাব্‌র" অর্থাৎ বিভক্ত করা ও পরীক্ষা করা। এর আকৃতি নিম্নোক্তভাবে নির্ণয় করা যেতে পারে।

যেসব গুণ সম্পর্কে মনে করা হবে যে, সেগুলি ইল্লাত হতে পারে সেগুলিকে এমনভাবে পরীক্ষা করতে হবে যাতে তার মধ্যে থেকে যথার্থ ইল্লাতটি ছেঁকে বের করা সম্ভব হয়। এজন্য নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী তাদের একেকটিকে যাচাই করে নাকচ করে দিতে হবে। তারপর নিয়ম অনুযায়ী যেটিকে নাকচ করা সম্ভব হবে না কেবলমাত্র সেটিই ইল্লাত গুণ বিশিষ্ট বলে গণ্য হবে। যেমন বিয়ের অভিভাবকত্বের বিষয়টি। এর ইল্লাত কি 'বাকারাত' (কুমারীত্ব) হবে, না সিগ্‌র (স্বল্প বয়স) অথবা এ দুটি ছাড়া অন্য কোনো গুণ ? মোটকথা যেসব গুণ ইল্লাত হবার যোগ্যতা রাখে তাদের সবাইকে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী যাচাই করা হবে। এক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ীর (র) নির্ধারিত

নীতি অনুযায়ী উপরোক্ত অবস্থায় শুধুমাত্র 'বাকারাত'ই ইল্লাত হবার যোগ্যতা রাখে এবং 'বাকারাত' ছাড়া অন্য সবগুলি নাকচ হয়ে যাবে। অন্যদিকে ইমাম আবূ হানীফার (র) মতে একমাত্র 'সিগ্‌র' ইল্লাত গণ্য হবে এবং অন্য সবগুলি নাকচ হয়ে যাবে।

ষষ্ঠ পদ্ধতি তরদ্‌

ষষ্ঠ পদ্ধতি হচ্ছে তরদ্‌। এর আকৃতি নিম্নরূপ ঃ এমন গুণের মাধ্যমে হুকুম প্রমাণ করতে হবে, যে হুকুমের সাথে তার সম্পর্ক জানা যাবে না এবং তা নতুন আকৃতি (যার উদ্ভব হয়েছে) ছাড়া অন্যান্য ভিন্নধর্মী আকৃতির সাথে সম্পর্ককে অপরিহার্য করে তুলবে। যেমন 'শিব্‌হের' ক্ষেত্রে হয়।

এই পদ্ধতিটির প্রামাণ্য হবার ব্যাপারে ফকীহ্‌গণের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ আছে। গবেষক ফকীহ্‌গণের মতে, এ পদ্ধতিটি প্রামাণ্য নয়। (এজন্য এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন বোধ করছিনা।)

সপ্তম পদ্ধতি 'তানকীহে মানাত'

সপ্তম পদ্ধতি হচ্ছে 'তানকীহে মানাত' অর্থাৎ মূল (পূর্বতন হুকুম) ও শাখার (নতুন সমস্যা) মধ্যে পার্থক্যকারী যে জিনিসটি থাকবে, তাকে যুক্তির মাধ্যমে অর্থহীন ও বাতিল গণ্য করতে হবে। তারপর অংশগ্রহণের ভিত্তিতে হকুমের মধ্যে উভয়কে শরীক করতে হবে। যেমন ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, ভারী জিনিস দিয়ে কাউকে হত্যা করা এবং ধারাল জিনিস দিয়ে হত্যা করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। শুধু এতটুকুন যে, একজন ভারী জিনিসের সাহায্যে এবং অন্যজন ধারাল জিনিসের সাহায্যে নিহত হয়েছে।

যেহেতু ইমাম শাফেয়ী (র) -এর মতে ইল্লাতে এই পার্থক্যের কোন দখল নেই, তাই শুধুমাত্র হত্যাকে দেখা হবে এবং উভয় ক্ষেত্রে মূল হত্যা কর্মকেই ইল্লাত গণ্য করা হবে। আর এই হত্যা যেভাবে ধারাল অস্ত্রের সাহায্যে পাওয়া গেছে তেমনে ভারী অস্ত্রের সাহায্যেও পাওয়া গেছে।

উসূলবিদদের মতে তানকীহে মানাত এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ ঃ

الحاق الفرع بالاصل بالغاء الفارق بان يقال لافرق بين الاصل والفرع الا كذا وذلك لامدخل له فى الحكم البتة فيلزم اشتراكهما فى الموجب له ـ

"মাঝখানে পার্থক্যকারী বস্তুটিকে নাকচ গণ্য করে শাখাকে মূলের সাথে এমনভাবে শামিল করা যাতে মূল ও শাখার মধ্যে বিশেষ পরিমাণ ছাড়া কোন পার্থক্য

থাকবে না। আর এই বিশেষ পরিমাণের হুকুমের মধ্যে কোন দখল নেই। মূলবস্তুতে যখন উভয়ে শামিল তখন হুকুমেও উভয়ে শামিল হবে।[১৪৬]

সাধারভাবে প্রচলিত আছে যে, হানাফীয়ারা ১. শিব্‌হ, ২. তাকসীম, ৩. দওরান ও ৪. তানকীহ– এই চারটি পদ্ধতি স্বীকার করে না। কিন্তু সামগ্রিকভাবে একথা ঠিক নয়। কাজেই 'দাওরান' পদ্ধতিতে মাসায়েল নির্ণয় ও উদ্ভাবন হানাফীয়াদের এখানেও দেখা যায়। যেমন এর বিস্তারিত আলোচনা সামনের দিকে আসবে। "তানকীহ" এর তাৎপর্যও তারা স্বীকার করেন, যদিও যথারীতি পারিভাষিক রূপের প্রমাণ তাদের এখানে পাওয়া যায় না। অনুরূপভাবে "তাকসীম" এর ব্যাপারেও তারা ব্যাপকতার আশ্রয় নিয়ে থাকেন। কারণ, শিব্‌হ এর ভিত্ কায়েম রয়েছে "ইল্লাতে মাখলিয়া" এর ওপর। আর ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে ইল্লাতের জন্য মুয়াস্‌সিরাত হওয়া জরুরী, শুধুমাত্র "মাখ্‌লীয়া" হলে কাজ হবে না।[১৪৭]

ফকীহ্‌গণ এ প্রসংগে আরো দুটি পরিভাষাও ব্যবহার করে থাকেন। এক. তাখরীজে মানাত এবং দুই. তাহকীকে মানাত।

তাখরীজে মানাত ও তাহকীকে মানাতের সংজ্ঞা

استخراج علة معينة للحكم ببعض الطرق المقدمة كالمناسبة ـ

"মুআইয়্যেনা (নির্দিষ্টকরণ), মুনাসিবাত (সম্পর্কিতকরণ) ইত্যাদি উল্লেখিত পদ্ধতির মাধ্যমে চিন্তা-গবেষণা করে হুকুমের ইল্লাত নির্ণয় করা।"[১৪৮]

যেমন সূদের ইল্লাত বের করতে হলে চিন্তা করতে হবে, এর ইল্লাত কি স্বাদহীন পরিমাপ হবে , না খাদ্যপ্রাণতা?

তাহকীকে মানাতের অর্থ হচ্ছে ঃ যে ইল্লাত স্থিরীকৃত হবে চিন্তা-গবেষণার পর নতুন বিষয়ের ক্ষেত্রে তাকে প্রমাণ করা। যেমন সূদের ইল্লাত স্থিরীকৃত হলো পরিমাপ বা ওজন। এক্ষেত্রে অন্যান্য জিনিসের মধ্যে দেখতে হবে এই ইল্লাতটি কার মধ্যে পাওয়া যায়, যার ভিত্তিতে তাকে সূদ সামগ্রীর মধ্যে গণ্য করা যায় এবং কার মধ্যে পাওয়া যায় না, যার ভিত্তিতে তাকে সূদ সামগ্রীর বাইরে রাখা যায়। উসূলবিদগণের মতে তাহকীকে মানাতের সংজ্ঞা নিম্নরূপ ঃ

ان يقع الاتفاق على علية وصف بنص او اجماع فيجتهد الناظر فى صورة النزع التى خفى فيها وجود العلة ـ

---

১৪৬. হুসূলুল মামুল মিন ইল্‌মিল উসূল, ৯৪ পৃষ্ঠা।

১৪৭. শারহে মুসাল্লামুস সুবূত।

১৪৮. মিনহাজুল উসূল আলা হাশীয়া আত্‌তাকরীর ওয়াত্ তাহজীর, ৫১ পৃষ্ঠা।

"নস্ বা ইজ্‌মার মাধ্যমে সর্ব সম্মতিক্রমে যে ইল্লাত প্রমাণিত হয়, চিন্তা গবেষণার মাধ্যমে নতুন বিষয়ের (যার মধ্যে ইল্লাত নিহিত রয়েছে) মধ্যে তা প্রমাণ করা।"[১৪৯]

যেমন চোরের জন্য যে শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে তার ইল্লাত হচ্ছে চুরি করা। এটি সর্বসম্মতিক্রমে প্রমাণিত। এক্ষেত্রে "নাব্বাশ" বা কাফন চোরের নতুন বিষয়টির উদ্ভত হয়। এখন চিন্তা-গবেষণা করে প্রমাণ করতে হবে "নাব্বাশকে" চোরের দলে শামিল করা যেতে পারে কিনা?

আল্লামা শাতবীর নিম্নোক্ত সংজ্ঞা বেশি ব্যাপক ও অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল মনে হয় ঃ

او معناه ان يثبت الحكم بمدركه الشاعى لكن يبقى النظر فى تعيين محله ـ

"তাহকীকে মানাতের মানে হচ্ছে, হুকুম স্বস্থানে শরীয়ত বিধৃত পদ্ধতিতে প্রমাণিত হবে। কিন্তু তার স্থান নির্ধারণের ক্ষেত্রে চিন্তা-গবেষণা করার কাজ বাকি থাকবে।"[১৫০]

যেমন "আদালত" তথা ন্যায়পরায়ণতা বা ভারসাম্যতার অর্থ স্বস্থানে শরীয়ত বিধৃত পদ্ধতিতে প্রমাণিত। কিন্তু স্থান-কালের প্রেক্ষিতে কার মধ্যে কোন্ পর্যায়ের "আদালত" পাওয়া যায়, উপরন্তু অবস্থা ও চাহিদার দৃষ্টিতে তার প্রকাশ্য মানদণ্ড কি হবে– একাজ মূলত বাকি থেকে যায়। প্রতি যুগে এর প্রয়োজন হয়।

ইল্লাতের শর্তসমূহের বর্ণনা

ফকীহগণ 'ইল্লাতের জন্য নিম্নোক্ত শর্তাদি নির্ধারণ করেছেন।

১. ইল্লাতের জন্য 'মুনাসিবাত (مُناسبة) তথা উপযোগিতা শর্ত। অর্থাৎ আহকাম নির্ধারণ করার ব্যাপারে শরী'আত প্রণেতার সামনে যে হিকমত (মাস্‌লাহাত) ছিল এই ইল্লাত সেই হিকমতের অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন মুসাফির-এর ইফ্‌তার (افطار) অর্থাৎ রমযানের রোযা না রাখার ইখতিয়ার দেয়ার ইল্লাত হচ্ছে "সফর" এবং কষ্ট (مشقت) হচ্ছে তার হিকমত। এই (رُخصة) (হুকুমকে শিথিল করা)-এর মাধ্যমে শরী'আত প্রণেতার উদ্দেশ্যে হচ্ছে ক্ষতি নির্ধারণ। সফরে কষ্টের মাধ্যমে মুসাফির ক্ষতির সম্মুখীন হয়। তাই ক্ষতি নির্ধারণের লক্ষ্যে সফর ইল্লাত হিসাবে গণ্য হয়েছে এবং মুসাফির অনুমতি পেয়েছে।

---

১৪৯. হুসূলুল মামুল মিন ইলমিল উসূল, ৯৪ পৃষ্ঠা এবং ফতহুল মুলহিম, মুকাদ্দামা, ৮৯পৃষ্ঠা।

১৫০. ফতহুল মুলহিম, ৮৯ পৃষ্ঠা।

একটি নীতি হচ্ছে, শরী'আতের বিধানসমূহের লক্ষ্য জল্‌ব-এ-নাফা (جلب نفع) অর্থাৎ যা লাভজনক তা আকর্ষণ (অর্জন) করা এবং দাফা' দারার (دفع ضرر) অর্থাৎ যা ক্ষতিকর তার প্রতিরোধ করা। যেমন– উসূলের বইগুলিতে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ احكام الشرعية معللة بمصالح العباد ـ والشارع انما حكم بها على ما اقتضته مصالح العباد ـ

"শরী'আতের হুকুমসমূহ বান্দার মাস্‌লাহাত তথা কল্যাণ ও প্রয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত এবং বান্দার মাসলাহাতের যা চাহিদা শরী'আত প্রণেতা তারই হুকুম দিয়েছেন।[১৫১]

এই মাসলাহাতের সম্পর্কে রয়েছে তিনটি জিনিসের সাথে।

এক. পাঁচটি কুল্লিয়্যাত (كليات خمسة) ঃ মানবের ধর্ম (دين), বুদ্ধি (عقل), বিত্ত (مال), বংশ (نسب) ও নফস (نفس)। হিফাযাত বা রক্ষণের জন্য শরী'আতে বহু বিধান রয়েছে।

দুই. মুআমেলাত (معاملات) ঃ বেচনাকেনা, ভাড়া, বণ্টন ইত্যাদির জন্যও বিধান জারী হয়েছে।

তিন. মানুষের জাহেরী (ظاهرى) ও বাতেনী (باطنى) জীবনের রক্ষণের গরযে শরঈ বিধানাবলী প্রণীত হয়েছে। প্রত্যেকটি বিধানের পশ্চাতে রয়েছে মানব কল্যাণ বা মাসলিহাত (مَصلحة)।

২. ইল্লাত নির্দিষ্ট হওয়াই শর্ত। হিকমতকে (মাসলাহাত) ইল্লাত গণ্য না করার কারণ হচ্ছে হিকমতে প্রচ্ছন্নতা। অথচ হুকুমের সমগ্র ক্ষেত্রে ইল্লাত দৃশ্যমান হওয়া জরুরী, কোন ক্ষেত্রে তা প্রচ্ছন্ন থাকলে চলবেনা। যেমন রামাদানে ইফতারের অনুমতির ইল্লাত হচ্ছে "সফর" এবং কষ্ট হচ্ছে তার হিকমত। কিন্তু শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যান-বাহনে সফরকারীদের সফরের কষ্ট দৃশ্যমান নয়। তবে কি তারা এই রুখসাত লাভের অযোগ্য প্রমাণিত হবে? না সফরকে ইল্লাত নির্ধারণ করলে কোন মুসাফিরকে রুখসাত থেকে বঞ্চিত করার প্রয়োজন হয় না। কে এই রুখসাত লাভ করবে, কে করবে না– এ নিয়ে বির্তক সৃষ্টি হয় না।

তবে শুদ্ধ মত হচ্ছে ঃ যদি হিকমত দৃশ্যমান হয়, যদি তাতে কোন প্রচ্ছন্নতা না থাকে, তবে তাকে 'ইল্লাত রূপে গণ্য করা যায়, অর্থাৎ তার সাথে হুক্‌মের সম্পর্ক স্থাপন করা জায়িয, বরং ওয়াজিব, অবশ্য যদি কোন বিঘ্ন না থাকে। এই কথাটিই নিম্নোক্ত বাক্যে প্রকাশ পেয়েছে ঃ

ولو وجدت الحكمة ظاهرة منضبطة جاز ربط الحكم بها لعدم المانع بل يجب ـ

---

১৫১. শরহে মুসাল্লামুস সুবূত লি বাহ্‌রিল উলুম, ৫৪২ পৃষ্ঠা।

"যদি হিকমত প্রকাশিত হয় (হুকুমের সমস্ত ক্ষেত্রে পাওয়া যায়) এবং সুশৃংখল হয় (যাতে নিয়ম-শৃংখলা বজায় থাকে) তাহলে হিকমতের সাথে হুকুমের সম্পর্ক বৈধ বরং ওয়াজিব হবে। কারণ, এ অবসাথায় কোন প্রতিবন্ধক থাকে না।[১৫২]

ইমাম রাযী (র) ও ইমাম বাইযাবী (র) হিকমতকে 'ইল্লাত গণ্য করার ব্যাপারে আরো উদার দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছেন।[১৫৩] তাহলে উচ্চ শ্রেণীর মুসাফির কি ইফতারের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন ? তাঁদের জবাব হচ্ছে ঃ না। مَشقت (কষ্ট) বহু স্তরের হতে পারে, তার মাত্রাও অসংখ্য। এই মুশাক্কাত মাত্রা ভেদে প্রত্যেক মুসাফির-এর সফরের সাথে সংশ্লিষ্ট। তাই কষ্ট নিবারণের হিকমতকে 'ইল্লাত গণ্য করলে কেউ রুখসাত থেকে বঞ্চিত হবে না।

কিন্তু ফকীহগণ এর জবাবে বলেন, হিকমতের (যা ইল্লাতে পরিণত হচ্ছে) সাধারণভাবে হুকুমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তির সাথে শামিল হওয়াই যথেষ্ট। হুকুমের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে একই ধরনের কষ্টের অস্তিত্ব থাকা জরুরী নয়। বরং অধিকাংশ ব্যক্তির মধ্যে প্রাধান্য বিস্তারকারী ধারণা হিসাবে নিছক কষ্টের অস্তিত্ব পাওয়া গেলেই হবে। আর উপরোক্ত অবস্থাতেই এটা সম্ভব।

হিকমতকে ইল্লাত বানাবার উপরোক্ত উদাহরণটি নিছক বিষয়টি বুঝাবার জন্য উপস্থাপিত হয়েছে। সফররত অবস্থায় রুখসাতের ক্ষেত্রে কষ্ট (হিকমত) ইল্লাতে পরিণত হতে পারে, একথা প্রমাণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কারণ কষ্টকে ইল্লাতে পরিণত করলে নিয়ম-শৃংখলা বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়বে।

একথা সুস্পষ্ট যে, সফর হয় বিভিন্ন ধরনের। এ হিসাবে কষ্টের মধ্যে নানান ফারাক দেখা যায়। এদের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায় ও স্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। এদের সবগুলিকে একটি নিয়ম-শৃংখলার আওতায় আনা, তারপর পর্যায় নির্ধারণ করে কোনোটাকে রুখসাত দেয়া এবং কোনটাকে রুখসাত না দেয়া বড়ই কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

কোন অভাব ও কমতির কারণে কোন সময় কিছু কিছু ছোট-খাট ও খুঁটিনাটি বিষয়ের বিধানের ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধন করার মতো পার্থক্য সৃষ্টি করার কোন অবকাশ আইনের জগতে নেই। তবে পার্থক্যটা যদি মামুলি পর্যায়ের হয় এবং অন্য কোন পথে তার ক্ষতিপূরণ সম্ভব হয় তাহলে মূল বিধান অপরিবর্তিত রেখে ক্ষতিপূরণের পথ বের করা যেতে পারে। যেমন সফরে একদিকে রেলের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীকে সব ধরনের কষ্ট ও ধকল সহ্য করতে হয়। আবার অন্যদিকে "এয়ারকণ্ডিশান" কম্পার্টমেন্টের যাত্রীর ঠাণ্ড-গরম সব রকমের অবস্থার হাত থেকে আত্মরক্ষার পুরোপুরি সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। এই পারস্পরিক পার্থক্যের ক্ষতিপুরণ কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত হুকুম থেকে হতে পারে ঃ

وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ - (البقرة : ١٨٤)

---

১৫২. শারহে মুসাল্লামুস্ সুবুত লি বাহ্‌রিল উলুম, ৫৪২ পৃ.

১৫৩. দেখুন আত্‌তাকরীর ওয়াত তাহজীর, ৪ খণ্ড, ২২৯ পৃ.

"যারা ইহার (রামাদানের রোযা রাখার) শক্তি রাখে প্রতি রোযার বদলে (فدية) তারা একজন মিসকিনকে আহার করাবে।"

এই হুকুমের সার্বিকতার ক্ষেত্রে আসল রুখআতকে অপরিবর্তিত রেখে "এয়ার কণ্ডিশান" মুসাফিরদেরকেও যদি শামিল করে নেয়া হয় এবং তাদের জিম্মায় রুখ্‌সাতের বদলে একজন মুসাফিরকে আহার করিয়ে দেয়া অপরিহার্য গণ্য করা হয়, তাহলে এর মাধ্যমে কষ্টের মধ্যে ফারাকের ক্ষতিপূরণ অনেকটা হয়ে থাকে। আবার এর ফলে অন্যদিকে পারস্পরিক সাহায্য-সহায়তাকে উৎসাহিত করার একটি ক্ষেত্রও সৃষ্টি হয়ে যাবে।

কিন্তু এই অবস্থাটিকে কোন ইল্লাতের আওতাধীনে আনা যাবে না। কারণ ফারাকের বহুতর অবস্থা ও পর্যায় রয়েছে। তাদের মধ্যে নিয়ম-শৃংখলা অপরিবর্তিত রেখে কোন অবস্থাকে গ্রহণ ও কোনটাকে বর্জন করা অত্যন্ত কঠিন কাজ।

মুফাস্‌সিরগণ يُطِيْقُوْنَهٗ -কে لا يطيقونه অর্থে নিয়েছেন। বাবে افعال এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উৎসকে বিলীন করে দেয়া। তাই مفلس (মুফলিস থেকে افلاس) তাকেই বলে যার কাছে فلوس (পয়সা) নেই। এবং مريد (মুরীদ থেকে اراد) তাকেই বলে যে নিজের ইরাদা (ইচ্ছা) নির্মূল ও খতম করে দিয়েছে। এ কারণে এখানে لا কে উহ্য বলারও কোন প্রয়োজন নেই। উহ্য না বলেও لا এর অর্থ এখানে পাওয়া যেতে পারে।

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْعَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ـ

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অসুস্থ বা সফররত সে অন্য দিনে রোযা রেখে দিনের গণনা পুরা করবে।" (আল বাকারা ঃ ১৮৪)

কিন্তু উপরের আয়াতে রোগী ও মুসাফিরের জন্য রুখসাতের কথা বলা হয়েছে। এর পরপরই "وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ" এর হুকুম এই রুখসাতের বিস্তারিত বিবরণ দেবার জন্যও বর্ণনা করা যেতে পারে। যদি রোগ ও সফরের ধরন এমন না হয়, যার ফলে রোযা রাখতে গিয়ে কষ্ট বরদাশ্‌ত করতে হয় তাহলে মূল সফরের ভিত্তিতে অবশ্য রুখসাত হবে। তবে এর ক্ষতিপূরণের জন্য প্রত্যেকটি রোযার বদলে তাকে একজন মিসকিনকে আহার করাতে হবে।

আয়াতের উল্লেখিত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে প্রাসঙ্গিক বাক্য হিসাবে যাদের রোযা রাখার একদম ক্ষমতা নেই এবং ভবিষ্যতে যারা তার কাযাও আদায় করতে পারেবে না, যেমন লোলচর্ম বৃদ্ধের জন্য প্রত্যেক রোযার বদলে একজন মিসকিনকে আহার করাতে হবে, তাদের জন্য যে নতুন হুকমটি প্রমাণ করা হয় সেটি অবশ্যি প্রমাণ করা যাবে না। কিন্তু বর্ণনার ধারাবহিকতা কায়েম হয়ে যাবে। উপরন্তু রোযা ইফতার

করার রুখসাতের ব্যাপকতার ক্ষেত্রে যে অসমতার সন্দেহ রয়েছে তা অনেকটা দূর হয়ে যাবে। (আয়াতের এ ব্যাখ্যা কোন কিতাবে দেখিনি।)

৩. ইতিবাচক হুক্‌মের 'ইল্লাত নেতিবাচক না হওয়া উচিত। তবে নেতিবাচক হুকুমের 'ইল্লাত নেতিবাচক হতে পারে। যেমন গনীমতের মালের ন্যায় "ফাই" এর মালে "খুমুস" (এক পঞ্চমাংশ) নেই। কারণ "ফাই" লাভ করার জন্য যুদ্ধ করতে হয় না। এ অবস্থায় হুকুমের অস্তিত্ব নেই (অর্থাৎ খুমুস নেই) এবং ইল্লাতও (যুদ্ধের অস্তিত্ব না থাকা) ঋণাত্মক।

অনুরূপভাবে ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, যে ব্যক্তি "গর্ভবতীকে" ছিনতাই করে নিয়ে যায় এবং ছিনতাইকারীর গৃহে তার সন্তান জন্ম নেয়, তারপর মা ও সন্তান উভয়ই মারা যায়, এ অবস্থায় ছিনতাইকারীর ওপর সন্তানের খেসারত দেওয়া ওয়াজিব হবেনা। এবং সন্তানটি ছিনতাইকৃত হিসাবে গণ্যও হবে না।

এই অবস্থায় খেসারত ওয়াজিব না হওয়া ঋণাত্মক হুকুম এবং ইল্লাত "ছিনতাইকৃত না হওয়া" ঋণাত্মক।

ইল্লাত "কাসেরা" হবে না

৪. ইল্লাতে কাসেরা বা অপারগ ইল্লাত বলা হয় এমন ইল্লাতকে যা স্থানের বিশেষত্বের কারণে মূল থেকে শাখার দিকে স্থানান্তরিত হতে পারে না। যেমন সোনা ও রূপার মধ্যে সূদের ইল্লাত হচ্ছে "মূল্যমান" হওয়া। যেহেতু এ দু'টি ছাড়া সৃষ্টিগতভবে আর কোন বস্তু "মূল্যমান" হিসেবে স্বীকৃত নয়, তাই এই ইল্লাত আর কোথাও স্থানান্তরিত হয় না।

ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে ইল্লাতে কাসেরা ইল্রাত হতে পারে এবং কোন কোন হানাফী ফকীহও এই মত পোষণ করেন। এই ইল্লাত যেক্ষেত্রে ইজতিহাদের মাধ্যমে জানা যায় সেক্ষেত্রে ইমামগণের মধ্যে এই মতবিরোধ দেখা যায়। তবে এই ইল্লাতে কাসেরা যদি নসের মাধ্যমে জানা যায় তাহলে সেক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে তার বৈধতা স্বীকৃত।

যদি ইল্লাতে কাসেরা ও ইল্লাতে "মুতাআদ্দীয়া" (স্থানান্তর হবার ক্ষমতাসম্পন্ন) একত্র হয়ে যায় তাহলে এক্ষেত্রে মুতাআদ্দীয়াকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। কারণ মুতাআদ্দীয়ার মধ্যে (শাখার দিকে স্থানান্তরিত হবার) একটি বাড়তি গুণ রয়েছে।

অনুরূপভাবে দু'টি গুণ যখন একত্র হয় এবং উভয়ের ইল্লাত হবার যোগ্যতা থাকে, একটি ইল্লাতে কাসেরা এবং অন্যটি ইল্লাতে মুতাআদ্দীয়া, তখন এ অবস্থায়ও মুতাআদ্দীয়াকে স্থায়ী ইল্লাত গণ্য করা হবে, উভয়ের সমষ্টিকে ইল্লাত গণ্য করা হবে না।

৫. ইল্লাত এমন হতে হবে যাতে কোন স্থানে ইল্লাত হুকুমের পেছনে না থাকে। অর্থাৎ ইল্লাত পাওয়া যাবে আর হুকুম পাওয়া যাবে না, এমনটি যেন না হয়, তবে যদি কোন প্রতিবন্ধক না থাকে তাহলে অন্য কথা।

হানাফীদের মতে এই প্রতিবন্ধকের ভিত্তিতেই "ইস্‌তিহ্‌সানে"র বুনিয়াদ গড়ে উঠেছে। স্বতন্ত্র উৎসের শিরোনামে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

৬. ইল্লাত না পাওয়া গেলে হুকুমও পাওয়া যাবে না। গবেষক ফকীহদের মতে এই শর্তের কোন গুরুত্ব নেই। কারণ হুকুমের একটিমাত্র ইল্লাত হয় এবং এই ইল্লাত না পাওয়া গেলে অনিবার্যভাবে হুকুম ইল্লাতবিহীন থেকে যায়, এরই ওপর এই শর্তটির ভিত্তি স্থাপিত। অথচ অধিকাংশ ফকীহের মতে, স্বতন্ত্র ইল্লাত একাধিকও হয়। এ অবস্থায় একটি ইল্লাত না পাওয়া গেলেও অন্য ইল্লতের কারণে হুকুম পাওয়া যেতে পারে।

অনুরূপভাবে গ্রহণীয় উক্তি অনুযায়ী হুকুমের একটিই স্বতন্ত্র ইল্লাত হবে। যেমন মিথ্যা অপবাদ অপবাদ দানকারীর শাস্তির ইল্লাত এবং তার সাক্ষ্য গৃহীত না হবারও ইল্লাত।

৭. ইল্লাতের মোকাবেলায় মূল হুকুমের মধ্যে এমন কোন গুণ থাকবে না যা ইল্লাত হিসেবে তার মধ্যে হস্তক্ষেপ করার যোগ্যতার অধিকারী হবে। আর কোন হস্তক্ষেপকারী থাকলে উভয়ের সমষ্টিকে ইল্লাত জানানো বৈধ হবে। কিন্তু উভয়ের স্থায়ী অস্তিত্ব থাকা অবস্থায় আবার এই শর্ত বিদ্যমান থাকবে না। বরং এদের মধ্য থেকে একটিই ইল্লাত গণ্য হবে। যেমন সূদের ইল্লাত প্রসঙ্গে আগেই বর্ণনা করা হয়েছে। হস্তক্ষেপকারী অস্থায়ী হলেও এই শর্তের সম্পর্ক হবে উদ্ভাবিত ইল্লাতের সাথে, নসে উল্লেখিত ইল্লাতের সাথে নয়।

৮. ইল্লাতের যুক্তি এমন পর্যায়ের হবে না যা শাখার অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ শাখার মধ্যে যে হুকুম বিদ্যমান তা ঐ যুক্তির সাহায্যেই প্রমাণিত হবে, সেখানে ইল্লাতের প্রয়োজন হবে না। তবে যদি যুক্তির সর্বসজীনতায় প্রবেশের ক্ষেত্রে শাখা থেকে কোন সন্দেহ দেখা দেয় তাহলে নিঃসন্দেহে ইল্লাত থেকে শাখার প্রমাণ হবে। বিশেষজ্ঞ ফকীহদের মতে এই শর্তটির কোন প্রয়োজন নেই।

৯. ইল্লাত বৃদ্ধির জন্য গ্রহণীয় হতে হবে। যেমন ফিকাহ গ্রন্থসমূহে বলা হয়েছে ঃ

مالو عرض على العقول تلقته بالقبول

জ্ঞানী ও চক্ষুষ্মানদের সামনে পেশ করা হলে তা যেন গ্রহণীয় হয়।"

ফকীহদের বর্ণনাকৃত ইল্লাতের প্রকারভেদ

ফকীহগণ প্রাথমিক পর্যায়ে তিন প্রকার ইল্লাত বর্ণনা করেছেন ঃ

১. ইসমী, ২. মা'ন্‌বী ও ৩. হুক্‌মী।

১. ইস্‌মী ইল্লাত ঃ শরীয়তের ভিত্তিতে যাকে হুকুমের জন্য গঠন করা হয়েছে অথবা মাধ্যম ছাড়াই হুকুমকে তার সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে।

২. মা'নবী হুকুম প্রমাণ করার জন্য যার কোন না কোন প্রভাব থাকে।

৩. হুক্‌মী ইল্লাত ঃ যার অস্তিত্ব থেকে হুকুম এমনভাবে প্রমাণিত হয় যে, হুকুম তার সাথে মিশে থাকে।

তিন প্রকারের পরিবর্তে একে বরং ইল্লাতের তিন পর্যায় বলা যেতে পারে। কখনো এ তিনটি ইল্লাত একত্র হয়ে যায়। কখনো দু'টি একত্র হয়। আবার কখনো মাত্র একটি পাওয়া যায়। এ তিনটি যখন একত্র হয় তখনই সত্যিকার ইল্লাত গঠিত হয়।

১. তিনটির একত্র সমাবেশের দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঃ বেচাকেনা। এটিকে গঠন করা হয়েছে মালিকানার জন্য। মালিকানার সম্বন্ধও তার সাথে হয়। অন্যদিকে হুকুমও (মালিকানা) তার সাথে মিশে থাকে।

২. ইস্‌মী ও মান্‌বীর দৃষ্টান্ত হচ্ছে, "বাই বিল খিয়ার" (যে বেচাকেনায় ক্রেতার বিক্রীত সামগ্রী ফেরত দেবার ইখতিয়ার থাকে)। এর মধ্যে হুক্‌মী ছাড়া বাকি দু'টি পর্যায়ের অস্তিত্ব পাওয়া যায়।

৩. ইস্‌মী ও হুক্‌মীর দৃষ্টান্ত হচ্ছে সফর। এটি রুখ্‌সাতের ইল্লাত। হুকুমের মধ্যে আসল প্রভাব হচ্ছে কষ্টের। এই সফর তার প্রমাণ। প্রমাণকে প্রামাণ্য বস্তুর স্থলাভিষিক্ত গণ্য করে সফর ইল্লাত নির্ধারিত হয়েছে। অথবা এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে, ঘুম। এটি অযু ভেঙে যাবার ইল্লাত। এখানে আসল ইল্লাত হচ্ছে জোড়াগুলো ঢিলে হয়ে যাওয়া। এ অবস্থায় যে জিনিস বের হয়ে গেলে অযু ভেঙে যায় তার বের হয়ে যাবার আশংকা আছে। এই ঘুম হচ্ছে তার প্রমাণ। আর প্রমাণকে প্রামাণ্য বিষয়ের স্থলাভিষিক্ত করে ইল্লাত বানানো হয়েছে।

৪. মা'ন্‌বী ও হুক্‌মীর দৃষ্টান্ত হচ্ছে সংযুক্ত ইল্লাতের শেষ অংশ। তা অনেকটা প্রভাব বিস্তারকারী এবং হুকুমও তার সাথে মিশে আছে। কিন্তু হুকুমকে তার জন্য গঠন করা হয়নি এবং তার সাথে হুকুমের সম্বন্ধও নেই। যেমন, নিকট আত্মীয় গোলামের মালিক হয়ে গেলে গোলাম আযাদ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে আযাদীর ইল্লাত হচ্ছে নিকট আত্মীয়তা ও মালিকানা উভয়ই। মালিকানা উভয়ের মধ্যে শেষ অংশ। প্রথমটিকে বাদ দিয়ে হুকুমের সম্পর্ক করে দেয়া হয়েছে মালিকানার সাথে। মালিকানা পাওয়া গেলেই আযাদ হয়ে যায়। নিকট আত্মীয়তার উল্লেখ করা হয়নি।

৫. শুধু ইস্‌মীর দৃষ্টান্ত হচ্ছে, "ইজাবে মুআল্লাক" (কোন শর্তের ভিত্তিতে কোন কথা ঝুলন্ত অবস্থায় থাকা) হুকুমের সম্বন্ধ তার সাথে হতে পারে। কিন্তু শর্তের কারণে হুকুম তার সাথে সংযুক্ত হয় না এবং প্রভাব ফেলে না; যেমন কাফ্‌ফারার জন্য কসম ভংগ করার ক্ষেত্রে কসমের অবস্থা। নিঃসন্দেহে কাফ্‌ফারাকে তার সাথে সম্পর্কিত করা হয়, কিন্তু তা তার জন্য গঠিত নয়।

৬. নিছক মা'নবীর দৃষ্টান্ত হচ্ছে, সংযুক্ত ইল্লাতের প্রথম অংশ। প্রভাব বিস্তারে নিশ্চিতভাবে তার দখল রয়েছে। যেমন ৪ নম্বরে নিকট আত্মীয়তার দৃষ্টান্তে বলা হয়েছে।

মিশ্র ইল্লাতের বিভিন্ন অংশের আলাদা আলাদা ক্রিয়া হয় কি না, এ ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কোন কোন ফকীহের মতে, সমস্ত "ইল্লাত" সমস্ত "মালুলের" মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়। পৃথক অংশের ক্রিয়া তারা জানে না। কিন্তু বিশেষজ্ঞগণের মতে এটি কোন সার্বজনীন নীতি নয়। বরং পৃথক অংশের ক্রিয়াও হতে পারে। তাই মিশ্র রোগের মিশ্র ওষুধের আলাদা আলাদা ক্রিয়া কেউ অস্বীকার করতে পারে না। মিশ্র ইল্লাতের অংশসমূহের অবস্থাও এমনিতর মনে করা উচিত।

৭. নিছক হুক্‌মির দৃষ্টান্ত হচ্ছে, শর্তের অস্তিত্ব। এমন হুকুমের জন্য, যা শর্তের সাথে ঝুলানো আছে অথবা মিশ্র কারণের শেষ অংশ। কিন্তু দৃষ্টান্তের জন্য বেশি উপযোগী হচ্ছে নিকট আত্মীয়ের ক্রয়। যে মালিকানা আযাদীকে ওয়াজিব গণ্য করে, এটি তার জন্য।

মোটকথা, এভাবে সাত প্রকার ইল্লাত দেখা যায়। তন্মধ্যে ১টি ইল্লাত তিনিটির মিশ্র চেহারা, ৩টি ইল্লাত প্রত্যেকে ২টির মিশ্র রূপ এবং ৩টি ইল্লাত একক চেহারা সমন্বিত। ফকীহগণের মতে একটি শরয়ী হুকুমও অন্য হুকুমের ইল্লাতে পরিণত হতে পারে। এই ধরনের ইল্লাতও কখনো "মিশ্র" ইল্লাত হয়। যেমন "ওজন" ও "জিন্‌স" (শ্রেণী) হয় সূদের ইল্লাত।

ইল্লাতের প্রতিবন্ধকের বর্ণনা

ফকীহগণ ইল্লাত গণ্য হবার পথে নিম্নলিখিত "প্রতিবন্ধকগুলি" বর্ণনা করেছেন। এগুলির উপস্থিতিতে ইল্লাত তার যথার্থ স্থান লাভ করতে পারবে না।

১. যা ইল্লাতকে ইল্লাতে পরিণত হতেই দেয় না। যেমন স্বাধীন মানুষের কেনাবেচার ক্ষেত্রে "স্বাধীনতা" প্রতিবন্ধক হয়।

২. যা ইল্লাতের ক্রিয়ার এবং তার পূর্ণতা লাভ করার প্রতিবন্ধক হয়। যেমন অন্য লোকের গোলাম কেনাবেচা। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া কেনাবেচা পূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

৩. যা হুকুমের সূচনাকেই বাধাগ্রস্ত করে। যেমন বিক্রেতার শর্তাধীন ইখ্‌তিয়ার (অর্থাৎ বিক্রেতা তার বিক্রীত পণ্য সঠিক মূল্যে বিক্রি হয়নি মনে করলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা ফেরত নেবার শর্ত আরোপ করে) ক্রেতার মালিকানাকে বাধাগ্রস্ত করে। যদিও তা প্রভাবশালী কিন্তু তার প্রভাব ও ক্রিয়া মুলতবী হয়।

৪. যা হুকুমকে পূর্ণতা লাভ করতে বাধা দেয়, যদিও শুরুতেই তা প্রমাণ হয়ে যায়। যেমন দেখার ইখ্‌তিয়ার[১৫৪] দেবার পর না দেখা পর্যন্ত মালিকানা পরিপূর্ণ হয় না।

৫. যা হুকুমকে অনিবার্য হতে বাধা দেয়। যেমন দোষের ইখ্‌তিয়ার[১৫৫] (অর্থাৎ পণ্যের মধ্যে দোষ বের হয়ে পড়লে তা ফেরত দেবার ইখ্‌তিয়ার)। তবে কোন কোন অবস্থায় যদি ইল্লাত পাওয়া যায় এবং হিকমত না দেখা যায় তাহলে তাতে কোন দোষ নেই। কারণ হিকমত অবশ্যি থাকে কিন্তু প্রচ্ছন্নতার কারণে তা দেখা যায় না। আসলে ইল্লাতের আকারে হিকমতকেই মজবুতভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে। তাই মূলত ইল্লাতের ওপর ভরসা করা হবে এবং হুকুমের জন্য তাকেই নির্ভরশীল গণ্য করা হবে।

কার্যকারণের বিধান ও তার প্রকারভেদ

উপরে কার্যকারণের কথা আলোচনা করা হয়েছে। তার বিস্তারিত বিধান নিম্নরূপ ঃ

১. কোন জায়গায় ইল্লাক ও কার্যকারণ একত্র হয়ে গেলে হুকুমের সম্পর্ক ইল্লাতের সাথে হবে, কার্যকারণের সাথে নয়। তবে যদি ইল্লাতের সাথে হুকুমকে সম্পর্কিত করা কঠিন হয় তাহলে তখন অবশ্যি তার সম্পর্ক কার্যকারণের সাথে হবে। যেমন কেউ শিশুর হাতে অস্ত্র দিয়েছে এবং সে সেই অস্ত্র দিয়ে নিজেকে জবাই করে ফেলেছে। এক্ষেত্রে অস্ত্রদাতা দোষী হবে না। কারণ ইল্লাত স্বয়ং অর্থাৎ শিশুর কর্ম এখানে বিদ্যমান এবং জবাই করার কাজকে তার সাথে সম্পর্কিত করা কঠিনও নয়। অনুরূপভাবে চোরকে কেউ সম্পদ দেখিয়ে দিয়েছে এবং চোর চুরি করেছে। এ অবস্থায় যে ব্যক্তি সম্পদ দেখিয়ে দিয়েছে সে দোষী হবে না। কারণ ইল্লাত স্বয়ং অর্থাৎ চৌর্যকর্ম এখানে বিদ্যমান। অথবা শিশুকে কেউ ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে দিয়েছে। শিশু ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছে। ঘোড়া ডাইনে বাঁয়ে বাঁক নেবার সময় শিশু পড়ে গিয়ে মারা গেছে। এ অবস্থায় যে ব্যক্তি ঘোড়ারপিঠে চড়িয়ে দিয়েছিল সে দোষী হবে না। তবে যদি সেই ব্যক্তি নিজেই ঘোড়া ছুটায় তাহলে সে দোষী হবে। কারণ এ অবস্থায় ঘোড়ার পিঠ থেকে ফেলে দেবার কাজটিকে তার সাথে সম্পর্কিত করা যেতে পারে।

১৫৪. কিতাবুত্ তাহ্‌কীক, ২২৬ পৃষ্ঠা, শায়হে মুসাল্লামুস সুবূত, বাহরুল উলূম, ৫৪২ পৃষ্ঠা।

১৫৫. শারহে মুসাল্লামুস সুবূত।

২. কার্যকারণ যদি কোথাও ইল্লাত অর্থে ব্যবহৃত হয়। এটা তখন হয় যখন কার্যকারণ ইল্লাতকে প্রমাণ করে। এ অবস্থায় হুকুমের সম্পর্ক হবে কার্যকারণের সাথে এবং কার্যকারণ "ইল্লাতুল ইল্লাল" অর্থাৎ "ইল্লাতের ইল্লাত" পর্যায়ে অবস্থান করবে। যেমন কোন ব্যক্তি একটি পশুর পাল হাঁকিয়ে নিয়ে গেল। পথে কিছু পশু মারা গেল। এ অবস্থায় যে ব্যক্তি হাঁকিয়ে নিয়ে গেল সে দোষী হবে। কারণ পশুদের চলার সম্পর্ক হবে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়ার সাথে। যদিও এখানে পশুদের মারা যাবার ইল্লাত পশুকর্ম নিজেই বিদ্যমান। কিন্তু এই ইল্লাত সৃষ্টিকারী কারণ হচ্ছে (হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া)

অনুরূপভাবে সাক্ষীর সাক্ষ্যদানের ফলে কারোর হক মারা যায়। তারপর সাক্ষী নিজের সাক্ষ ফিরিয়ে নেয়। এ অবস্থায় সাক্ষী দোষী হবে। যদিও হক মারা যাওয়ার ইল্লাত হচ্ছে কাযীর (বা শাসক) ফায়সালা; তবুও সাক্ষদান কর্ম হচ্ছে এই ইল্লাত প্রমাণকারী। এ অবস্থায় পশু ও কাযী একই পর্যায়ভুক্ত হবে। পশু রয়েছে যে ব্যক্তি হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তার কব্‌জায় এবং কাযী রয়েছেন সাক্ষীর কব্‌জায়। কারণ সাক্ষ-প্রমাণ পাওয়ার পর সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত দিতে তিনি বাধ্য।

৩. কার্যকারণ কোথাও ইল্লাতের স্থলাভিষিক্ত হয়। যখন আসল ইল্লাত সম্পর্কে জানা কঠিন হয় তখন ঐ কার্যকারণই হুকুমের ভিত্তি স্থিরকৃত হয় এবং সে-ই ইল্লতের কাজ করে। যেমন খেজুর ভেজানো পানি (কার্যকারণ) "হাদাস" (ইল্লাত) এর স্থলাভিষিক্ত। খেজুর ভেজানো পানি দিয়ে অযু করলে অযু হবে না। এ অবস্থায় "হাদাসের" প্রকৃত তাৎপর্যের দিকে দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন হবে না। আর এর সন্ধান পাওয়াও কঠিন।

৪. কখনো অকার্যকারণকেও পরোক্ষভাবে কার্যকারণ বলা হয়। যেমন কাফ্‌ফারার কারণ ধরা হয় "ইয়ামীন"কে (কসম খাওয়া)। অথচ এর কারণ হচ্ছে "হানাস" (কসম ভেঙে ফেলা)।

এভাবে কার্যকারণ চার ভাগে বিভক্ত ঃ

এক, প্রকৃত কার্যকারণ। এর সঙ্গা আগেই আলোচিত হয়েছে।

দুই, কার্যকারণ ইল্লাতের অর্থে ব্যবহৃত হয়। দু' নম্বরে এটা আলোচিত হয়েছে।

তিন, এমন কার্যকারণ যার জন্য ইল্লাতের সাদৃশ্য রয়েছে। তিন নম্বরে এটা আলোচিত হয়েছে।

চার, পরোক্ষকার্যকারণ। চার নম্বরে আলোচিত হয়েছে।

শর্তের বিধান ও প্রকারভেদ

শর্তের আলোচনাও ইতিপূর্বে করা হয়েছে। শর্ত পাঁচ প্রকারের ঃ

১. নিছক শর্ত। এর সঙ্গা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

২. ইল্লাত অর্থে ব্যবহৃত শর্ত। যদি এমন ইল্লাত বিদ্যমান না থাকে যার সাথে হুকুমকে সম্পর্কিত করা যেতে পারে, তাহলে এ অবস্থায় যে শর্ত ইল্লাত অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন কূপে মানুষের পড়ে যাওয়া। এই পড়ে যাওয়ার শর্ত হচ্ছে পথে কূপ খনন করা। পড়ে যাওয়ার ইল্লাত হচ্ছে "ভার।" পথ চলা হচ্ছে এর কারণ। যেহেতু ভূমির বাধা দেবার ক্ষমতা ছিল তাই সে "ভার"কে ঠেকিয়ে রেখেছিল। কূপ খনন করার কারণে সে ক্ষমতা সরে গেছে। ভার (ইল্লাত) একটি প্রাকৃতিক বিষয় এবং চলা (কারণ) হচ্ছে একটি মুবাহ কর্ম। এদের উভয়ের সাথে হুকুম (প্রাণনাশ) সম্পর্কিত হতে পারে না। কাজেই অনিবার্যভাবে শর্ত ইল্লাতের স্থলাভিষিক্ত হবে এবং কূপ খননকারীর ওপর জামানত দেয়া ওয়াজিব হবে। কূপের মধ্যে অর্থ-সম্পদ পড়ে যাওয়ারও এই একই বিধান। ফিকাহর কিতাবে এ সম্পর্কিত খুটিনাটি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যাবে।

আর যদি এমন ইল্লাত বিদ্যমান থাকে যা ইল্লাত হবার যোগ্যতা রাখে তাহলে আর শর্তকে ইল্লাতে পরিণত করা হবে না। যেমন, যে ব্যক্তি কূপের মধ্যে পড়ে গেছে তার ওয়ারিশগণ ও কুপকণনকারীর মধ্যে এ বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে যে, সে স্বাভাবিকভাবে কূপের মধ্যে পড়ে গেছে, না স্বেচ্ছায় নিজেকে সেখানে ফেলে দিয়েছে। এ অবস্থায় (উপস্থিত) খননকারীর বক্তব্যই গ্রাহ্য হবে। কেননা পতিত ব্যক্তির কাজের মধ্যে ইল্লাতের যোগ্যতা বিদ্যমান পাওয়া গেছে। কাজেই শর্তকে ইল্লাত গণ্য করার কোন কারণ সেখানে থাকছে না।

৩. এমন শর্ত যার জন্য রয়েছে কার্যকারণের ধিান। যেমন ঃ

কোন ব্যক্তি আস্তাবলের ফটক খুলে দিয়েছে অথবা পিঁজরার দরজা খুলে দিয়েছে। এর ফলে ঘোড়া পালিয়ে গেছে বা পাখি উড়ে গেছে। এই দৃষ্টান্তে খুলে দেওয়া হচ্ছে "শর্ত"। কারণ তা প্রতিবন্ধক দূর করে, যেমন কূপ খনন করায় পতিত হবার বাধা দূর করেছিল। কিন্তু এখানে শর্ত হচ্ছে কার্যকারণের স্থলাভিষিক্ত এবং মাঝখানে ঘোড়া ও পাখির কাজ বিদ্যমান রয়েছে। এ কারণে ক্ষতির সম্বন্ধ খুলে দেওয়ার সাথে হবে না। এ অবস্থায় খেসারত দিতে হবে না। বিপরীতপক্ষে কূপ খনন করার ক্ষেত্রে শর্ত ইল্লাত হিসাবে গণ্য হয়েছিল এবং সেখানে যোগ্যতার ইল্লাত বিদ্যমান ছিল না।

৪. ইস্‌মী শর্ত। এটি এমন অবস্থায় হবে যখন কোন হুকুমের দু'টি শর্ত থাকবে এবং তার মধ্যে প্রথমটি বর্তমান থাকবে। হুকুম তার মুখাপেক্ষী, তাই তাকে শর্ত বলা হবে। আবার যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় শর্ত না পাওয়া যাবে ততক্ষণ হুকুম পাওয়া যাবে না, তাই তাকে ইস্‌মী বলা হবে। এ অবস্থায় এ শর্তটি হবে নামমাত্র, হুকুম হিসেবে নয়।

৫. শর্ত হবে আলামতের অর্থে। মেন যিনার অধ্যায়ে "ইহ্‌সান" (সতীত্ব) আলামত অর্থে ব্যবহৃত হয়।[১৫৬] ইহ্‌সান মূলত একটি গুণ। যিনার শাস্তির ক্ষেত্রে শরয়ী দৃষ্টিতে এর দিকে নজর রাখা হয় এবং এর কারণে শাস্তির মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। যেমন এক ব্যক্তি স্বাধীন, বুদ্ধিমান, প্রাপ্তবয়স্ক, মুসলমান, বিবাহিত এবং নিজের স্ত্রীর কাছে গমন করেছে। এ অবস্থায় তাকে "মুহ্‌সিন" বলা হবে।

কোন কোন ফকীহের মতে ইহ্‌সান শুধুমাত্র এক্ষেত্রে শর্তের অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। সম্ভবত ফকীহগণ আলামতকে আরো বিভক্ত করেননি। তাই প্রচলিত কিতাবগুলিতে এর উল্লেখ নেই।

কিয়াসের শর্তের বর্ণনা

ইল্লাত, কার্যকারণ ইত্যাদির ব্যাখ্যা করার পর এবার আমরা আসল কিয়াসের শর্তগুলি বর্ণনা করবো। এগুলির সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে ১. হুকুমি, ২. মূল ও ৩. শাখার সাথে।

হুকুম সম্পর্কিত শর্তসমূহ

হুকুম সম্পর্কিত কতিপয় শর্ত নিম্নরূপ ঃ

১. হুকমের ইল্লাত বুদ্ধির সাহায্যে অনুধাবন করা যেতে পারে। আর যদি এমন না হয় বরং হুকুম বুদ্ধির অগম্য হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কিয়াস করা যাবে না। যেমন নামাযের রাকাতসমূহের সংখ্যা, যাকাতের পরিমাণসমূহ ইত্যাদি। এগুলোর ওপর কিয়াস করা যায় না।

যাকাতের পরিমাণ এবং পরিমাণের আনুপাতিক হার–এ দুয়ের পার্থক্যকে উপেক্ষা না করা উচিত। পরিমাণের ক্ষেত্রে অবশ্যি কিয়াসের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু প্রত্যেক যুগে পরিমাণে আনুপাতিক হার সৃষ্টি করার প্রয়োজন থাকে। তবে শর্ত হচ্ছে, এই আনুপাতিক হারের প্রতি দৃষ্টি রেখেই শরীয়ত প্রণেতা "পরিমাণসমূহ" নির্ধারণ করেছেন।

২. হুকুমের ব্যতিক্রমী আকৃতি হতে পারবে না। যেমন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) রোযা রাখা অবস্থায় ভুলে পানাহারকারীকে বলেছেন ঃ

اتم صومك فان الله اطعمك وسقاك ولاقضاء عليك ـ

"নিজের রোযা পুরো করো। এর কাযা নেই। ব্যস, আল্লাহ্‌ তোমাকে পানাহার করিয়েছেন।"[১৫৭]

---

১৫৬. কিতাবুত্‌ তাহকীক

১৫৭. দারে কুত্‌নী ইত্যাদি

কিয়াস তো এটাই দাবি করে, খাদ্য ও পানীয় জাতীয় যে কোন জিনিস শরীরের ভিতরে প্রবেশ করলে রোযা ভেঙে যাওয়া উচিত। কিন্তু উল্লেখিত হাদীসের কারণে উল্লেখিত অবস্থাটি কিয়াস ভিত্তিক হুকুমের ব্যতিক্রম গণ্য হয়েছে।

৩. হুকুম কোন বিশেষ ঘটনার সাথে বিশেষভাবে জড়িত হবে না। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত খুযাইমা ইব্‌ন সাবেত (রা) সম্পর্কে একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলেন ঃ - من شهد له خزيمة فهو حسبه

"যার জন্য খুযাইমা একাকী সাক্ষ্য দিয়েছে তা তার জন্য যথেষ্ট।"

এই ধরনের অবস্থায় বিশেষ প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে "হুকুম" নির্ধারিত হয়। আর এই প্রতিক্রিয়া নিজেকে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের হকদার প্রমাণিত করে। কিন্তু এ থেকে কোন ব্যাপক আইনগত নীতি বা ধারা প্রমাণ হয় না।

৪. হুকুম "মান্‌সুখ" হতে পারবে না। পরিবশে ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে একটি হুকুম দেয়া হয়েছে। সেই প্রেক্ষিত খতম হয়ে গেলে তার জায়গায় সেখানে দ্বিতীয় একটি হুকুম এসে গেছে। এখন অন্য পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে পূর্বতন হুকুমের ওপর কিয়াস করা সঠিক হবে না।

৫. হুকুম শরিয়ী হতে হবে। অশরিয়ী হুকুমে পারিভাষিক কিয়াস সঠিক হবে না।

মূলের সাথে সম্পর্কিত শর্তসমূহ

মূলের সাথে সম্পর্কিত শর্তসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১. মূলের হুকুমের দলীল এমন হবে না যার ফলে তা শাখার হুকুমকেও শামিল না করে নেয়। অন্যথায় হুকুম দলীলের সাহায্যে প্রমাণিত হবে এবং কিয়াসের প্রয়োজনই থাকবে না।

২. মূলের হুকুম অন্য কোন মূলের শাখা হবে না। বরং সেই হুকুম স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে। যেমন, নিয়ত ওয়াজিব হবার ব্যাপারে অযূকে তায়াম্মুমের ওপর এবং তায়াম্মুমকে নামাযের ওপর কিয়াস করলে এই কিয়াস সঠিক হবে না। কেননা এখানে হুকুম স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় বরং মূলের শাখা।

কিন্তু হুকুমের পরিবর্তে স্বয়ং মূলই যদি অন্য কোন মূলের শাখা হয় এবং ঐ উভয় মূলের মধ্যে একই ইল্লাত পাওয়া যায় তাহলে এ অবস্থায় কিয়াস সঠিক হবে। যেমন সিরকাকে যয়তুনের তেলের ওপর কিয়াস করা। এক্ষেত্রে ইল্লাত হয় "ওজন" এবং তা উভয়ের মধ্যে পাওয়া যায়। আবার যয়তুনের তেলকে লবণের ওপর কিয়াস করা হয় একই ইল্লাতের ভিত্তিতে। ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল প্রথম অবস্থাতেই কিয়াসকে সঠিক গণ্য করেন।

শাখা সম্পর্কিত শর্তসমূহ

শাখা সম্পর্কিত কতিপয় শর্ত নিম্নরূপ ঃ

১. শাখার ইল্লাত মূলের ইল্লাতের সমান হবে। অর্থাৎ উভয়ের একই ইল্লাত হবে। যদিও ডিগ্রী এবং শক্তিমত্তা ও দুর্বলতার ক্ষেত্রে পার্থক্য হবে। যেমন খেজুর

ভেজানো গাঁজানো পানি ও মদ উভয়ের হারাম হবার ব্যাপারে ইল্লাত (নেশা) একই। যদিও উখয়ের ধরন এবং এই প্রেক্ষিতে ইল্লাতের শক্তিমত্তা ও শক্তিহীনতায় পার্থক্য রয়েছে।

অনুরূপভাবে উভয়ের হুকুমের ক্ষেত্রে সাম্য থাকা জরুরী। যেমন নাবালেগ শিশুর বিবাহের অভিভাকত্বকে সম্পত্তির অভিবাবকত্বের ওপর কিয়াস করা হয়। এক্ষেত্রে হুকুমে সাম্য প্রতিষ্ঠিত আছে।

২. শাখায় গিয়ে মূলের হুকুম বদলে যেতে পারবে না। ইমাম শাফেয়ী (র) যিম্মীর "যিহার" (স্ত্রীকে মা ইত্যাদির সাথে তুলনা করা। যেমন বলা, তোমার পিঠ আমার মায়ের পিঠের মত ইত্যাদি)কে মুসলিমের যিহারের ওপর কিয়াস করেন। কিন্তু যিম্মীর কাফ্‌ফারা দেবার যোগ্যতা না থাকার কারণে হুকুমের ক্ষেত্রে পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে ওঠে, এই শর্তের কারণে ইমাম আবূ হানীফা (র) এই কিয়াসকে সঠিক গণ্য করেন না।

৩. শাখার হুকুম মূলের হুকুমের অগ্রবর্তী হবে না। অর্থাৎ হুকুম নাযিলের দিক দিয়ে বিচার করলে শাখার হুকুম আগে এবং মূলের হুকুম পরে নাযিল হয়েছে, এমনটি হবে না। যেমন নিয়াত ওয়াজিব হবার ব্যাপারে অযূকে তায়াম্মুমের ওপর কিয়াস করা। অথচ অযূর হুকুম হিজরতের পূর্বে এবং তায়াম্মুমের হুকুম হিজরতের পরে নাযিল হয়।[১৫৮]

কিয়াসের ক্ষেত্র ও হুকুম

ফকীহগণের মতে, কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার মাধ্যমে যে ক্ষেত্রে হুকুম পাওয়া যাবে না একমাত্র সে ক্ষেত্রেই কিয়াস চলবে।

"খবরে ওয়াহিদ"কে কিয়াসের ওপর অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকে। তবে ইমাম মালেক (র)-এর যে মতটি অধিকতর প্রকাশ লাভ করেছে, তাতে দেখা যায় যে, তিনি খবরে ওয়াহিদের মোকাবেলায় কিয়াসকে অগ্রাধিকার দানের পক্ষপাতি ছিলেন।

অনুরূপভাবে যে কিয়াস কোন নাস (نَص-কুরআন ও হাদীসে ব্যক্ত স্পষ্ট দলীল)-এর প্রতিকূলে, তাকে রদ করা হবে। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক ঘটনায় নামাযের মধ্যে অট্টহাস্য করায় অযূ ভেঙে যাওয়ার বিধান দিয়েছিলেন, অথচ কিয়াস অযূ নষ্ট হওয়ার পক্ষে রায় দেয় না। এইরূপ ক্ষেত্রে নসের ওপর 'আমল করা হবে এবং কিয়াস পরিত্যক্ত হবে।

কিয়াসের হুকুম হচ্ছে, এর মাধ্যমে "যন্নে গালেব" তথা বিশ্বাস বা প্রত্যয়ের কাছাকাছি প্রত্যয় লাভ করা যায়। ভুলের সম্ভাবনা এতে অবশ্যি থাকে। কিয়াসের চাইতে বড় দলীল (কুরআন, সুন্নাহ ও ইজ্‌মা) যে ক্ষেত্রে থাকে না, সেক্ষেত্রে এর ওপর আমল করা অপরিহার্য গণ্য করা হয়

---

১৫৮. শারহে মুসাল্লামুস সুবূত।

ইসলামী ফিক্‌হের পঞ্চম উৎস ঃ ইস্‌তিহ্‌সান

ইস্‌তিহ্‌সান-এর সংজ্ঞা

ইস্‌তিহ্‌সান-এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে ঃ عد الشئ حسنا "কোন জিনিস্‌কে ভালো মনে করা।"[১৫৯]

ফকীহ্‌গণের পরিভাষায় কোন বিষয়ের দুটো দিকের মধ্য থেকে কোন একটি দিককে দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার দেওয়ার নাম ইস্‌তিহ্‌সান। নিচে এই পারিভাষিক শব্দ ইস্‌তিহ্‌সানের কতিপয় সংজ্ঞা উদ্ধৃত করা হচ্ছে ঃ

قطع المسئلة عن نظائرها بما هو اقوى -

"ইস্‌তিহসান হচ্ছে– কোন বিষয়ের হুকুমকে তার নজীরসমূহ থেকে অধিকতর শক্তিশালী যুক্তির কারণে আলাদা করে নেওয়া।"[১৬০]

العدول عن قياس الى قياس اقوى -

"ইস্‌তিহ্‌সান হচ্ছে– এক কিয়াস পরিত্যাগ করে তার চেয়ে বেশি যুক্তিযুক্ত কিয়াস অবলম্বন করা।"[১৬১]

العدول فى مسئلة من مثل ماحكم به فى نظائرها الى خلافه بوجه هو اقوى -

"কোন প্রশ্নের নজীরসমূহের ব্যাপারে যে হুকুম দেয়া হয়েছে, অধিকতর যৌক্তিক কারণে তাকে বাদ দিয়ে বিপরীত হুকুম দেয়া।"[১৬২]

ইস্‌তিহ্‌সানের গুরুত্ব ও প্রয়োজন

মানবের প্রয়োজন ও মানব কল্যাণের ক্ষেত্র এত বেশি বিস্তৃত যে, নীতি-নিয়ম ও আইন-কানুনের গণ্ডির মধ্যে তাকে সাকল্যে আবদ্ধ করা বড়ই কঠিন। প্রয়োজন ও কল্যাণ-অকল্যাণের ভিত্ গড়ে উঠে পয়লা। তারপর তাকে সংগঠিত রূপ দেবার জন্য

---

১৫৯. কিতাবুত্ তাহ্‌কীক।

১৬০. ঐ।

১৬১. মিন্‌হাজুল উসূল।

১৬২. ঐ।

রীতি-নীতি ও নিয়ম-কানুন বেঁধে দেয়া হয় স্থান-কালের প্রেক্ষিতে। যেমন মানব সমাজে পরিবর্তন ঘটে, পরিবেশে ও পরিস্থিতির বৈচিত্র্যে নিত্য নতুন প্রয়োজন দেখা দেয়। তখন বাঁধা নিয়ম-কানুন অপর্যাপ্ত প্রমাণিত হয়, এমন কি বিস্তীর্ণ পরিধিও সংকীর্ণ কখনও বা অকল্যাণকর প্রমাণিত হয়। এহেন অবস্থায় ফকীহগণ প্রয়োজনকে মানদণ্ড হিসেবে ধরে হুকুম উদ্ভাবন করে থাকেন, এলাহী কানূনের লক্ষ্য অর্থাৎ অকল্যাণ পরিহার করে কল্যাণকরকে অবলম্বন করেন, এমনটি করতে তারা বাধ্য হন। এতেই ইস্‌তিহ্‌সান-এর উদ্ভব ঘটে। এবং ইস্‌তিহ্‌সান শারঈ আহকামের অন্যতম উৎস রূপে পরিগণিত হয়। নিম্নে উদ্ধৃত ফকীহদের কয়েকটি কথা থেকে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয় ঃ

الاستحسان ترك القياس والاخذ بما هو اوفق للناس ـ

"ইস্‌তিহ্‌সান হচ্ছে কিয়াসকে বাদ দিয়ে মানুষের প্রয়োজনের সাথে অধিকতর সংগতিপূর্ণ হকুমকে গ্রহণ করা।"[১৬৩]

الاستحسان طلب السهولة فى الاحكام فيما يبتلى فيه الخاص والعام ـ

বিশিষ্ট এবং সাধারণ নির্বিশেষে সব মানব যে সমস্ত ব্যাপারে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, তাতে বিধান দানের ক্ষেত্রে "সহজসাধ্যতা" (سهولة) অনুসন্ধানের নাম হল ইস্‌তিহ্‌সান।[১৬৪]

الاخذ بالسما وابتغاء ما فيه الراحة ـ

"ব্যাপকতা অবলম্বন করা এবং যাতে স্বস্তি আছে তার তালাশের নাম ইস্‌তিহ্‌সান।"[১৬৫]

الاخذ بالسعة وابتغاء الدعة ـ

"প্রশস্ততা (উদারতা) অবলম্বন করা এবং প্রসারতা তালাশ করাকে ইস্‌তিহ্‌সান বলা হয়।"[১৬৬]

এই সংজ্ঞাগুলির নির্যাস হচ্ছে বিধান দানের বেলায় কঠিনকে পরিত্যাগ করে সহজকে অবলম্বন করা; কারণ আল্লাহ্‌র হিকমতও এরি মধ্যে নিহিত। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَايُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ـ (البقرة : ١٨٥)

"আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য যা সহজ তাই চান এবং যা কঠিন ও ক্লেশকর তা তোমাদের জন্য চাননা।"

---

১৬৩. আল মাবসূত, ১ম খণ্ড, ১৪৫ পৃষ্ঠা।

১৬৪. ঐ। ১৬৫. ঐ। ১৬৬. ঐ।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ خير دينكم اليسر "তোমাদের দীনের কল্যাণকর দিক হচ্ছে এর সহজসাধ্যতা।"

হযরত আলী (রা) ও মুআবিয়া (রা)-কে ইয়ামানে পাঠাবার সময় রাসূল (সা) তাঁদেরকে আদেশ করেন ঃ يَسِّرَا وَلاتُعسِّرَا قَرِّبَا وَلاتنفِّرَا "(লোকদের জন্য তোমরা বিচার ব্যবস্থাকে সহজসাধ্য করো, কঠিন (দুসাধ্য করোনা) তাদেরকে কাছে টেনো (ইসলামী ব্যবস্থার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করো), তাদের মধ্যে বিরূপ ভাব জাগিয়ো না।" এই কঠিন ও সহজের অর্থ আগেই বর্ণনা করেছি। "উসূল ও কুল্লীয়াত" শিরোনামে আরো কিছু আলোচনা করা হবে।

প্রাচীন আইনে ইস্‌তিহ্‌সান সদৃশ একটি নীতি

যেসব প্রয়োজন ও অবস্থার প্রেক্ষিতে ফকীহগণ ইস্‌তিহ্‌সানের নীতি প্রণয়ন করেছেন প্রাচীন আইনে প্রায় সেই একই ধরনের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে অবলম্বিত একটি নীতির সন্ধান পাওয়া যায়। গ্রীকদের মধ্যে "এপাইকিয়া" (Epieikeia) নামে নীতিটি প্রসিদ্ধ। আর রোমানদের মধ্যে তা "একুইটা" (Aequite) নামে পরিচিত। ইংরেজী প্রতিশব্দ equity।

এরিষ্টটল বলেন, দেশজ কোন সাধারণ আইনে যখনই কোন ত্রুটি দেখা যায়, কল্যাণকর মূলনীতির মাধ্যমে তার সংশোধন করা হয়। Cicero (রোমান Orator)-এর রচনাবলীতে বিভিন্ন স্থানে 'নিস্‌ফত' (Justice) ও আইনের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে এবং নিস্‌ফতকে আইনের মধ্যে ভারসাম্য কায়েমকারী গণ্য করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য, আইন গ্রন্থগুলিতে নিস্‌ফতের কয়েকটি অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। এর একটি অর্থ ইস্‌তিহ্‌সানের অর্থের সাথে মিলে। আইন গ্রন্থগুলিতে এই নীতিটি রচনার বিভিন্ন কারণও বর্ণনা করা হয়েছে। সেগুলির সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

এ নীতির সূচনা হয় রোমে। বিদেশীদের অধিকার ও দায়িত্ব সংরক্ষণ এবং আন্তর্জাতিক বিষয়াবলীর মীমাংসা, উপরন্তু ব্যবসায়িক উন্নতিকল্পে এই নীতির উদ্ভব ঘটে। সে যুগে এক জাতির পক্ষে অন্য জাতির আইন ও রসম-রেওয়াজ মেনে নেওয়াটা ছিল অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। এজন্য রোমের আইনশাস্ত্রবিদগণ এমন কিছু মূলনীতি নির্ধারণ করেন যেগুলির আওতায় তাঁরা স্থান ও কালের প্রেক্ষাপটে পারস্পরিক বিষয়সমূহের মীমাংসা করতেন এই নীতির অনুকূলে। আদালতগুলো দেশীয় আইনের সীমালংঘন করার প্রয়োজন অনুভব করে এবং স্বাভাবিক ইনসাফ (Natural justice) অনুযায়ী ফায়সালা করতে বাধ্য হয়। এবং এই স্বাভাবিক ইনসাফ হচ্ছে সৎবুদ্ধি এবং ঈমানদারীর দাবী অনুযায়ী ফায়সালা করা; যদিও তা

দেশীয় আইনের কিছুটা বরখেলাফ হয়। এর ঐতিহাসিক পটভূমি সংক্ষেপে এই যে, প্রাচীন ধর্মীয় সর্বোচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিরা ধর্মীয় আইন থেকেই অধিকাংশ মূলনীতি সংগ্রহ করতেন। পরবর্তীকালের প্রধান বিচারালয়ের বিচারপতিরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোমীয় আইনের সাহায্য নিতেন। আর এই আইনের বিধি-বিধানগুলো জাগতিক বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ধর্মীয় আইনের তুলনায় বেশি কার্যকর হতো।[১৬৭]

কিন্তু এই প্রাচীন রোমান আইনও, বিশেষত বিদেশীদের মামলার নিষ্পত্তির ব্যাপারে অসমাপ্ত প্রমাণিত হল এবং ইস্‌তিহ্‌সান সৃদশ কতিপয় নীতির প্রবর্তন করে সে ঘাটতি পূরণ করা হয়েছিল।

কুরআনে ইস্‌তিহ্‌সান

কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতগুলিতে ইস্‌তিহ্‌সানের সমর্থন পাওয়া যায়।

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهُ ـ (الزمر : ١٧-١٨)

"আমার বান্দাদের সুসংবাদ দিয়ে দাও, যারা (আমার) বাণী শোনে, অতঃপর "আহ্‌সান" (উৎকৃষ্ট) গুলির অনুসরণ করে।"

وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا ـ (الاعراف : ١٤٥)

মূসা (আ)-কে কিতাব প্রদানের পর আল্লাহ্‌ (কুরআনে বর্ণিত) এই আদেশ দিচ্ছেন ঃ "নিজের জাতিকে "আহ্‌সান" (উৎকৃষ্ট) আহ্‌কামগুলো গ্রহণের হুকুম দিয়ে দাও।"

ইস্‌তিহ্‌সানের প্রয়োজন প্রসংগে নিম্নোক্ত আয়াতগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঃ

مَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ـ (الحج : ٧٨)

"আল্লাহ্‌র দীনের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কোন প্রকার সংকীর্ণতা সৃষ্টি করেননি।

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَايُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ـ (البقرة : ١٨٥)

"আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য যা সহজ তাই চান এবং তোমাদের জন্য যা কঠিন ও ক্লেশকর তা চান না।"

لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا ـ (البقرة : ٢٨٦)

"আল্লাহ্‌ কাউকে তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব চাপাতে চাননা।"

---

১৬৭. দেখুন প্রাচীন আইন, ৩৫ পৃষ্ঠা, আইনের মূলনীতি ১ম খণ্ড, ২৬২ পৃষ্ঠা।

হাদীসে ইস্‌তিহ্‌সান

ইস্‌তিহ্‌সান নীতির পক্ষে নিম্নোক্ত হাদীসগুলোতে ইংগিত পাওয়া যায় ঃ

ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن -

"মুসলিমগণ যা ভালো (কল্যাণকর) মনে করে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতেও তা ভালো।"

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর বর্ণিত মওকূফ[১৬৮] হাদীসে ইস্‌তিহ্‌সানের দৃষ্টিভংগী সুপ্রকাশিত হয়েছে ঃ (الحديث) - خير دينكم اليسر

"তোমাদের দীনের কল্যাণকর দিক হচ্ছে এর সহজসাধ্যতা।"

দীনকে সহজ করা সম্পর্কে আলী (রা) ও মু'আবিয়া (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে হিদায়াত দেন তা উপরে আলোচিত হয়েছে। অনুরূপভাবে এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যতগুলো উক্তি আছে তা সবই ইস্‌তিহ্‌সানের অনুকূল।

সাহাবীগণের কার্যধারায় ইস্‌তিহ্‌সানের প্রমাণ

মীরাস (ميراث = উত্তরাধিকার)-এর একটি প্রশ্নের মীমাংসায় সাহাবীগণের কার্যধারায় ইস্‌তিহ্‌সান প্রয়োগের প্রমাণ মিলে। এক মহিলার মৃত্যু হয়। তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ছিল স্বামী, মা, দুই সহোদর ভাই ও দুই বৈপিত্র ভাই। উত্তরাধিকার আইনে সহোদর ভাই 'আসবাত' (عصبات)-এর অন্তর্ভুক্ত এবং বৈপিত্র ভাই "আসহাবুল ফুরূজ" (اصحاب الفروض)-এর মধ্যে শামিল হয়। "আসহাবুল ফুরূজ" হচ্ছে তারা যাদের অংশ কুরআন মজীদে নির্ধারিত হয়েছে। যথা $\frac{১}{৬}$, $\frac{১}{৩}$, $\frac{১}{৪}$, $\frac{১}{২}$ ইত্যাদি। অন্যদিকে "আসবাত"-এর অংশ নির্ধারিত নয়; বরং "আসহাবে ফুরূযদের অংশ দেবার পর যা অবশিষ্ট থাকে তারা তারই হকদার হয়।

উল্লেখিত ক্ষেত্রে স্বামী অর্ধেক, মা এক ষষ্ঠাংশ এবং বৈপিত্র ভাইয়েরা পাবে এক-তৃতীয়াংশ। এতে পরিত্যক্ত সম্পত্তির সবটাই চলে যায়, সহোদর ভাইদের জন্য আর কিছুই থাকে না। অথচ মৃতের সহিত তাদের সম্পর্ক মা ও বাপ উভয় দিক দিয়ে, সুতরাং নিকটতর। উমর (রা)-এর সামনে এ ঘটনা পেশ করা হলে তিনি সহোদর ভাইদের ক্ষতির পথ বোধ করার জন্য ইস্‌তিহ্‌সানের পথ ধরেন। তিনি সহোদর এবং বৈপিত্র ভাইদেরকে উত্তরাধিকার প্রদান করেন। আস্‌হাবুল ফুরূয-কে "আসাবার" সাথে সংযুক্ত করা কুরআনী বিধানের বিপরীত, তবুও ইস্‌তিহ্‌সানের আশ্রয় নিয়ে একটি সুস্পষ্ট ক্ষতি নিবারণ করা হল। তবে, উত্তরাধিকারদের এহেন সমাবেশ কদাচিৎ হয়।

---

১৬৮. যে হাদীসের বর্ণনা সাহাবী পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে, রাসূলের সাথে সংযুক্ত হয়নি এক অর্থে একে আসর (اثر) ও বলা হয়।– অনুবাদক

অনুরূপ উত্তরাধিকার প্রশ্নে নাতির বিষয়টিও। দাদার জীবদ্দশায় যদি বাপ মারা যায়, এ অবস্থায় নাতি দাদার সম্পত্তির মীরাস লাভ করবে না, যদি দাদার কোন ছেলে জীবিত থাকে। আক্ষরিকভাবে উত্তরাধিকার আইনের এই হচ্ছে বিধান, দাদা যদি নাতীর জন্য কোন ব্যবস্থা করে যান অথবা নাতির বাপ যদি নিজস্ব সম্পত্তি ছেড়ে যান তবে রক্ষা, নতুবা অনেক ক্ষেত্রে নাতির জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। যদি চাচারা তাদের ভাই পো ভাইজিকে জীবিকার ব্যবস্থা সাধ্যমতন না করে তাহলে ইস্‌তিসহ্‌সানের আওতায় বিচারক তাদের উত্তরাধিকারের ব্যবস্থা করা ইসলামী আইনের স্পিরিট এর সাথে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

ইস্‌তিহ্‌সানের চারটি ভিত্তি

ফকীহগণ ইস্‌তিসানকে "কিয়াসে খাফী"র (قياس خفى) মধ্যেও গণ্য করেছেন। অন্য কথায় কিয়াসে খাফীর অপর নাম ইস্‌তিহ্‌সান। কিয়াসে খাফী (প্রচ্ছন্ন কিয়াস)-এর বিপরীত হচ্ছে কিয়াসে জালী (قياس جلى) বা প্রকাশ্য কিয়াস। কিয়াসে জালী তাড়াতাড়ি মানসপটে জাগে, চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন পড়ে না। অন্যদিকে কিয়াসে খাফী গভীর মনোনিবেশের পর হৃদয়াংগম হয়।

কিয়াসের বিপরীত ইস্‌তিহ্‌সানের ভিত্তিতে বিধান দানের কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে দেয়া হলো ঃ

কুরআন ও সুন্নাহর নাস (نص = স্পষ্ট হুকুম)-এর বিপরীতে বা ضرورة (প্রয়োজন)-এর প্রেক্ষিতে ইস্‌তিহ্‌সানের প্রয়োগ এবং কিয়াসের বিপরীতে নাস-এর ভিত্তিতে ইস্‌তিহ্‌সানের প্রয়োগ ঃ بيع سلم (পণ্যের অনুপস্থিতিতে, পরে ক্রেতাকে তা দেয়ার প্রতিশ্রুতিতে বেচা-কেনা) সাধারণ কিয়াসের নিরিখে অবৈধ হওয়া উচিত, কারণ পণ্য সামগ্রীর উপস্থিতি এবং মূল্যের বিনিময়ে তা ক্রেতার হাতে অর্পণ বায় (بيع) শুদ্ধ হবার জন্য আবশ্যক। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিম্নোক্ত ফরমানের ভিত্তিতে কিয়াস পরিত্যাগ করে ইস্‌তিহ্‌সানের ওপর আমল করা হয় ঃ

من اسلم منكم فليسلم فى كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم -

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি 'বায়-ই-সালাম' করতে চায় তার কর্তব্য ওজন, পরিমাপ ও মেয়াদ নির্দিষ্ট করে নেয়া।"

২. কিয়াসের বিপরীত ইজমা'র ভিত্তিতে ইসতিহ্‌সানের প্রয়োগ ঃ

যেমন, মূল্য স্থিরীকৃত হবার পর জুতা তৈরীর অর্ডার দেয়া হলো। জুতার মাপও দেয়া হলো। সাধারণ কিয়াসের নিরিখে এ কারণটি অবৈধ হওয়া উচিত। কারণ জুতা

শুধু অনুপস্থিত তা নয়, বরং তার অস্তিত্বও নেই,পরে তৈরী হবে। কিন্তু লোকেরা এত ব্যাপকভাবে একাজটি করে আসছে যাতে মনে হয় যেন এ বিষয়টির ওপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এ কাজটি জায়েয। তাই এখানে কিয়াস পরিহার করে ইস্‌তিহ্‌সানের ভিত্তিতে কাজটির বৈধতার হুকুম দেখা হল।

৩. কিয়াসের বিপরীতে, কিয়াসে খাফীর ভিত্তিতে ইসতিহ্‌সানের প্রয়োগ ঃ

যে সব প্রাণীর গোশ্‌ত হারাম তাদের উচ্ছিষ্টও হারাম। কারণ উচ্ছিষ্টে লালার মিশ্রণ ঘটে। এই নীতির ভিত্তিতে যেসব পক্ষী নখরের সাহায্যে শিকার ধরে এবং যাদের গোশ্‌ত হারাম তাদের উচ্ছিষ্টও হারাম হওয়া উচিত। কিন্তু কিয়াসে খাফী হচ্ছে, পাখিরা ঠোঁট দিয়ে খায় ও পান করে এবং ঠোঁটে হাড় ছাড়া আর কিছুই নেই এবং হাড় নাপাক নয়। তাই ঠোঁট সংস্রবে কোন পাক খাদ্য বা পানীয় নাপাক হয় না আর অন্যদিকে হিংস্র প্রাণীরা জিহ্বার সাহায্যে পানাহার করে। আর জিহ্বায় লালা লেগে থাকে। এই লালা হারাম গোশ্‌ত নিঃসৃত। এই নাপাক লালা পাক জিনিসের সাথে মিশলে অবশ্য তাকে নাপাক করে দেবে। এ কারণে পাখিদের জুটা হিংস্র জন্তুদের জুটার সদৃশ বিবেচনা করা যাবে না। তাই এখানে সাধারণ কিয়াস বাদ দিয়ে ইস্‌তিহ্‌সান (কিয়াসে খাফী)-এর ভিত্তিতে বিধান দান করা হয়েছে।

চার প্রকার ইস্‌তিহ্‌সান

ইতিপূর্বেকার বিস্তারিত আলোচনা থেকে বোঝা গেল, ইস্‌তিহ্‌সান চার প্রকার ঃ

১. ইস্‌তিহ্‌সানে সুন্নাত,

২. ইস্‌তিহ্‌সানে ইজ্‌মা,

৩. ইস্‌তিহ্‌সানে যরূরত (ضرورة),

৪. ইস্‌তিহ্‌সানে কিয়াসী।

প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের ইস্‌তিহ্‌সানের ব্যাপারে কোন রকম সন্দেহের অবকাশ নেই [কারণ এ দুই ক্ষেত্রে কিয়াসের বিপরীতে থাকে নাস (সুন্নাত) অথবা ইজমা]। এ দুই ক্ষেত্রে অবশ্যই কিয়াস পরিহার করার উদারণ আমরা দেখেছি। রইল বাকী তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকারের ইস্‌তিহ্‌সান। বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেয়া হলো।

ইস্‌তিহ্‌সানে যরূরত

কিয়াসের ভিত্তি সব ক্ষেত্রে এক এবং অভিন্ন অর্থাৎ (ইল্লাত) কিয়াস লব্ধ বিধান সমভাবে ফলপ্রসূ বা কল্যাণকর হয় না, বরং কোথাও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় এবং কোথাও তা ক্ষতির বা অন্যায় রূপে প্রতিভাত হয়। এহেন কিয়াসলব্ধ সিদ্ধান্ত পরিহার করতে হয়। এবং ভিন্ন রূপ ব্যবস্থা করতে হয়। ফকীহ্‌গণের পরিভাষায় এই ব্যবস্থা

হচ্ছে "ইস্‌তিহ্‌সানে যরুরত" (প্রযোজনের তাগীদে ইস্‌তিহ্‌সান) বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য কথা হচ্ছে এই "প্রয়োজন" হবে আল্লাহ্‌র হিকমতের সাথে সামঞ্জস্যশীল, বান্দার মনগড়া প্রয়োজন নয়। সে প্রয়োজন কল্যাণবাহী হতে হবে। ফকীহদের মতে সে কল্যাণ হবে নিম্নোক্ত রূপ ঃ

مايرجع الى قيام حياة الانسان وتمام عيشه ونيله ما تقتضيه اوصافه الشهوانية والعقلية على الاطلاق ـ[১]

সে কল্যাণ (মাসলাহাত) হবে "যা মানব জীবনের প্রতিষ্ঠামুখী (সহায়ক)এবং তার জীবনের পূর্ণতা বিধায়ক, মানবের কামনা-বাসনামূলক এবং বুদ্ধি-বৃত্তি ভিত্তিক বৈশিষ্ট্যগুলির চাহিদা পুরণের সহায়ক হবে সর্বতোভাবে।[১৬৯] মূলত মাসলাহাত বা কল্যাণ তিন প্রকার ঃ

১. মাসালিহে যরুরিয়া– مصالح ضرورية
২. মাসালিহে হাজিয়া– مصالح حاجية
৩. মাসালিহে তাহ্‌সীনিয়া– مصالح تحسينية

উপরোক্ত তিন প্রকার মাসলাহাতের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল ঃ

এক ঃ مصلحة ضرورية বলতে আমরা বুঝি এমন পাঁচটি (كليات خمس)-এর হিফ্‌জ (حفظ = সংরক্ষণ) যার জন্য বিধিবদ্ধ কল্যাণকর ব্যবস্থা রয়েছে শরী'আতে। এই পাঁচটি কুল্লিয়্যাত হচ্ছে ঃ (ক) حفظ الدين অর্থাৎ ধর্ম রক্ষা, (খ) حفظ النفس জান রক্ষা, (গ) حفظ العقل বুদ্ধি রক্ষা, (ঘ) حفظ النسل বংশ রক্ষা এবং (ঙ) حفظ المال সম্পদ রক্ষা।

এ মৌলিক বিষয়গুলির সংরক্ষণের উপর নির্ভর করে মানুষের প্রকৃতিগত আদিরূপে প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্ব এবং তার সমাজ জীবনের সংগঠন ও স্থিতিশীলতা। এ কারণে প্রত্যেক যুগের শরী'আত তার আইনে এ পাঁচটি ব্যাপারের হিফাযতের ব্যবস্থা করেছে। সুতরাং এগুলি সার্বজনীন (كليات) বলে অভিহিত হয়।

আল্লাহ্‌র হিকমত অনুযায়ী যেভাবে শরী'আত-এ ইসলামে এ ব্যাপারগুলির হিফাযতের ব্যবস্থা করা হয়েছে অর্থাৎ এজন্য যে ধরনের আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তার কতিপয় উদাহরণ নিচে দেয়া হলো ঃ

(ক) দীনের হিফাযতের জন্য কয়েক প্রকার ইবাদাত নির্ধারিত হয়েছে, দীনের প্রচার (تبليغ) এবং জিহাদ ফরয করা হয়েছে।

(খ) প্রাণের হিফাযতের জন্য দণ্ডবিধান আইনে হত্যার শাস্তি "কিসাস" (قصاص = হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড) অথবা دية (শোণিতপণ)-এর ব্যবস্থা রয়েছে।

১৬৯. আল মাওয়াকেআত, ২য় খণ্ড, ২৫ পৃষ্ঠা।

(গ) বুদ্ধিবৃত্তির হিফাযতের উদ্দেশ্যে মাদক দ্রব্যের বেচাকেনা নিষিদ্ধ এবং মাদকসেবীর শাস্তি নির্ধারিত হয়েছে।

(ঘ) বংশধারা সংরক্ষরণের উদ্দেশ্যে বিবাহের বিধান নির্ধারিত হয়েছে, অবৈধ যৌনকর্ম নিষিদ্ধ হয়েছে এবং অপরাধীর শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(ঙ) ধন-সম্পদ হেফাজতের উদ্দেশ্যে চুরি ডাকাতি ইত্যাদির জন্য শাস্তি নির্ধারিত হয়েছে। উপরোল্লিখ প্রয়োজন পূণং করার জন্য এগুলি ছাড়াও আরো অনেক বিধান প্রবর্তিত হয়েছে, যেমন পানাহার ও বসবাস সম্পর্কিত বিধান এবং এমনসব ব্যাপারে বিধান ও শাস্তিসমূহ, যেগুলি হারাম ও নিষিদ্ধ কার্য সম্পাদনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। نفس এবং عقل সংরক্ষণের সাথে এদের সম্পর্ক। অনুরূপভাবে পারস্পরিক লেনদেন, আচার-ব্যবহার, রাজনীতি সম্পর্কিত বিধানসমূহ نسل ،مال এবং دين ইত্যাদি সংরক্ষণের সাথে সম্পর্ক রাখে।

দুই ঃ মাসালিহ-এ হাজ্জীয়্যা (حاجية) তাকে বলে, যার ওপর পাঁচটি কুল্লীয়াতের রক্ষণ এবং স্থিতি নির্ভরশীল নয় ঠিকই; কিন্তু তার মাধ্যমে জীবন উপভোগ্য হয়, ক্ষতি নিরসন হয়, কষ্ট ও অস্বাচ্ছন্দ্য থেকে মুক্তিলাভ করা যায় এবং জীবনের এমনসব বিপদ সংকুল পথের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করা যায়, যেগুলিকে নিয়ন্ত্রিত না করে যথার্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন যাপন করা যায় না এবং সদাচার সৃষ্টিও সম্ভবপর হয় না।

এই মাসলিহাতের গরযে কেনাবেচা, অংশদারীত্ব ব্যবসায়, কৃষি, ভাড়া ইত্যাদি সম্পর্কিত বিধি-বিধান প্রবর্তিত হয়েছে এবং এই মাসলিহাতসমূহকে পূর্ণতা দান করার জন্য স্ত্রীদের মহর, তালাক, কতিপয় বিধান লঙ্ঘনের কাফ্‌রা ইত্যাদি সম্পর্কিত বিধানসমূহ প্রণীত হয়েছে।

তিন ঃ মাসালিহ্-এ তাহসীনিয়্যা (تحسينية) বলতে যে সব ব্যাপারের ওপর মূলত জীবনের প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল নয়; কিন্তু মানবিকতার গণ্ডীর মধ্যে থাকতে হলে যেগুলিকে বাদ দিয়ে চলা কোনোক্রমেই সম্ভবপর নয়, তাকেই বোঝান হয়, যেমন– উত্তম চরিত্র, সৎ অভ্যাস, উদার হৃদয়, সৎসাহস ইত্যাদি। এ জাতের মাসালিহের আওতায় নৈতিক বিধি-বিধান রচিত হয়েছে। উপদেশ ও উৎসাহ দানের মাধ্যমে সে সব বিধি-বিধানকে সক্রিয় রাখার জন্য তাকিদ করা হয়েছে। এগুলি ছাড়াও শিক্ষা দান, পানাহারের নিয়ম, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে সমতা ও ভারসাম্য সৃষ্টি করার বিধি-বিধানের সম্পর্ক এই মাসালিহের সাথে রয়েছে। এগুলি অর্জন করার পথে যেসব বাধা-বিপত্তি হতে পারে অথবা যা কোন প্রভাব ফেলতে পারে, সে সবের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। যেমন নোংরা ও নাপাক জিনিস ব্যবহার থেকে বিরত রাখার বিধান এবং পরিচ্ছন্ন ও পাক-পবিত্র জিনিস

ব্যবহার করার হুকুম দেয়া হয়েছে; কারণ নৈতিক জীবন অনেকাংশে নোংরা জিনিসের ব্যবহার দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাছাড়া সাদ্‌কা ও খয়রাত সম্পর্কিত বিধান, ক্ষমা ও দাবি প্রত্যাহার করার প্রেরণা দান করা, লেনদেন ইত্যাদি ব্যাপারে কঠোরতা বর্জন এবং নরম নীতি অবলম্বন করা ইত্যাদি এবং অনুরূপ বিধিসমূহ মাসালিহ-এ তাহ্‌সীনিয়্যার পর্যায়ে পড়ে।[১৭০] বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কথা হচ্ছে 'ইস্‌তিহ্‌সান' নীতির প্রয়োগ অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় এই তৃতীয় পর্যায়ের মাসালাহ অর্থাৎ মাসালিহ-এ-তাহসীনিয়্যার পরিধিতে। তাই ইস্‌তিহ্‌সান রীতি বস্তুত বিধি-বিধান মানব জীবনের সৌন্দর্য বা সৌকর্য সাধন (تحسين)-এর সাথে সম্পর্কিত।

ফকীহগণ নির্ধারিত অগ্রবর্তিতা ও বিলম্ব নীতি

ফকীহগণ অগ্রবর্তিতা ও বিলম্বের দিক দিয়েও মাসালিহের পর্যায় ও স্তর প্রতিষ্ঠা করেছেন। মূলগতভাবে তাঁরা অগ্রবর্তিতা ও বিলম্বের ক্ষেত্রে মাস্‌লিহাত ও প্রয়োজনের শক্তির প্রতি নজর দেন। কাজেই তাদের মতে মাসালিহে যরুরিয়া অগ্রবর্তী হবে মাসালিহে হাজিয়ার ওপর এবং হাজিয়া অগ্রবর্তী হবে তাহসীনিয়ার ওপর। অতঃপর তাদের প্রত্যেকের পরিপূর্ণরূপ অন্যের পরিপূর্ণ রূপের ওপর প্রাধান্য লাভ করবে।[১৭১]

কোন কোন ফকীহের মতে 'মুকাম্মিলাতে যরুরিয়া' অগ্রবর্তী হবে 'নফসে হাজিয়ার' ওপর। অনুরূপভাবে 'মুকাম্মিলাতে হাজিয়া' প্রাধান্য লাভ করবে 'নফসে তাহ্‌সীনিয়ার' ওপর।[১৭২] কিন্তু এই মতবিরোধটি খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। স্থান ও কালের প্রেক্ষিতে অতি সহজেই এর মীমাংসা করা যেতে পারে।

তারপর যরুরিয়া অগ্রবর্তী হবে দীন সংরক্ষণের ওপর, তার পরবর্তী পর্যায়ে প্রাণ সংরক্ষণের ওপর, তার পরবর্তী পর্যায়ে বংশ সংরক্ষণের ওপর, তার পরবর্তী পর্যায়ে বুদ্ধি সংরক্ষণের ওপর এবং তার পরবর্তী পর্যায়ে অর্থ সংরক্ষণের ওপর। এ ব্যাপারে এ ধরনেরও একটি মত পাওয়া যায় যে, পরবর্তী চারটি সংরক্ষণই দীনের ওপর অগ্রবর্তী হবে। কারণ এরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানুষের অধিকারের সাথে সম্পর্কিত। আর দীনের বেশির ভাগ সম্পর্ক আল্লাহ্‌র অধিকারের সাথে। অন্যদিকে বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে মানুষের অধিকার আল্লাহ্‌র অধিকারের ওপর অগ্রবর্তী হয়। যেমন কিসাসের শাস্তি মুরতাদের শাস্তির ওপর অগ্রবর্তী। ধন-সম্পদ সংরক্ষণের জন্য কখনো জুময়ার নামায ও জামায়াত ত্যাগ করারও অনুমতি পাওয়া যায়।

قد كان الاحسن تقديم هذا الاربعة على الدين -

"পরবর্তী চারটি অগ্রবর্তিতা দীনের ওপর বেশি ভালো হতে পারে।"[১৭৩]

---

১৭০. শারহে মুসাল্লামুস সুবূত, ৫২৫ পৃষ্ঠা।
১৭১. ঐ ৫৮২ পৃষ্ঠা।
১৭২. আত্‌তাকরীরু ওয়াত্‌ তাহজীর।
১৭৩. ঐ. ২৩১ পৃষ্ঠা।

কিন্তু গবেষক ও বিশেষজ্ঞ ফকীহগণ এর জবাব দিয়েছেন এবং দীনের অগ্রবর্তিতা বজায় রেখেছেন। সঠিকভাবে বলা যায়, এই বিরোধমূলক ব্যাপারও অনেকাংশে স্থান ও কালের নিগড়ে বাঁধা এবং এই দৃষ্টিতে সহজে এর ফায়সালা করা যেতে পারে।

শরীয়ত প্রণেতা কল্যাণ ও ক্ষতির প্রাধান্যের প্রতি দৃষ্টি রেখেছেন

এখানে একথা সুস্পষ্ট করে দেয়া প্রয়োজন মনে করি যে, মাসলিহাত (কল্যাণ) ও ক্ষতি দুটি আপেক্ষিক জিনিস। একটি জিনিস একদিক দিয়ে উপকারী ও লাভজনক এবং অন্য দিক দিয়ে ক্ষতিকর হতে পারে। কখনো এই দুটি দিক সমান হয়ে যায়, আবার কখনো এদের মধ্যে ফারাক হয়ে যায়। শরীয়ত প্রণেতা বিধান নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে প্রাধান্যের দিকে নজর রেখেছেন। অর্থাৎ কোন বিষয়ের মধ্যে লাভের দিকটি প্রবল ছিল বলে তাকে বৈধ গণ্য করেছেন। আবার সেই একই বিষয়ের মধ্যে ক্ষতির দিকটি প্রবল থাকার কারণে তাকে নিষিদ্ধ করেছেন। তাই ফকীহগণ বলেছেন ঃ

ليس فى الدنيا مصلحة ولامفسدة محضة والمقصود للشارع ماغلب منها ـ

"দুনিয়ায় কোন কল্যাণ ও ক্ষতি নির্ভেজাল হয় না। তাই শরীয়ত প্রণেতা তাদের প্রাধান্যকেই লক্ষ্য হিসেবে স্থির করেছেন।[১৭৪]

তবে নির্দেশ পালন করার জন্য এই সব মাসলিহাতের তাৎপর্য অবহিত হওয়া অপরিহার্য নয়। অথবা আমাদের ইচ্ছা-আকাংখা ও চিন্তা-ভাবনার সাথে সেগুলির সমতা ও সাজুয্য থাকার প্রয়োজন নেই। শরীয়ত প্রণেতা আমাদের দীনী ও দুনিয়াবী সাফল্য, কল্যাণ এবং আমাদের লাভ-ক্ষতি অনুধাবন করে যে নির্দেশ ও বিধান (আদেশ ও নিষেধ) নির্ধারিত করেছেন সেগুলি পালন করা আমাদের জন্য জরুরী।

ইস্‌তিহ্‌সানে যরুরতের উদাহরণ

১. শরী'আতের একটি বিধান হচ্ছে, যদি আমানতদারের হাতে গচ্ছিত জিনিস নষ্ট হয়ে যায় এবং অথচ তাতে তার দোষ বা অবহেলা না থাকে, তাহলে আমানতদারকে খেসারত দিতে হবে না। যেখানেই আমানত যৌথ রূপ পাওয়া যাবে সেখানেই এই হুকুম প্রযোজ্য হবে। যেমন যৌথ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে শরীকদের কারো হাতে যদি পণ্য নষ্ট হয়ে যায়, অথবা কর্মচারীর হাতে সম্পদ নষ্ট হয়ে যায় কিংবা কোন জিনিস ধারে নেয়া হয় এবং ধার গ্রহণকারীর হাতে ঐ সম্পদ নষ্ট হয়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে এর খেসারত দিতে হবে না। তবে এসব ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে যাদের হাতে

১৭৪. আল মাওয়াফেকাত, ২য় খণ্ড, ২৫ পৃষ্ঠা।

মাল নষ্ট হলো তাদের পক্ষ থেকে যদি কোন ত্রুটি না হয় এবং নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে তাদের কোন হাত না থাকে, এই লেনদেনগুলি আমানত সদৃশ।

কিন্তু যে পেশাদার ব্যক্তি কোন ব্যক্তি বিশেষের নয় বরং অনেকের কাজ করে। যেমন ধোপা, রঞ্জক, দরজী, রুটিওয়ালা ইত্যাদি, এদের হাতে জিনিস নষ্ট হলে বা খোয়া গেলে তার অবশ্যি ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন (যরুরত) ও কল্যাণ (মাসলাহাত) হচ্ছে এই যে, যদি তাদের কাছে থেকে ক্ষতিপূরণ না নেয়া হয় তাহলে লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে তাদের অনেকেই হয়ত লোকের সম্পদ নষ্ট বা লোপাট করবে এবং জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

তবে যদি তাদের ক্ষমতার বাইরে কোন কারণে সম্পদ নষ্ট হয়ে যায়, যেমন আগুন লেগে বা কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে তাহলে তাদের থেকে ক্ষতিপূরণের দাবি করা যাবে না।

২. যেসব জিনিস ওজন (وزن) করে বা পরিমাপকের (كيل) সাহায্যে মেপে বেচাকেনা করা হয় বা ধার শোধ করা হয়, এই ধরনের জিনিসের একই জাত (جنس)-এর জিনিস হলে (যথা গমের পরিবর্তে গম,খেজুরের পরিবর্তে খেজুর, চালের বদলে চাল ইত্যাদি) বিনিময় ওজনে বা মাপে সমান সমান হওয়া জরুরী। অন্যথায়, কমবেশি হলে, অতিরিক্ত পরিমাণ (فضل) জিনিস রিবা (ربوا) বা সুদে গণ্য হয়ে যাবে। কিন্তু রুটির লেনদেনে এই বিধান প্রযোজ্য হবে না। যেমন কোন ব্যক্তি ছটাক ওজনের দুটি রুটি ঋণ নেয় এবং দেড় ছটাক ওজনের দুটি রুটি ফেরত দেয়। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত (فضل) সূদে গণ্য হবে না। কারণ প্রয়োজন (যরুরত) ও কল্যাণ (মাসলিহাত)। প্রতিবেশীদের তৈরী সামগ্রীর বিনিময় চলতে থাকে যাতে সামান্য হেরফের স্বাভাবিক। এ সামান্য ব্যাপারে কড়াকড়ি সামাজিক জটিলতা সৃষ্টি করবে। তাই ইস্‌তিহ্‌সানের চাহিদায় কিয়াস পরিত্যক্ত হবে।

নিষিদ্ধ বস্তুও কখনো মুবাহ হয়

কোন কোন প্রয়োজন এবং কল্যাণ এমনো হতে পারে যাতে নিষিদ্ধ বস্তু মুবাহ বা হালাল হয়ে যায়। ফকীহগণ নিম্নোক্ত নীতি নির্ধারণ করেছেন ঃ

الضرورات تبيح المحظورات لاضرر ولاضرار -

"প্রয়োজন নিষিদ্ধ বস্তুকেও মুবাহ করে দেয়, ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না, অপরকেও ক্ষতিগ্রস্ত করোনা।"[১৭৫]

الضرر يزال "ক্ষতি দূর করা উচিত।"

---

১৭৫. শরহে সীয়ারে কবীর, ৩২১ পৃষ্ঠা।

অনুরূপভাবে এ নিয়মগুলিও প্রণিধানযোগ্য ঃ

الضرر لايزال بالضرر "কোন ক্ষতিকে অন্য এক ক্ষতির মাধ্যমে দূর করা যায় না।"

المشقة تجلب التيسير "কষ্ট সহজ উপায় সন্ধান করে।"

উপরোক্ত নীতিগুলোর প্রয়োগ হবে প্রয়োজনের অনুপাতে, তার বেশি নয়। যেমন, দাই সন্তান প্রসব করানোর ব্যাপারে এবং চিকিৎসক চিকিৎসার অপরিহার্য প্রয়োজন যতটা আবশ্যিক ততটা সতর (ستر –ঢাকিয়া রাখা) অনাবৃত করবার অনুমতি পাবে, যেমন প্রয়োজনের আকৃতির ব্যাপারে ফকীহ্‌গণ বলেন ঃ

الثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة ـ

যরুরাত-এর ভিত্তিতে যে হুকুম দেওয়া হবে,তা যরুরাতের নিরিখে হতে হবে।

প্রয়োজন ও মাস্‌লিহাত নির্ধারণের ক্ষেত্রে 'আল্লামা শাওকানীর নিম্নোক্ত নীতিটি অপরিহার্য ঃ

وان المصالح انما اعتبرت من حيث وضع الشارع لا من حيث ادراك المكلف ـ

"মাসলাহাত এর বিবেচনা হবে শরী'আত প্রতিষ্ঠাতার প্রতিষ্ঠা অনুযায়ী (তাঁর হিকমত অনুযায়ী), মুকাল্লাফ (مكلف = শরী'আত অনুসরণের দায়িত্ব যার উপর অর্পিত)-এর অনুভূতি অনুযায়ী নয়।" এ প্রসঙ্গে আল্লামা শাতিবী–নিম্নরূপ মন্তব্য করেন ঃ

المراد بالمصالح والمفاسد ما كانت كذالك فى نظر الشرع لا ما كان ملائما او منافرا للطبع ـ

"কল্যাণ ও অল্যাণ বলতে যা বোঝান হয় তা হবে শরী'আতে দৃষ্টিতে যা কল্যাণ ও অকল্যাণ তাই, ব্যক্তির প্রকৃতিগত ধ্যান-ধারণার আনুকূল্য অথবা প্রতিকূলতার বিবেচনার উপর নির্ভরই হবে না।[১৭৬]

কিয়াস ভিত্তিক ইস্‌তিহ্‌সানের বিবরণ

কিয়াসী ইস্‌তিহ্‌সান (قياسى استحسان) হচ্ছে যদি সুস্পষ্ট কিয়াসের ভিত্তিতে যা হুকুম বা বিধান হওয়া উচিত তদনুযায়ী কিন্তু কাজ করা কঠিন অথবা ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়। সে অবস্থায় সে কিয়াসের বিপরীত হুকুম দেয়া, এবং তার উপায় হচ্ছে উদ্ভূত ব্যাপারটির গভীরে গিয়ে সূক্ষ্মতর দিক বের করা এবং এই প্রচ্ছন্ন দিকটির বিবেচনায় হুকুম বা বিধান দান করা। ফকীহ্‌গণের পরিভাষায় তাকে বলা হয়

---

১৭৬. আল মাওয়াফিকাত, ১ম খণ্ড, ২৪২ পৃষ্ঠা।

'কিয়াসে খাফী' বা অস্পষ্ট কিয়াস। যেহেতু এক্ষেত্রে দুটি কিয়াসের মধ্যে বিরোধ বাধে এবং যুক্তির ভিত্তিতে একটিকে প্রাধান্য দেয়া হয়, তাই তাকে ইস্‌তিহ্‌সানও বলা হয়।

কিয়াসী ইস্‌তিহ্‌সানের উদারহণ

১. এক ব্যক্তি একজনের কাছে কোন জিনিস আমানত রেখে কোথাও চলে গেল। অন্য এক ব্যক্তি এসে বললো, আমি তার উকিল (وكيل = প্রতিনিধি) আমাকে আমানত ফেরত দাও। আমীন (যার কাছে আমানত আছে) বিশ্বাস করলো, সত্যিই সে প্রথম ব্যক্তির উকিল। এ অবস্থায় কিয়াসের দাবি হচ্ছে, সে ঐ আমানত উকিলের হাতে সোর্পদ করবে। যেমন ঋণের ব্যাপারে কোন ব্যক্তি যখন নিজেকে ঋণ আদায়ের উকিল হিসাবে পেশ করে এবং ঋণগ্রহীতা তার দাবির সত্যতা মেনে নেয় তখন ঋণের প্রাপ্য তার হাতে সোপর্দ করে দেয়া হয়। কিন্তু ইস্‌তিহ্‌সান এই ঋণের প্রাপ্য উকিলের হাতে সোপর্দ না করার দাবি করে। এই দুটি অবস্থার মধ্য অতিসূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। সেটি হচ্ছে ঃ যে ব্যক্তি আমানতের মালিক তার অধিকার যে জিনিসটি আমানত রেখেছিল ঠিক সে জিনিসটির সাথে সম্পর্কিত। এ কারণে যে জিনিসটি আমানত রেখেছিল হুবহু তাই ফেরত দিতে হয়। তার পরিবর্তে অন্য কোন জিনিস দিলে এমন একটি জিনিস ফেরত দেয়া হয় যার সাথে আমানত দাতার অধিকারের সম্পর্ক ছিল না।

বিপরীতপক্ষে, ঋণ সম্পর্কে বলা যায়, ঋণদাতার অধিকার বহুবহু সেই অর্থের বা বস্তুর সাথে সম্পর্কিত নয়, যা ঋণ বাবদ দেয়া হয়েছে। বরং ঋণগ্রহীতার ঋণ পরিশোধের দায়িত্বই তার অধিকারের ক্ষেত্র। কাজেই যে অর্থের বা বস্তুর মাধ্যমেই ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধ করবে, ঋণদাতার অধিকার তার সাথেই সম্পর্কিত হয়ে যাবে এবং ঋণ আদায় সঠিক হবে।

মনে করুন, উল্লেখিত অবস্থায় ঋণদাতা এসে যদি বলে, "আমি ঐ ব্যক্তিকে উকিল নিযুক্ত করিনি, কাজেই আমার সম্পদ পূর্ববৎ তোমার কাছে আছে," তাহলে এ অবস্থায় ঋণগ্রহীতাকে অবশ্যি খেসারত দিতে হবে। কারণ সে নিজেই উকিলের কথার সত্যতা মেনে নিয়েছিল এবং ঋণ ফেরত দিয়েছিল। ঋণের ক্ষেত্রে তো খেসারত বা অর্থদণ্ড কার্যোদ্ধার হয়ে যাবে। কিন্তু আমানতের ক্ষেত্রে খেসারত দিলে তার অধিকার খেসারতের সাথে অর্থাৎ বদলে যা আদায় করা হচ্ছে তার সাথে সম্পর্কিত হয়ে যাবে, অথচ তার অধিকারটি যথার্থ আমানতের সাথে সম্পর্কিত ছিল, তার বদলের সাথে নয়। এই জটিলতা এড়ানোর জন্যে কিয়াস পরিহার করে ইস্‌তিহ্‌সানের আশ্রয় নিতে হবে এবং হুকুম হবে আমানত উকিলের হাতে সোপর্দ করা যাবে না।

২. ঋণদাতার কাছে ঋণের জামানত (ضمانة) বাবদ কোন জিনিস রাখা আছে। ধরুন ঋণদাতা ঋণের অর্থ মাফ করে দিয়েছে কিন্তু জামানতের জিনিস এখনো

ফেরত দেয়নি, এমন অবস্থায় তা তার কাছে বিনষ্ট হয়ে গেছে। এ অবস্থায় কিয়াসের দাবী হচ্ছে, ঋণদাতা তার ক্ষতিপূরণ দেবে। তাই যদি হয় তাহলে ঋণ গ্রহীতা অত্যধিক লাভবান হচ্ছে, ঋণ শোধ করতে হলো না অথচ জামানতের ক্ষতিপূরণ পাওয়া গেল। আর বেচারা ঋণদাতা ঋণ বাবৎ একটি পয়সাও নিলোনা, উল্টো ক্ষতিপূরণ চাপলো তার উপর।

এই ক্ষতি থেকে ঋণদাতা যে ঋণ মাফ করে দিয়েছে তাকে রক্ষা করার জন্য ফকীহগণ ইস্‌তিহ্‌সানের আশ্রয় নিয়েছেন অর্থাৎ তাকে দেওয়া জামানতের মালকে 'আমানত' গণ্য করেছেন, বা সংরক্ষণ ব্যবস্থায় কোন প্রকার ত্রুটি ছাড়াই যদি এই জামানতের জিনিস নষ্ট হয়ে যায় তাহলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

ইস্‌তিহ্‌সানের বিরোধিতা

ইমাম শাফেঈ (র) ইস্‌তিহ্‌সানের বিরোধিতা করেন এবং বলেন ঃ

من استحسن فقد شرع اى وضع شرعا جديدا ـ

"যে ব্যক্তি ইস্‌তিহ্‌সানের সাহায্য গ্রহণ করে সে নতুন শরী'আত তৈরী করে।"

অথচ হানাফী ফকীহ্‌গণ ইস্‌তিহ্‌সানকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে ফিকহের বিরাট খেদমত করেছেন। ইস্‌তিহ্‌সান ভিত্তিকে হানাফী ফকীহ্‌দের বিধানগুলিতে তাঁদের গভীর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও সূক্ষ্ম অনুধাবন ক্ষমতার প্রমাণ পাওয়া যায়। হাম্বলীগণও ইস্‌তিহ্‌সানকে শরী'আত বিধানের অন্যতম উৎস রূপে ব্যবহার করেন। ইমাম মালেক (র) এবং মালিকী ফকীহ্‌গণ ইস্‌তিহ্‌সানের ব্যবহার করেছেন সামান্য মতপার্থক্য সহকারে।

শাহ্ অলীউল্লাহ্ (র)-ও ইস্‌তিহ্‌সানের বিরোধিতা করেছেন। তিনি ইস্‌তিহ্‌সানকে তাহ্‌রীফ ফিদ্‌দীন (تحريف فى الدين = দীনের বিকৃতি) বলে আখ্যায়িত করেছেন। সম্ভবত উপরোক্ত দুই মণীষী অপব্যবহারের আশংকায় ইস্‌তিহ্‌সানের বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মনে এই রূপ আশংকার অর্থাৎ বে-পরওয়া ইস্‌তিহ্‌সান প্রয়োগের আশংকার ইংগিত মিলে ঃ

فيختلس بعض ماذكرنا من اسرار التشريع فيشرع للناس حسب ماعقل من المصلحة ـ

"আমরা শরীয়তের যে নিগূঢ় তত্ত্ব বর্ণনা করেছি (কোন লোক) তার মধ্যে থেকে কোনটিকে (অসৎ উদ্দেশ্যে) লুকে নেবে এবং তার বুদ্ধি অনুযায়ী কোন মাস্‌লাহাত দাঁড় করিয়ে লোকদের জন্য বিধান দান করবে, তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে।"

আসলে ইস্‌তিহ্‌সানকে বাদ দিলে ইসলামী জীবনের নিত্য-নতুন সমস্যার সমাধান অসম্ভব হয়ে পড়বে, ইসলামী শরী'আতে আড়ষ্টতা এসে যাবে।

ষষ্ঠ উৎস ঃ ইস্‌তিস্‌লাহ্ বা মাসালিহা-এ মুর্‌সালা (বিবিধ) استصلاح - مصالح مرسلة

ইস্‌তিস্‌লাহের সংজ্ঞা

ফকীহগণের পরিভাষায় "নিছক প্রয়োজন ও সুবিধার ভিত্তিতে আহকাম উদ্ভাবন করার নাম ইস্‌তিস্‌লাহ্ বা মাসালিহ-এ মুর্‌সালা।" ফকীহগণের ভাষায় তা হচ্ছে ঃ

بناء الاحكام الفقهية على المقتضى المصالح المرسلة -

"বিবিধ মাসলাহাত-এর চাহিদার ওপর ফিকহী আহকামের ভিত্তি স্থাপন।"

ফকীহগণের নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকে মাসালিহ-এ-মুরসালা-এর ধারণা আরো সুস্পষ্ট হয় ঃ

المصالح المرسلة هى التى لايشهد لها اصل فى الشرع بالاعتبار ولا بالالغاء وان كانت على سنن المصالح وتلقتها العقول بالقبول -

"মাসালিহ-এ-মুরসালা বলতে বোঝায় এমন সব ব্যাপার যার বিবেচনার পক্ষে শরীআতের কোন আসল (মৌলনীতি) সাক্ষ্য দেয় না এবং যাকে নাকচ করার পক্ষেও সাক্ষ্য দেয় না অথচ সুস্থবুদ্ধি ব্যাপারগুলিকে গ্রহণ করে।"[১৭৭] ফকীহগণের অন্য একটি বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

المصالح المرسلة وهى التى لم يشهد لها اصل شرعى من نص او اجماع لابالاعتبار ولابالالغاء -[২]

"মাসালিহ-এ-মুরসালা এমন সব ব্যাপার যার বিবেচনার পক্ষে শরীআতের কোন মৌলনীতি বা নাস (কুরআন বা হাদীসের কোন স্পষ্ট বচন) হউক কিংবা ইজমা যেমন সাক্ষ্য দেয় না, নাকচ করে দেয়ার পক্ষেও দেয় না।"[১৭৮]

প্রয়োজন ও কল্যাণের ভিত্তিতে ইস্‌তিহ্‌সানে যেভাবে হুকুম উদ্ভাবন করার কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে ইস্‌তিস্‌লাহ-এ তার পরিসর আরো বেশি ব্যাপক। অন্য কথায়, ইস্‌তিহ্‌সান অপেক্ষা ইস্‌তিস্‌লাহের ক্ষেত্র ব্যাপকতর।

---

১৭৭. আল মাওয়াফেকাত, ১ম খণ্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা।

১৭৮. মিনহাজুল উসূল।

মাসালিহে মুরসালার শর্তাবলী

ফকীহগণ মাসালিহে মুরসালাকে কাজে লাগাবার জন্য অর্থাৎ ইসতিসলাহ্ ভিত্তিতে বিধান দানের জন্য নিম্নোক্ত শর্তাবলী নির্ধারণ করেছেন ঃ

এক, শরী'আতে যেসব মাসালিহের বিবেচনার ব্যবস্থা রয়েছে, ইসতিসলাহের ক্ষেত্রে বিবেচ্য মাসালিহগুলি উহাদের সাথে সামঞ্জস্যশীল হতে হবে, অর্থাৎ কুল্লিয়াতে খামসা-এর প্রয়োজনগুলির মধ্য থেকে কোনটির সাথে তাদের সাদৃশ্য থাকতে হবে।

দুই, যে মাসলাহাত-এর বিবেচনায় ইসতিসলাহ নীতির ভিত্তিতে বিধান দেয়া হচ্ছে তা হাসিল হওয়ার নিশ্চয়তা (قطعية) থাকতে হয়, অনিশ্চিত কল্যাণের সম্ভাবনা দৃষ্টে ইসতিসলাহ চলবে না।

তিন, এই মাসালিহ-কে হতে হবে দেশ ও জাতির ব্যাপক বা সামগ্রিক কল্যাণের সাথে সম্পর্কিত। নিম্নোক্ত বাক্য থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায় ঃ

كل اصل شرعى لم يشهد له نص معين وكان ملائما لتصرفات الشرع وماخوذا معناه من ادلة فهو صحيح بنى عليه ويرجع اليه ـ

কোন নীতি, যার সাক্ষ্য কোন نص-এ পাওয়া যায় না, অথচ তা শরীআতে প্রবর্তিত বিধানগুলির সাথে খাপ খায় বা অনুকূল হয়, যে নীতির মর্মকথা শরী'আতের দলীল-প্রমাণাদি থেকে গৃহীত হয়, সে নীতির ভিত্তিতে বিধান উদ্ভাবন (استصلاح) চলবে এবং তার আশ্রয় গ্রহণ জায়েয।[১৭৯]

একটি উদাহরণ

যেমন ধরুন, ইসলাম ও কুফরের যুদ্ধে শত্রুপক্ষ মুসলিম বন্দীদেরকে অগ্রদল (vanguard) হিসেবে সামনে দাঁড় করিয়ে দিল এবং একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, এই মুসলিম বন্দীদের ওপর আক্রমণ না চালালে শত্রুপক্ষকে হটানো অসম্ভব হবে, ফলে শত্রুপক্ষ বিজয়ী হবে। মুসলিম বাহিনীর সমূহ বিপর্যয় সুনিশ্চিত হবে। মুসলিমের রক্তপাত হারাম হওয়া সত্ত্বেও এই সংকটময় অবস্থায় মুসলিম বন্দীদেরকে কতল করা অপরিহার্য হবে। যেহেতু সাধারণ মাসলাহাত এবং দীন ও মিল্লাতের হিফযতের সাথে এর সম্পর্ক, তাই এক্ষেত্রে মুসলিম হত্যাকে বৈধ গণ্য করা হয়েছে। আর একটা উদাহরণ, অবশ্য সবার নয়–কোন কোন ফকীহের মতে কুরআন ও হাদীসকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করাও হয়েছে ইসতিসলাহ নীতিতে, [খোদ রাসূল (সা) তা করেন নি বা স্পষ্ট বাক্যে আদেশ দেননি]। সর্বজনীন কল্যাণ (মাসলাহাত)- এর সুনিশ্চিত সম্ভাবনার ধারণা থেকে এ কাজটি করা হয়েছে।

---

১৭৯. আল মাওয়াফেকাত, ১ম খণ্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা।

ফলকথা, মাসালিহে মুরসালার ভিত্তিতে নতুন নতুন সমস্যার সমাধান সহজ হয়। কিন্তু এই মাসলাহাতগুলি অনুধাবন করা এবং সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য যথারীতি ইল্লাতের সন্ধান করা গবেষণা সাপেক্ষ।

ইমাম মালেক (র)-এর প্রতি ইসতিসলাহ-এর আরোপ

ফিক্‌হ ও উসূলবিদগণের মধ্যে ইমাম মালেক (র) অত্যন্ত ব্যাপকভাবে মাসালিহে মুরসালার ভিত্তিতে ইসতিসলাহ নীতি ব্যবহার করেছেন। পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি উপরোল্লিখিত শর্তাদি মেনে চলারও প্রয়োজন বোধ করেন নি। সাধারণত তাকেই ইসতিসলাহ নীতির উদ্ভাবক বলা হয়। যদিও অধিকাংশ ফকীহ এই নীতির যথার্থতা স্বীকার করেন বা স্বীকার করতে বাধ্য হন।

ইস্‌তিস্‌লাহের ব্যাপারে ইমাম মালেক (র)-এর যুক্তি বেশি শক্তিশালী। তিনি বলেন ঃ

১. শরীআত প্রণেতা সমগ্র হুকুমের ক্ষেত্রে সাকুল্যে মাসালিহের পক্ষে বিবেচনা করেছেন। মানবের সার্বিক কল্যাণ লাভ এবং অকল্যাণ রোধের উদ্দেশ্যে মাসলাহাতের বিবেচনা ব্যতিরেকে শরীআতের কোন হুকুম প্রবর্তিত হয়নি। এ থেকে বোঝা যায় মাসলাহাত এর বিচার-বিবেচনা একটি সার্বিক নীতি।

২. প্রাথমিক অবস্থায় বিধান উদ্ভাবন করার ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের দৃষ্টান্ত রয়েছে। তাঁরা সব ক্ষেত্রে মাসালিহের বিবেচনা করতেন, বেশি বিতর্ক আলোচনায় লিপ্ত হতেন না। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, কুরআন মজীদ লিপিবদ্ধ করণ, খিলাফতের জন্য নির্বাচন পদ্ধতি নির্ধারণ, রাষ্ট্রীয় কর্মের জন্য বিভিন্ন বিভাগের সৃষ্টি, কারাগার স্থাপন, জুমুআর নামাযের জন্য নতুন আযান (বর্তমানে যেটি প্রথম আযান)-এর প্রবর্তন এবং মসজিদে নববীতে স্থান সংকুলানের জন্য সন্নিহিত ভূমির ওয়াকফ-এর বিধান ইত্যাদি তাঁরা করেছেলেন নিছক মাসালাহাতের বিবেচনায়। এ ব্যাপারগুলির কোন দৃষ্টান্ত বা নজীর তাদের সামনে ছিল না। কোন نص ও ছিল না। সুতরাং বলা যায়, মাসালাহাতের বিবেচনায় বিধান উদ্ভাবনের ব্যাপারে সাহাবা (রা)-এর উজ্‌মা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।[১৮০] এ কথা অনস্বীকার্য যে, সাহাবা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সান্নিধ্য লাভ এবং সরাসরি তাঁরই কাছে শিক্ষা লাভ করেছিলেন বলে তাঁরা ছিলেন আহকামে শারীআতের গূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল।

ইমাম মালেকের (র) এই বক্তব্য যেসব ফকীহ গ্রহণ করেননি, তাদের প্রত্যেকেই এর প্রত্যেকটির জবাব দিয়েছেন। তাদের জবাবাগুলি তাদের কিতাবসমূহে উল্লেখিত

---

১৮০. মিনহাজুল উসূল, ফুটনোট আত্‌তাকরীর ওয়াত তাহজীর, ৩য় খণ্ড, ১৩৯ পৃষ্ঠা।

হয়েছে। সেগুলিও যথস্থানে অত্যন্ত দূরদর্শীতা ও চরম সতর্কতার পরিচয় প্রদান করে। যেমন প্রথম অবস্থায় উল্লেখিত যুক্তির ভিত্তিতে সাধারণ মাসলিহাতের ওপর নির্ভরতাকে বৈধ গণ্য করা হলে এর ওপর নির্ভর করে অর্থহীন গণ্য করার রূপটিও সামনে থাকেত হবে। কারণ নির্ভরশীল মাসলিহাতের ওপর কিয়াস করে যেভাবে নির্ভর করা যেতে পারে, ঠিক তেমনি তাকে অর্থহীনও গণ্য করা যেতে পারে (যেমন অন্যেরা অর্থহীন গণ্য করে)। এ কথা স্পষ্ট, একই বস্তুর উভয় দিক গ্রাহ্য হওয়া অবাস্তব ও অসম্ভব। আর সাহাবাগণের র‍্যাপারে বলা যায়, তাঁরা সরাসরি ও পূর্ণাঙ্গ রূপে শরীয়ত সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং শরীয়তের বিধানের নিগূঢ় তত্ত্বের ব্যাপারে পারদর্শী ছিলেন। সম্ভবত তাঁরা প্রকরণ ও নিকট শ্রেণী ইত্যাদির ক্ষেত্রে শরীয়ত প্রণেতার নির্ভরতা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এবং মাসলিহাতকে তারই অন্তর্ভুক্ত গণ্য করে বিধান উদ্ভাবন করেছিলেন।

মোটকথা, প্রয়োজন ও মাসলিহাতের চাপের মুখে বাধ্য হয়ে ব্যাপকতা ও উদারতার নীতি অবলম্বন করার ব্যাপারটি অস্বীকার করা যেতে পারে না। যেসব ফকীহ এ নীতি মানেন না, তাঁরাও কোন না কোন পর্যায়ে সাধারণ মাসলিহাতকে স্বীকার করুন বা নাই করুন, তারপও মাসলিহাত (তথা সুবিধা) অর্জন ও ক্ষতিকারক দূর করার পথ অবলম্বন করেন।

ফকীহগণের কার্যোদ্ধারের কৌশল

ইমাম মালেক (র)-এর উদার নীতির কোন কোন ফকীহ কঠোর সমালোচনা করেছেন। যেমন ইমাম গাযালী (র) ইসতিহসান ও ইস্‌তিস্‌লাহ উভয়কে কাল্পনিক যুক্তি আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু মাসলিহাত ও প্রয়োজনের সামনে সবাই অস্ত্র সম্বরণ করতে বাধ্য হয়েছেন এবং কোন না কোন দূরবর্তী ব্যখ্যার মাধ্যমে নির্ধারিত নিয়মের আওতাধীন ইসলামী ফিকাহর কার্যক্রমকে সামনের দিকে এগিয়ে দিয়েছেন। যেমন ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর ইস্‌তিহ্‌সানকে এক ধরনের কিয়াস গণ্য করা হয়। এভাবে ইমাম মালেক (র)-এর ইসতিসলাহকেও নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে এক ধরনের কিয়াসে পরিণত করা যেতে পারে। যেমন দুই প্রকার কিয়াসের উল্লেখ করা যায় ঃ

১. বিশেষ কিয়াস ও ২. সাধারণ কিয়াস

এক, বিশেষ কিয়াস ঃ ইল্লাতের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে উদ্ভূত সমস্যাবলীর হুকুম প্রমাণ করা।

দুই, সাধারণ কিয়াস ঃ নির্বিশেষ মাসলিহাতকে শরীয়ত প্রণেতার নির্ধারিত মাসলিহাতসমূহের ওপর কিয়াস করে কেবলমাত্র মাসলিহাতকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে হুকুম প্রমাণ করা।

ইমাম শাফেয়ী (র)-ও যুক্তির জোরে কিয়াসকে আর একভাবে বিভক্ত করেছেন ঃ

১. কিয়াসে জালী ঃ যেখানে পার্থক্যকারী গুণের অর্থহীন হওয়া জানা যায়। যেমন, কোন হুকুম বিশেষ করে পুরুষের সাথে সম্পৃক্ত হলে তার মধ্যে এ কথা প্রকাশ হওয়া যে, এক্ষেত্রে হুকুমের মধ্যে বিশেষত্ব দান উদ্দেশ্য নয় বরং নারী ও পুরুষ সবাই সমান।

২. কিয়াসে খাফী ঃ যেখানে পার্থক্যকারীগণের অর্থহীন হওয়া জানা যায় না।

ইমাম আহমদ (র) প্রয়োজনের সময় যথাসম্ভব ইস্‌তিহ্‌সানের সাহায্য নেবার চেষ্টা করেছেন এবং তারপর ইস্‌তিস্‌লাহের সাহায্যে কার্যোদ্ধার করেছেন। বরং কোন ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য থেকে প্রমাণ হয় ইমাম আহমদ (র) ইমাম মালেক (র)-এর চাইতেও বেশি ব্যাপকতা ও উদারতার আশ্রয় নিয়েছেন। এমন কি তিনি মাসালিহে মুরসালাকে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজ্‌মার সাধারণ হুকুমের স্থান-কালের প্রেক্ষিতে বিশেষত্ব দানকারী গণ্য করেছেন। মোটকথা, যাঁরা ইস্‌তিহ্‌সান ও ইস্‌তিস্‌লাহকে উৎস হিসাবে স্বীকার করেন না তাঁরা কিয়াসের আওতাধীনে উদ্ভূত সমস্যাবলীর সমাধান করে থাকেন। এতে অবশ্য কিছুটা সংকীর্ণতা দেখা দেয়। কিন্তু কাজ থেমে থাকে না।

মাসালিহে মুরসালাহ ব্যবহারের স্থান

সাধারণত সমাজ সেবা ও সমাজকল্যাণমূলক কাজের সাথে সম্পর্কিত বিভাগেই বেশি করে মাসালিহে মুরসালাহ ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়। যেমন, আধুনিক চাহিদা অনুযায়ী আইন রচনা করা, স্থান-কালের প্রেক্ষিতে সেগুলি প্রবর্তন করার জন্য বিভিন্ন কৌশল ও ব্যবস্থা অবলম্বন করা এবং শাস্তি নির্ধারণ করা ইত্যাদি। কখনো কখনো মাসালিহে মুরসালার প্রেক্ষিতে কুরআন ও সুন্নাহর সাধারণ হুকুম বিরোধী হুকুম দেবারও অবকাশ থাকে। যেমন, পূর্বোল্লিখিত কুফর ও ইসলামের যুদ্ধে ইসলামী মিল্লাতের হিফাযত ও স্থায়িত্বের স্বার্থে মুসলিমের রক্ত ঝরানো জায়েয করা হয়েছিল। কারণ এ ছাড়া দুশমনকে পরাস্ত করা ও তার ওপর বিজয় লাভ করা সম্ভব ছিল না।

সপ্তম উৎস ঃ ইস্‌তিদ্‌লাল (اِستدلال)

দলীল (دَلِيل) তলব করা বা তালাশ করা বা দলীল পেশ করা বা দলীলের সাহায্যে কোন কিছু প্রমাণ করা ইত্যাদি হচ্ছে استدلال-এর শব্দগত অর্থ। ইসলামী ফিকাহর সপ্তম উৎস হচ্ছে এই ইস্‌তিদ্‌লাল। অনেক অবস্থায় একে ইস্‌তিস্‌লাহের চাইতেও বেশি ব্যাপক মনে করা হয়। কিন্তু ইজতিহাদ ও সমস্যার সমাধান নির্ণয়ের কোন বিশেষ পদ্ধতির সাথে এর সম্পর্ক সীমাবদ্ধ নয়। বরং ফকীহগণ ইজতিহাদ করার জন্য যেসব পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন, তার প্রায় সবগুলিই তার অন্তর্ভুক্ত।

ইস্‌তিদ্‌লালের কয়েকটি রূপ

ফকীহগণ ইস্‌তিদ্‌লালের নিম্নোক্ত কতিপয় রূপ বর্ণনা করেছেন ঃ

এক ঃ কল্যাণকর বস্তু মূলত মুবাহ এবং ক্ষতিকর বস্তু মূলত হারাম

এর প্রমাণ স্বরূপ কুরআন মজীদের কয়েকটি আয়াত পেশ করা হয় ঃ

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ - (الاعراف : ٣٢)

"(হে রাসূল!) বলে দাও, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের জন্য যেসব ভূষণ ও জীবিকা সৃষ্টি করেছেন সেগুলি কে হারাম করেছে ?

يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰئِثَ - (الاعراف : ١٥٧)

"(রাসূল) তাঁদের (উম্মতের) জন্য সব পবিত্র জিনিস হালাল করেন এবং সব অপবিত্র জিনিস হারাম করেন।"

অবশ্যি এই নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা হবে যেক্ষেত্রে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজ্‌মা কোন বস্তুর বৈধতা বা অবৈধতা সম্বন্ধে ফায়সালা দান করার ব্যাপারে নীরব থাকে।

দুই ঃ দু'টি হুকুমের মধ্যে সম্পর্ক বহাল থাকা (التلازم بين الحكمين)

কোন বিশেষ 'ইল্লাত ছাড়াই একটি হুকুমকে অন্য হুকুমের সাথে সম্পর্কিত করা। এর কয়েকটি উদাহরণ নিম্নরূপ ঃ

(ক) যে ব্যক্তি তালাক (طلاق) দিবার অধিকার প্রাপ্ত সে ايلاء (কসম করে কোন নির্দিষ্ট মেয়াদে স্ত্রীর সঙ্গ ত্যাগ করা) করবারও অধিকারী। طلاق এবং ايلاء

-উভয় কর্মের পরিণাম স্ত্রীর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ অথবা সম্পর্ক পুনঃস্থাপন। এদিক থেকে এ দু'টো ইতবিাচক হুকুমের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

(খ) নিয়ত ছাড়া তায়াম্মুম শুদ্ধ নয়। কাজেই অযুও নিয়ত ছাড়া শুদ্ধ হবে না।এ দুটো নেতিবাচক হুকুমের মধ্যে تلازم বা বরাবরের সম্পর্ক হচ্ছে, দুটোই আনুষ্ঠানিক পবিত্রতা অর্জনের জন্য করা হয় এবং কতিপয় অবস্থায় তায়াম্মুম অযুর স্থলাভিষিক্ত হয়।

(গ) ইতিবাচক প্রথম বাক্যটির সাথে নেতিবাচক দ্বিতীয় বাক্যটির تلازم অর্থাৎ বরাবরের সম্পর্ক , যথা ঃ যে বিষয়টি জায়েয, তা নিষিদ্ধ ও হারাম হতে পারে না।

(ঘ) প্রথমটি নেতিবাচক ও দ্বিতীয়টি ইতিবাচক বাক্যের মধ্যে হবে। যেমন, এ পদ্ধতিটি ঃ যা জায়েয নয় তা নিষিদ্ধ। ইমাম মালেক (র) ও ইমাম শাফেয়ী (র) উল্লেখিত যুক্তি প্রয়োগ পদ্ধতিকে যথেষ্ট কাজে লাগিয়েছেন।

তিন ঃ ইস্‌তিস্‌হাব-এ-হাল

ফকীহদের ভাষায় এর অর্থ হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

ماثبت فى الزمن الماضى فالاصل بقاءه فى المستقبل -

"অতীতে যা প্রমাণিত হয়েছিল, (বর্তমানেও) ভবিষ্যতে তাকে স্থিত রাখাই নীতি।"[১৮১]

অন্য একটি বাক্য হচ্ছে ঃ

حكم بقاء امر محقق لم يظن عدمه -

"বাস্তবে প্রমাণিত (محقق) ও স্বীকৃত ব্যাপারের স্থিতির হুকুম দেয়া যতদিন পর্যন্ত তার অনস্তিত্বের (عدم) ধারণা না পাওয়া যায়।"[১৮২]

যেমন ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, মূত্রনালী ও মলদ্বার ছাড়া অন্য কোথাও দিয়ে যদি কিছু বের হয় তাতে অযু ভাঙে না। ঐ দুই দ্বার দিয়ে যতক্ষণ আবার কিছু বের হয়ে অযুর অস্তিত্ব লোপ না করবে ততক্ষণ অযু থাকবে, যেমন এর পূর্বে ছিল (অবশ্য অন্য কোন কারণে অজু নষ্ট হবার কথা স্বতন্ত্র)।

ধরা যাক, এক ব্যক্তি উধাও হয়ে গেছে এবং তার কোন খবরই নেই। ইমাম শাফেয়ী (র) তার মৃত্যুর ব্যাপারটি প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তার সমস্ত শার'ঈ দায়-দায়িত্বের ব্যাপারে তাকে জীবিতরূপে গণ্য করতে থাকবেন। এ কারণে তার বিষয় সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করা জায়েয হবে না। উপরন্তু সে যার উত্তরাধিকারী হতে পারে, এমন কোন ব্যক্তি যদি মারা যায় তাহলে সে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না। অন্যদিকে ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, তার সম্পত্তি

---

১৮১. হুসুলুল মামুল মিন ইলামিল উসূল, ৯৬ পৃষ্ঠা।

১৮২. আল-আশ্‌বাহ্‌ ওয়ান নাযা-ইর।

উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা হবে না ঠিকই; কিন্তু অপরের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তার অধিকার জন্মাবেনা। কারণ, তাঁর মতে, তাকে জীবিত বলে গণ্য করবার যুক্তি তার বর্তমান অধিকারসমূহের সংরক্ষণের সীমা পর্যন্ত কার্যকর হবে। কিন্তু নতুন অধিকার সৃষ্টির ব্যাপারে কার্যকর হবে না। ফকীহ্‌দের পরিভাষায় প্রথমটিকে বলা হয়- حجة دافعة অর্থাৎ সংরক্ষণমূলক যুক্তি এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে حجة موجبة অর্থাৎ (নতুন অধিকার) সৃষ্টিমূলক যুক্তি।

চার ঃ ইস্‌তিদ্‌লালের পদ্ধতি

ইস্‌তিক্‌রা (اِسْتِقْرَاء = inductive method)-এর ভিত্তিতে দলীলের অনুসন্ধান করা হয়। اِسْتِقْرَاء দুই প্রকার ঃ

(ক) اِسْتِقْرَاء تام অর্থাৎ পূর্ণ ইস্‌তিকরা যথা "পানি নিম্নগামী" এই কুল্লী (كلى = ব্যাপক) হুকুমটিতে উপনীত হবার জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার পানির পরীক্ষা করা হয়েছে এবং পানির প্রত্যেকটি বিন্দু (جزئيات = অংশসমূহ) সাক্ষ্য দিয়েছে যে পানির ধর্ম নিম্নগামী হওয়া। তদ্রূপ, ফকীহ্‌গণ শরী'আতের বিধান উদ্ভাবনের ব্যাপারে দলীল অনুসন্ধানের (استدلال) ব্যাপারে ইস্‌তিকরা-এ-তাম্‌ম এর পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন।

(খ) অসম্পূর্ণ ইস্‌তিক্‌রা (اِسْتِقْرَاء ناقص) ঃ যেমন, ইমাম শাফেঈ (র) বলেন, বিতরের (وتر) নামায ওয়াজিব নয়, কারণ সওয়ারী জন্তুর পিঠে চড়ে বিতর নামায পড়া যেতে পারে। আর সওয়ারী অবস্থায় যেসব নামায আদায় হয়ে যায় সেগুলি ওয়াজিব হবে না।

১. লঘুতম হুকুমটি গ্রহণ করা যখন অন্য কোন স্পষ্ট দলীল না পাওয়া যায়- এটিও ইস্‌তিদ্‌লালের একটি পন্থা। মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিক আহ্‌ল-ই কিতাব (ইয়াহুদী ও খৃষ্টান)-এর কত্‌ল-এর শোণিতপণ (دية)-এর পরিমাণ সম্বন্ধে মতভেদ রয়েছে। কোন কোন ফকীহের মতে তা হবে মুসলিমের শোণিতপণের এক-তৃতীয়াংশ। ইমাম মালেক (র)-এর মতে অর্ধাংশ। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, আহ্‌ল-ই-কিতাবের দিয়াত মুসলিমের দিয়াতের সমান। এই তিন মতের মধ্যে ইমাম শাফেঈ (র) লঘুতম তথা এক তৃতীয়াংশ দিয়াতের পক্ষে মত ব্যক্ত করেন। কারণ অধিকাংশ ফকীহের মতে এহেন যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থাপন পদ্ধতি প্রমাণিত নয়।

২. কোন কোন ফকীহ অপূর্ণাংগ তথা দুর্বল ইল্লাতের ভিত্তিতে বিধান দিয়েছেন। জনন্দ্রিয়ে হাত লাগলে অযু নষ্ট হবে বলে মত দিয়েছেন, কারণ প্রসাবের পর জননেন্দ্রিয়ে হাত দিয়ে ইস্‌তিনজা (استنجاء = পবিত্রতা সাধন) করার পর অযু

করতে হয়। তিনি 'হাত লাগা'-কে ইল্লাত ধরে প্রথম অবস্থায় কিয়াস করেছেন দ্বিতীয় অবস্থার ওপর। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে জননেন্দ্রিয়ে হাত লাগলে অযু ছুটে যাবে না।

৩. দুটো সদৃশ অবস্থায় হুকুমের বৈপরীত্য দেখা গেলে ইস্‌তিদ্‌লালের পদ্ধতি কি হবে? ধরুন আমি বললাম ঃ قرأت الكتاب من اوله الى اخره অর্থাৎ আমি কিতাবটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েছি। الى (পর্যন্ত) শব্দের তাৎপর্য কিতাবের শেষ অংশও আমার কিরাআত (পড়া قراءة)-এর মধ্যে শামিল ছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌র এই আদেশ ثُمَّ اَتِمُّوْا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ অর্থাৎ তারপর তোমরা রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করো। এতে রাত রোযার অন্তর্ভুক্ত নয়। এই দুটি বিপরীত হুকুমের কোন্‌টির সাথে তুল্য হবে আল্লাহ্‌র নিম্নোক্ত হুকুমটি ?

وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ -

অর্থাৎ (তোমরা যখন নামাযের জন্য উদ্যত হও তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ধুয়ে নাও) এবং "তোমাদের হাত কনুই পর্যন্ত ধুয়ে ফেলো।" প্রশ্নহলো কনুই (مرافق) ধোয়া (غسل)-এর মধ্যে শামিল হবে কি না? الى الليل -এর সাথে তুলনা করলে الى المرافق বলতে কনুই শামিল হয় না। যদি বলেন হয়, তা হবে সন্দেহের ভিত্তিতে অথচ সন্দেহের ভিত্তিতে শরী'আতের কোন হুকুম প্রমাণিত হয় না। তাই কনুই 'ধোয়ার' মধ্যে শামিল হবে না। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র) এই প্রমাণ উপস্থাপনা (ইস্‌তিদ্‌লাল) পদ্ধতিটি মানেন না। তাঁর মতে কনুই ধোয়া একান্ত জরুরী, নচেৎ অযু হবে না

তা'দীল (تعديل) পদ্ধতিতে ইস্‌তিদ্‌লাল

তা'দীল মানে স্থাপন করা। এর পূর্বে আলোচিত হয়েছে, অবস্থা ও কালের পরিবর্তনের সাথে কোন কোন বিধানের পরিবর্তন ঘটে; যদি পূর্বে বিধানটি কালের প্রেক্ষিতে দেয়া হয়ে থাকে।

কিয়াসের পর্যায়ে ফকীহ্‌গণ দুইটি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেন; একটি হচ্ছে তা'আদোল (تعادل) অপরটি তারজীহ (ترجيح) যুক্তি প্রমাণের মধ্যে সংঘাতের (تعارض) ক্ষেত্রে অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে দুই দলীল দুই বিপরীত হুকুম নির্দেশ করে, সে ক্ষেত্রে যদি দলীলদ্বয়ের গুরুত্ব এবং শক্তি (تعادل) হয় তখন গবেষণার সাহায্যে একটিকে অপরটির ওপর প্রাধান্য বা অগ্রাধিকার (ترجيح) দিয়ে সংঘাত দূর করতে হবে।

কুরআন মজীদে বৈপরীত্য (تعارض) বা দুটো বিপরীত হুকুমের গুরুত্ব সমান হওয়া (تعادل) এমন কোন প্রশ্নই ওঠেনা। তবুও যদি ধরা যায় এ রকম পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে, তবে তার সমাধান দুষ্কর নয়। বিপরীতার্থক দুটো আয়াতের অবতরণ

কাল, শান-ই-নুযূল, হাদীসে তাদের ব্যাখ্যা ইত্যাদির সাহায্যে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। দুইটা হাদীসের মধ্যে تعارض দেখা দিলে তার সমাধান হয়ে যায় দিরায়েত (دراية) -এর মাধ্যমে অর্থাৎ হাদীসের পাঠ (متن) এবং সনদ (سند = বর্ণনাকারী পরম্পরা) পরীক্ষা করে হাদীসদ্বয়ের তুলনামূলক শক্তি নির্ধারণ করার মাধ্যম। এমনি দুটো ইজমা ভিত্তিক বিধানের বৈপরীত্য দূর করা যায় কাল, পাত্র, অবস্থা ইত্যাদি প্রণিধানের মাধ্যমে। আসলে সত্যিকারের تعارض দেখা দেয় কিয়াসী ফায়সালার মধ্যে যখন একটিকে অপরটির ওপর ترجيح বা প্রধান্য দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। এইরূপে تعارض এর ক্ষেত্রে যে নীতি ফকীহ্‌গণ অবলম্বন করেন তার কিছু উদাহরণ দেয়া গেল ঃ

১. কিয়াস এবং ইসতিহসান এর মধ্যে তা'আরোদ হলে ইসতিহসানকে শ্রেয় গণ্য করা হবে। কারণ اثر। অর্থাৎ পরিণামের বিবেচনায় ইসতিহসান ভিত্তিক হুকুমটি অধিকতর শক্তিশালী হবে। ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

২. قوت ثبات -এর বিবেচনায় এক হুকুমকে অন্যটির উপর তারজীহ দেয়া হবে। উদাহরণ ঃ রমযানুল মুবারকের দিনগুলিতে কেউ নিয়্যত করার বেলায় বলল, "আমি আগামী কালের রোযার নিয়্যত করলাম;" কিন্তু নির্দিষ্ট করে রমযানের রোযার কথা উল্লেখ করলোনা। ইমাম শাফেঈ (র)-এর মতে রমযানের রোযার কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। তার কিয়াসের ভিত্তি (علة) হচ্ছে فريضة অর্থাৎ রমযানের রোযার ফরয (فرض = আবশ্যকীয়) হওয়া। তিনি কিয়াস করছেন এইভাবে ঃ যেহেতু রমযানের ফরয রোযা قضاء করবার ক্ষেত্রে নিয়্যত নির্দিষ্ট করে রমযানের কথা বলতে হবে, সুতরাং রমযানের মাসে اداء এর বেলায়ও তা নির্দিষ্টভাবে বলতে হবে। বিপরীত মত হচ্ছে নিয়্যতে রমযানের উল্লেখ না করলেও রমযানে আদায়কৃত রোযা শুদ্ধ হবে, কারণ আল্লাহ্‌ খোদ ফরয রোযার জন্য রমযানুল মুবারককে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এই মতে এই মাসের আগমনই রোযা ফরয হওয়ার ইল্লত। এই রোযার সাথে فرضية -এর যা সম্পর্ক তার চাইতে অধিকতর শক্তিশালী এবং অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক হচ্ছে রমযান মাসের। সুতরাং ইল্লাতের অধিকতর শক্তি (قوت ثبات)-এর বিবেচনায় দ্বিতীয় রায় বা কিয়াসকে তারজীহ দেওয়া হবে।

৩. مقيس عليه (যার সাদৃশ্যের ভিত্তিতে কিয়াস করা হয়) এর সংখ্যাধিকাক্যের ভিত্তিতে ترجيح দেওয়া হবে। যথা অযু করবার বেলায় মাথা মাস্‌হ (مسح) একবার করলে চলে, তিনবার মাসহ করা সুন্নত নয়। যেমন ১. তায়াম্মুম-এ, ২. ক্ষতস্থানের উপর বাঁধা পট্টিতে এবং (৩) চামড়ার তৈরী মোজার উপর তিনবার মাসহ সুন্নত নয়। তিনটি নযীরের ভিত্তিতে বিধান দেয়া গেল, অযুতে মাথা একবার মাসহ করলে চলবে– তিনবার সুন্নত নয়। ইমাম শাফেঈ (র) বলেন,

তিনবার মাসহ করা সুন্নত। তিনি একে গোস্‌ল (غسل = ধোয়ার) উপর কিয়াস করেন এবং বলেন, প্রত্যংগগুলি যেমন তিনবার ধোয়া সুন্নাত, তেমনি মাসহও তিনবার করা সুন্নাত। অথচ তাঁর মাকীস আলাইহ (নযীর বা সদৃশ্য) শুধু একটি তথা غسل

৪. ইল্লাতের উপস্থিতিতে হুকুম প্রতিষ্ঠিত হবে, অনুপস্থিতিতে হবে না– এমন কিয়াস পরিত্যক্ত হবে। উদাহরণ ঃ ইমাম শাফেঈ (র)-এর মতে যেহেতু অযুর চারটি ফরযের মধ্যে মাথা মাসহ অন্যতম ফরয (ركن) সুতরাং এতে তাক্‌রার (تكرار) অর্থাৎ একাধিক মাস্‌হ সুন্নত। তিনি ركن হওয়াকে ইল্লাতরূপে গণ্য করে তাক্‌রার-এর বিধান দিলেন। কিন্তু এর বিকল্প কিয়াসও কি শুদ্ধ হবে? যেমন নাক পরিষ্কার করা, কুল্লী করা, এ দুইটি রুকন নয়, তাহলে এ দুই কর্মে তাকরার সুন্নত হবে না? অর্থাৎ علة -এর অনুপস্থিতিতে حكم ও অনুপস্থিত (عدم علة عدم حكم) থাকবে? একবার নাক পরিষ্কার করলে বা একটি মাত্র কুল্লী করলে চলবে? না, চলবে না– কারণ এ কিয়াসটি একটি ভ্রান্ত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

৫. তারজীহ্‌-এর বেলায় ذات প্রধান্য লাভ করবে وصف-এর ওপর। উদাহরণ ঃ

এক. এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির ছাগল ছিনিয়ে নিয়ে যবাহ করে রান্না করে ফেললো। এ অবস্থায় ছাগলের সত্তা (ذات) লোপ পেল এবং তার উপর অধিকার রহিত হয়ে গেল। সুতরাং ছিনতাকারীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কিন্তু রান্না করা গোশ্‌ত [যা ছিনতাই কারীর অপকর্মের মাধ্যমে আদত ছাগল (ذات) টির একটি وصف (বিশেষ অবস্থা) পরিণত হয়েছে] ছিনতাইকারীর কাছে থেকে যাবে। ইমাম শাফেঈ (র)-এর মতে যেহেতু আদত ছাগলটির পরিবর্তিত রূপ তার ذات(সত্তা)-এর সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে এবং এই ذات-এর সাথে মালিকের মালিকানার সম্পর্ক স্থিত হয়, সুতরাং মালিক রান্না করা গোশ্‌ত এবং ক্ষতিপূরণ– দুই-ই পাবে। তিনি মনে করেন, ছাগলটির সাথে মালিকের মালিকানা অবিচ্ছেদ্য– সর্বাবস্থায় তা স্থিত থাকবে। ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ছিনতাইকারীকে– এ মত উভয় পক্ষের, রইলো বাকি রান্না করা গোশতের মালিকানা সম্পর্কে কোন্‌ মতটি তারজীহযোগ্য বিবেচিত হবে? উত্তর ঃ যে মতটি ذات-এর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত وصف-এর ভিত্তিতে নয়, তাই তারজীহ বা অগ্রাধিকার পাবে। ذات বিলুপ্ত বলে তদস্থলে ক্ষতিপূরণ বিধেয়।[১৮৩]

দুই. কিয়াসের মধ্যে تعارض বা বিরোধ দেখা দিলে কোন নীতিতে একটিকে শ্রেয় এবং অপরটিকে বর্জনযোগ্য গণ্য করতে হবে– এ সম্বন্ধে ফকীগণ যেসব মানদণ্ড স্থির করেছেন, তার কয়েকটি উদাহরণ উপরে দেওয়া হলো। উসূল-এ-ফিক্‌হের কিতাবে আরো কিছু মানদণ্ডের উল্লেখ রয়েছে।

---

১৮৩. ছিনতাই অপরাধের শাস্তির প্রশ্ন স্বতন্ত্র, আমাদের আলোচনার আওতাধীন নয়।

অষ্টম উৎস ঃ পূর্ববর্তী শরী'আত

উৎস হিসাবে পূর্ববর্তী শরী'আত

ইসলামী ফিক্‌হের অষ্টম উৎস হচ্ছে পূর্ববর্তী শরী'আত। আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত যে সমস্ত পথ ও পদ্ধতি অন্যান্য উম্মতের কাছে সংরক্ষিত ছিল বা কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার ওপর 'আমল করেছিলেন। আসলে আল্লাহ্‌র মনোনীত জীবন ব্যবস্থা ইসলাম মূলত এক ও অভিন্ন। আদর্শ ও মৌল নীতির ব্যাপারে কোন পার্থক্য নেই, হবে না। ব্যবহারিক জীবন ব্যবস্থাতে স্থান-কাল-পাত্রের পার্থক্যের কারণে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী নবীদের শরী'আতে কিছু প্রভেদ হওয়া স্বাভাবিক এবং আল্লাহ্‌র হিকমতের অনুকূল। তবে পূর্ববর্তী নবীদের উম্মত অনেক ক্ষেত্রে তাদের নবীর শিক্ষা অবিকৃত রাখতে পারেনি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার রেকর্ডও লুপ্ত হয়েছে। যা অবিকৃত আছে, যার বিবরণ পাওয়া যায় কুরআন মজীদে, হাদীসে এবং পূর্ববর্তী উম্মতের জীবনে, তা অনুসরণ করতে আমরা আদিষ্ট। এই কারণে পূর্ববর্তী শরী'আত ইসলামী ফিক্‌হের অন্যতম উৎস।

কুরআন হাকীমে এর প্রমাণ

আম্বিয়ায়ে কিরাম (সা)-এর নামধাম ও তাদের হিদায়াতের মূল বিষয়ের বর্ণনা প্রসংগে কুরআন মজীদে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হুকুম দেওয়া হয়েছে ঃ

أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰهُمُ اقْتَدِهِ ـ (الانعام : ٩١)

"এদেরকে আল্লাহ্ হিদায়াত দান করেছিলেন, তুমি তাদের হিদায়াতের অনুসরণ করো।"

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَاوَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَاتَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ـ

"আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সেই 'দীন'টিই বিধিবদ্ধ করেছেন, যার অসিয়ত তিনি নূহকে করেছিলেন এবং ওহী (যোগে আদেশ) তোমাকেও দিয়েছি এবং যা অনুসরণের অসিয়্যত করেছিলেন ঈসা (আ)-কেও (বলেছিলেন) তোমরা, সেই দীনকে প্রতিষ্ঠিত রাখো এবং তার ব্যাপারে (নানা দলে) বিভক্ত হয়ে যেয়ো না। (আশ্‌শূরা ঃ ১৩)

নিম্নোক্ত আয়াতে ইবরাহীমী মিল্লাতের অনুসরণ করার হুকুম দেয়া হয়েছে ঃ

ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا ـ (النحل : ١٢٣)

"তারপর আমি তোমার কাছে অহী পাঠিয়ে আদেশ করলাম, তুমি ইবরাহীমের মিল্লাত অনুসরণ করো স্থির লক্ষ্যে একাগ্র হয়ে।"

বস্তুত কুরআন মজীদে পূর্ববর্তী শরী'আতের বহু আহকামের উল্লেখ রয়েছে।

রাসূল (সা)-এর কর্মপদ্ধতি

"যদি কোন বিষয়ে সরাসরি অহী নাযিল না হতো তাহলে তিনি [রাসূল (সা)] আহলি কিতাব (ইয়াহুদী ও নাসারা)-এর রীতি-পদ্ধতির অনুসরণ পছন্দ করতেন।"

মুসনাদে ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র)-এর নিম্নোক্ত একটি হাদীসে যা বলা হয়েছে তা থেকে বোঝা যায়, কেবল আহলি কিতাব-এর নয়, বরং জাহেলী যুগের যে কোন ভালো ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে ঃ

يعمل فى الاسلام بفضائل الجاهلية ـ

"জাহেলী যুগের ভালো ভালো ব্যবস্থার ওপর ইসলামে আমল করা যায়।"[১৮৪]

এরি ভিত্তিতে মুহাদ্দিসগণ বলেছেন ঃ

وان شرع من قبلنا يلزمنا مالم ينقض الله بالانكار ـ

"পূর্ববর্তী শরী'আতগুলির ওপর আমল করা আবশ্যক যদি আল্লাহ্ নিন্দা প্রকাশে তাকে নাকচ না করেন।"[১৮৫]

এ সম্বন্ধে ফকীহ্‌গণের মন্তব্যের সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

আল্লাহ্‌র বান্দাদের মাসলাহাত বা কল্যাণ যাতে নিহিত রয়েছে তা এক প্রকার যেমন থাকতে পারে, ভিন্নতরও হতে পারে। কোন নবীর আমলে যা ভালো, পরবর্তী নবীর আমলে তা মন্দ হতে পারে। সুতরাং তাদের শরী'আতে ঐক্য এবং পার্থক্য থাকতে পারে। আসল কথা হচ্ছে বান্দাদের কল্যাণ, যা যুগের পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয়।

ইসলামী ফিকাহ কি অন্যান্য ধর্মীয় আইন থেকে গৃহীত ?

তবে কিছু কিছু সাদৃশ্য এমন পর্যায়ের অবশ্যি পাওয়া যায়, যা থেকে সন্দেহ জাগে, সম্ভবত ফকীহগণ আল্লাহ্‌র হিকমত ও মূলনীতির আওতাধীনে কোথাও

---

১৮৪. মুসনাদে ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল, ৩য় খণ্ড।

১৮৫. আইনী, ৩য় খণ্ড, কিতাবুল তাহকীক, ২০১ পৃষ্ঠা।

কোথাও আংশিক ফায়দা হাসিল করেছেন। কিন্তু এই ধরনের একেবারেই হাল্‌কা সাদৃশ্য নিশ্চিত বিশ্বাস অর্জনের জন্য যথেষ্ট নয়। কাজেই এই প্রসংগে সাধারণভাবে তিনটি ধর্মের আইন শাস্ত্রের প্রভাব প্রবণতার কথা আলোচনা করা যেতে পারে।

১.পার্সী ধর্ম।

২. খৃষ্ট ধর্ম।

৩. ইহুদী ধর্ম।

এক. পার্সী আইন শাস্ত্র ও ইসলামী ফিকাহর মধ্যে কোন প্রকার সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য এখনো প্রমাণিত হয়নি। দু চারটি কথা উভয়ের মধ্যে একই রকম (যেমন নামায, মিসওয়াক ইত্যাদি) পাওয়া যাওয়া কোন প্রভাবের প্রমাণ হতে পারে না। বরং গবেষকদের মতে; ইসলামী ফিকাহ প্রণয়নের যুগে পার্সীদের ধর্মীয় আইনের কোন শৃংখলাবদ্ধ ও বিন্যস্ত রূপই ছিল না।

দুই. খৃষ্টধর্মে দীন ও দুনিয়ার পৃথক অবস্থানের কারণে ইসলামের সাথে তার পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। খৃষ্টধর্মে ধর্মীয় বিধান ও আইনের পরিমাণ অতি অল্প ও সীমিত। জীবনের অতি সাধারণ অংশেও তার বিচরণ নেই। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে পোপের মাঝেমধ্যে ঘোষিত বিধানের ভিত্তিতে তা রচিত। বলপ্রয়োগ ইত্যাদি সংক্রান্ত আইনের ক্ষেত্রে তার সাথে সাদৃশ্য ইসলামী ফিকাহর প্রভাব গ্রহণের কথা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট নয়। তবে সিরিয়া ইত্যাদি দেশে (যেখানে খৃষ্টীয় রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল) গীর্জার আইন যে ইসলামী ফিকাহর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, এ কথার সপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

তিন. ইয়াহুদী ধর্মের বিভিন্ন বিধানের সাথে ইসলামী ফিকাহর সাদৃশ্যের কথা অবশ্যি বলা হয়ে থাকে। যেমন তালমূদে[১৮৬] (ইয়াহুদী ফিকাহ) খৃষ্টধর্মের মত ইবাদত ও আইনের মধ্যে পার্থক্য করা হয়নি। বরং ধর্মীয় আইন উভয়ের অন্তর্ভুক্ত।

---

১৮৬. তালমূদ বলতে 'মুসানা' ও তার ব্যাখ্যা 'গুমারাহ' এর সমষ্টিকে বুঝানো হয়েছ। তাওরাত বা হযরত মূসা (আ)-এর শিক্ষাবলীর যে বর্ণনা বিগত খৃষ্টীয় ২য় শতকের শেষের দিকে ইয়াহুদীদের মধ্যে পাওয়া যেত, তার সমষ্টিকে মুসান্না বলা হয়। এতে রয়েছে পাঁচটি অধ্যায় ঃ

(ক) সারাইম ঃ নামায ও ইবাদত এবং কৃষি ও অর্থ ব্যবস্থা (যাকাত)।

(খ) অঙ্গীকারকৃত শনিবার ঃ ঈদের দিনগুলি, রোযার বিধানসমূহ (নাশীম দাম্পত্য আইন)।

(গ) কালসীম ঃ কুরবানী ও পানাহারের বিধান।

(ঘ) তাহওয়ারাত ঃ পাক ও নাপাকের বিধান।

(ঙ) তামকীন ঃ দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন।

(১) 'তালমূদে জেরুসালেম' প্রায় খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে লিখিত হয়।

(২) 'তালমূদে বাবেল, এর চেয়েও বৃহদাকার এবং খৃষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে লেখা হয়।

আল্লাহ্‌র অহী এসবের উৎস। তাছাড়া ইসলামী ফিকাহর ন্যায় বিভিন্ন বিষয়ের চুলচেরা বিশ্লেষণের প্রবণতাও সেখানে রয়েছে। নতুন নতুন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ইজতিহাদের ভূমিকাও স্বীকৃত। এছাড়া আরো বিভিন্ন খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও সাদৃশ্য বর্ণনা করা হয়। যেমন, তালমূদের কতিপয় বিধান ফিকাহর সাথে সামঞ্জস্য রাখে। সেগুলি নিম্নরূপ ঃ

১. যদি কোন ব্যক্তি পথ চলার সময় রুটি ইত্যাদি খাদ্যবস্তুর টুকরা পথে পড়ে থাকতে দেখে তাহলে তা যেন পায়ের তলায় পিষ্ট না করে একদিকে সরিয়ে দেয়। (২য় খণ্ড, ১৬০ পৃষ্ঠা)।

২, কাফ্‌ফারার দিনের রোযা রাখার জন্য শিশুকে যেন বাধ্য না করা হয় এবং নির্দিষ্ট বয়স থেকে দু-এক বছর আগে থেকে তাদেরকে এতে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে।

৩. এভাবে তালমূদের বিভিন্ন স্থানে অর্ধস্বাধীন ও দাসদের তালাকের কথা পাওয়া যায়।

৪. তালমূদে (৯ খণ্ড, ৫৪ পৃ.) অর্থ-সম্পদের বিনিময়ে তালাকের কথা বলা হয়েছে।

৫. লোক্‌তা (কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস) সম্পর্কে বিধান (১ম খণ্ড, ৮৫ পৃষ্ঠা) রয়েছে।

৬. যারা সুদের ভিত্তিতে টাকা ঋণ দেয়, পাশা খেলে এবং বাজী রেখে কবুতর উড়ায় তাদের বিচারক হবার ও সাক্ষ্য দেবার যোগ্যতা খতম হয়ে যায়। (১ম খণ্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা)।

৭. মেয়েদের অধিকার ও খোরপোশের বিধান বিস্তারিতভাবে ৮ম, খণ্ডের ৮০ পৃষ্ঠায় আলোচিত হয়েছে।[১৮৭]

সমস্ত ইলহামী ধর্ম ও শরীয়তের মধ্যে আংশিক সাদৃশ্য অপরিহার্য

ওহীর মাধ্যমে প্রবর্তিত শরী'আতসমূহের মধ্যে সাদৃশ্য থাকা স্বাভাবিক। কারণ, প্রত্যাদিষ্ট শরীআতগুলি একই গাছের শাখা-প্রশাখার সাথে তুলনীয়, একই উৎসমূল থেকে উৎসারিত। এগুলির পত্তনকারী খোদ আল্লাহ্‌ জাল্লা শানুহু এবং প্রবর্তনকারীরা হচ্ছেন তাঁরই মনোনীত পূত-পবিত্র আম্বিয়া (আ)। সুতরাং শরী'আতে ইসলামের সাথে পূর্ববর্তী নবীদের শরী'আতের কতেক আহকামের প্রকৃতিগত মিল থাকবেই। কালের প্রবাহে পূর্ববর্তী শরী'আতাদি বিলুপ্ত এবং যা বিদ্যমান, নানা বিকৃতি তাকে

---

১৮৭. শো'আবুল ঈমান, মিশকাত, ২৮ পৃষ্ঠা।

আচ্ছন্ন করেছে। সুতরাং তার নির্বিচার অনুকরণ নিষিদ্ধ। উল্লেখ্য, ইসলাম মূলত এক, মানব জন্মের শুরু থেকে ইসলামই আল্লাহ্‌র মনোনীত দীন। সুতরাং ইসলামপূর্ব বা ইসলামোত্তর কথা দু'টো আসলে common mistake -এর রূপ নিয়েছে। সব নবী-রাসূল ইসলাম প্রচার করেছিলেন–মুহাম্মদ (সা) ইসলামের আদি প্রচারক নন। তবে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা বিভিন্ন নবী বিভিন্ন সময়ে যা প্রবর্তন করেছিলেন তাতে পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক এবং বাস্তবে ছিলও।

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ـ (المائدة : ٤٨)

গায়র ইসলামী রীতি অনুকরণের ব্যাপারে ইসলামী নীতি

হযরত উমর (রা) একবার ইয়াহুদীদের কিছু রীতি বা কর্মধারা অনুসরণ করতে চাইলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন ঃ

أمُتَهَوِّكُوْنَ اَنْتُمْ كَمَا تَهَوَّكَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَنَقِيةً وَلَوْ كَانَ مُوْسٰى حَيًّا مَاوَسِعَه اِلاَّ اتِّبَاعِىْ ـ[১]

"তোমরা কি হতভম্ব, বিভ্রান্ত হয়ে গেলে (অর্থাৎ নিজেদের দীন ও কিতাবের ব্যাপারে নিঃসংশয় হতে পারলে না), যেমন ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা বিভ্রান্ত হয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ? আমি তোমাদের কাছে সুশুভ্র নির্মল শরী'আত নিয়ে এসেছি (যা সব রকম সংশয়, সন্দেহ ও ত্রুটিমুক্ত)। আজ যদি মূসা (আ) জীবিত থাকতেন তাহলে আমার অনুসরণ ছাড়া তাঁর গত্যন্তর থাকতো না।"[১৮৮]

একবার হযরত উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে এসে তওরাতের একটি অনুলিপি নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। রাগে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পবিত্র চেহারার রং পরিবর্তিত হতে থাকলো। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চেহারার উপর উমর (রা)-এর দৃষ্টি পড়ার সাথে সাথে তিনি বললেন ঃ

اعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ـ

"আমি আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের ক্রোধ থেকে আল্লাহ্‌র পানাহ চাচ্ছি। আল্লাহ্‌ আমাদের প্রতিপালক, ইসলাম আমাদের দীন এবং মুহাম্মদ আমাদের নবী–এতেই আমরা সন্তুষ্ট (আমরা ধন্য। আর কোন দিকে তাকাবার প্রয়োজন নেই)।

---

১৮৮. বরাত ও বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন। "ফিকাহর বিন্যাস ও তার সূচনা" নিবন্ধটি। মূল ফরাসী ভাষায়, অনুবাদ করেছেন ডঃ হামীদুল্লাহ্‌ মাসিক 'মাআরিফ', মার্চ ও এপ্রিল ১৯৫৮ সংখ্যা।

উমর (রা)-এর এই আত্মসমর্পণমূলক উক্তি শ্রবণ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

والذى نفسُ محمد بيده لو بدء لكم موسى فاتبعتموه وتركتمونى لضللتم عن سواء السبيل ولو كان حيا وادرك نبوتى لاتبعنى -

"সেই সত্তার কসম যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, যদি মূসা তোমাদের কাছে আবির্ভূত হতো এবং তোমরা আমাকে ত্যাগ করে তাঁর আনুগত্য করতে তাহলে তোমরা সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যেতে। আর যদি তিনি জীবিত থাকতেন এবং আমার নুবূওয়াতের সময়ের নাগাল পেতেন তাহলে তিনি আমারই আনুগত্য করতেন।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, হযরত (সা) ইয়াহুদীদের সব কিছুর ওপর ঢালাও নিষেধাজ্ঞা জারী করলেন। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, কোন কোন ব্যাপারে ওহী না পেলে রাসূল (সা) নিজে আহলে কিতাবের অনুসরণ পছন্দ করতেন। সুতরাং নিষেধাজ্ঞা ব্যাপক হতে পারে না। অন্যপক্ষে ইয়াহুদী যাজকগণ নিজেদের খেয়ালখুশি মতন বা কোন স্বার্থের বশে তওরাতের বহু অনুশাসনকে বিকৃত করে ফেলেছিল। তার প্রমাণ মিলে বাইবেলের New Testament-এর Gospel চতুষ্টয়ে। ঈসা (আ) এই জন্য য়াহুদী যাজকগণকে প্রকাশ্যে বহুবার তিরষ্কার করেছিলেন, যে কারণে তারা হযরত ঈসা (আ)-এর প্রাণ নাশের পরিকল্পনা করেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সময় পর্যন্ত এসে তাওরাত তার আসল রূপ হারিয়ে ফেলেছিল। এমতাবস্থায় তাওরাত পাঠ বা তার কোন অনুশাসন পছন্দ করার অনুমতি দানের ফল বিষময় হতে পারতো। ইসলামের সেই প্রাথমিক যুগে অন্য ধর্মের নির্বিচার অনুকরণ ইসলামের স্বকীয়তা রক্ষার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারতো। স্বয়ং রাসূল (সা) য়াহুদীদেরকে বলেছেলেন ঃ فَأْتُوْا بِالتَّوْرَاةِ فَتْلُوْهَا (আন দেখি তাওরাত, পড়ে আমাকে শোনাও ত দেখি); দেখি, অভিজাত ব্যভিচার করলে তাকে এমন লঘু দণ্ড দানের ব্যবস্থা তওরাতে আছে নাকি। দেখা গেল, ব্যভিচারের শাস্তি অভিজাত নির্বিশেষে সমভাবে رجم অর্থাৎ প্রস্তর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা তওরাতেও রয়েছে। তিনি তদনুসারে রায় দিলেন।

রাসূল (সা) নিজে তওরাতের কোন উৎক্ষিপ্ত অনুশাসনকে যথার্থ বলে স্বীকার করলেও তাতে কোন ভয়ের কারণ ছিল না। কারণ তিনি ভুল করলে অগৌণে আল্লাহ্ তাঁর ভুল সংশোধন করবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। সুতরাং রাসূল (সা) ছিলেন মাহ্‌ফুয (محفوظ) অর্থাৎ (ভ্রম প্রমাদ থেকে) সংরক্ষিত। প্রথম দিকে রাসূল (সা) কবর যিয়ারত নিষেধ করেছিলেন, কারণ উম্মতকে আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাসের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং রাখা। পাছে তারা য়াহুদী এবং খ্রিস্টানদের অনুকরণে কবর পূজায় লিপ্ত হয়–এ আশঙ্কা ছিল নিষেধের পেছনে। পরে তিনি সে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন। অবস্থা ও কালের পরিবর্তনে শরীআতে ইসলামের কোন ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয়েছে বটে, তবে তাদের মধ্যে common element অনেক আছে যা শরীআতে মুহাম্মদী (সা)-র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

নবম উৎস ঃ তা'আমুল (تَعَامُل)

ইসলামী ফিক্‌হের নবম উৎস হচ্ছে 'তা'আমুল' অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণের (রা) আমল বা কর্মের অনুসরণ করা। তাঁদের আমল حجة অর্থাৎ দলীল রূপে স্বীকৃত। ফকীহগণ ফিকহের বিধান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সাহাবা (রা)-এর কর্মকাণ্ড থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন। তাঁরা সাহাবা (রা)-এর কর্মকাণ্ডকে "সুন্নত" (سنة) -এর পর্যায়ভুক্ত করেছেন এবং একে শরীআতের উৎস রূপে ব্যবহার করেছেন।

সাহাবা (রা)-এর মর্যাদা

সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবন থেকে সরাসরি ও হাতে-কলমে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। রাসূল (সা)-এর চিন্তা ও কর্মজীবনকে তাঁরা নিজেদের জীবনে লালিত ও প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর থেকে তাঁরা যা কিছু যেভাবে শুনেছিলেন অথবা তাঁকে যা কিছু যেভাবে করতে দেখেছিলেন হুবহু তাই তাঁরা সেভাবেই নিজেদের জীবনে কার্যকর করেছিলেন। কোথাও সংশয় দেখা দিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করে সংশয় নিরসন করতেন। তাঁদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক সাহাবা আইন সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর পবিত্র বাণীতে তাঁদের ব্যুৎপত্তির সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন।

এ অবস্থায় নুবূওয়াতের প্রকৃতি ও মেযাজ সম্পর্কে তাদের চাইতে বেশি অভিজ্ঞ ও পারদর্শী আর কে হতে পারে ? তাদের রায় ও আমলের মোকাবিলায় অন্য কারো রায় ও আমল গুরুত্ব লাভ করতে পারে না। সামগ্রিকভাবে তাঁদের কথা ও কর্মকে মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করে নিলে শরীআতের কোন মূলনীতির ওপর আঘাত পড়ে না। বরং এটিই নবূওয়াতের উদ্দেশ্যের একান্তই অনুকূল। কারণ এমন একটি জামাআত (جماعة) বা গোষ্ঠী গঠন করার দায়িত্বও নবীর ওপর অর্পিত হয় যে জামাআত নবীর তিরোধানের পর সার্বিকভাবে তাঁর শিক্ষার ধারক, বাহক ও সংরক্ষকের দায়িত্ব পালন এবং তাঁর উদ্দেশ্যকে রূপায়িত করতে সক্ষম হবে। এ কথা সুস্পষ্ট যে, কোন নবীই মানবিক প্রয়োজনের সব কিছু এবং ভবিষ্যতে যা ঘটবে তার সামগ্রিক বিধান দিয়ে যেতে পারেন না। তবে তাঁর বাণী এবং কর্মের মধ্যে নিহিত থাকে এমন কিছু সাধারণ এবং ব্যাপক নীতি, যেগুলির সাহায্যে নতুন নতুন সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। নবীর তিরোধানের পর এই জামাআতই সেই নীতিকে তাঁদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে রূপায়িত করে নবীর দায়িত্বই পালন করে। তাই তাদের ক্রিয়া কলাপ উম্মতের জন্য মানদণ্ডের রূপ লাভ করে। এ কারণে ফকীহগণ সাহাবীগণের তাআমুলকে হুজ্জাত গণ্য করেছেন।

কুরআন ও হাদীসে এর প্রমাণ

ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَالسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ـ (التوبة : ١٠٠)

"মুহাজির ও আনসারেদের মধ্যে যারা অগ্রবর্তী (সর্বপ্রথম ঈমান এনেছে) আর যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, তাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট।"

"رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ" বাক্যাংশ সাহাবায়ে কিরামের কার্যকলাপকে উৎস গণ্য করার ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলীলের মর্যাদা রাখে। বিশেষ করে "رَضُوْا عَنْهُ" আল্লাহ্‌র হিকমতের সাথে তাদের জীবন ধারার একাত্মতা প্রমাণ করে। নিম্নোক্ত হাদীসগুলিও অনুধাবনযোগ্য ঃ

ما من نبى بعثه الله فى امة قبلى الا كان له فى امته حواريون واصحاب ياخذون بسنته ويقتدون يامره ـ

"আমার আগে আল্লাহ্ যে নবীকেই পাঠিয়েছেন তাঁর উম্মতের মধ্যে তাঁর জন্য ছিল সাহায্যকারী (حوارى –কুরআন মজীদে হযরত ঈসা (আ)-এর বারজন বিশ্বস্ত সাহাবী অর্থে ব্যবহৃত) ও সাহাবী। তারা নবীর সুন্নাত অবলম্বন করতো এবং তাঁর হুকুম মেনে চলতো।[১৮৯]

فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوابها وعضوا عليها بالنواجذ ـ

"তোমাদের কর্তব্য আমার সুন্নাত ও সত্য পথগামী হিদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত অনুসরণ করা –এ সুন্নতকে তোমরা আঁকড়ে ধরো, দাঁত দিয়ে তাকে কামড়ে ধরো অর্থাৎ মযবুতভাবে তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো।"[১৯০]

অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ ما انا عليه واصحابى ـ "আমি ও আমার সাহাবারা যে পথে আছি সেটিই সত্য।"[১৯১]

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) একবার বলেন ঃ

اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا افضل هذه الامة ابرّها قلوبا واعمقها علما واقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه

---

১৮৯. মুসলিম, মিশকাত থেকে, ২৬ পৃষ্টা।

১৯০. আবূ দাউদ ও তিরমিযী, نواجذ পেষণদন্ত যা দিয়ে চর্বন করা হয়।

১৯১. তিরমিযী

ولاقامة دينه فاعترفوا لهم فضلهم واتبعوهم على اثرهم وتمسكوا بما استطعتم من اخلاقهم وسيرهم فانهم كانوا على الهدى المستقيم ـ

"এঁরা হচ্ছেন মুহাম্মদ (সা)-এর সাহাবী। এঁরা ছিলেন এ উম্মতের সেরা–হৃদয়ের নিষ্কলুষতায় এবং জ্ঞানের গভীরতায় সবার উপরে, অহমিকায় সবার নিম্নে। আল্লাহ্ তাঁর নবীর সাহচর্য ও তাঁর দীন কায়েম করার জন্য এদেরকে নির্বাচিত করেছিলেন। তোমরা এঁদের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দাও এবং এঁদের পাদংক অনুসরণ কর। এঁদের চরিত্র ও জীবনধারা যতটা পারো মজবুত করে ধরো। এঁরাই সত্য-সঠিক হেদায়াতের পথে ছিলেন।"[১৯২]

সাহাবী (রা)-গণের জীবন সম্বন্ধে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (র)-এর এই মন্তব্যের পর আর কোন সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রয়োজন থাকে না।

ফকীহগণের মত

তাআমুলের ব্যাপারে ফকীহগণের মতামত নিম্নরূপ ঃ

يجب اجماعا فيما شاع فسكتوا مسلمين ولايجب اجماعا فيما ثبت الخلاف بينهم ـ

"যে কথা সাহাবা (রা)-এর মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে অতঃপর যা তাঁরা নীরবে মেনে নেন, তা মেনে চলা ওয়াজিব। আর যে ব্যাপারে কিছু মতবিরোধ থাকে তা মেনে চলা ওয়াজিব নয়।"[১৯৩] সর্বসম্মত মতে এর মানে হচ্ছে, কোন বিরুদ্ধ মত ব্যতীত সাহাবা (রা)-এর যে বিষয়টি ব্যাপকভাবে দেখা যাবে তা হবে ইজমা'র মর্যাদা সম্পন্ন। তাই, সব যুগের ইজমা যখন হুজ্জাত বা দলীলরূপে গণ্য হয়, সাহাবা (রা)-এর ইজমা অধিকতর যৌক্তিকভাবে হুজ্জাত (حجة–দলীল) হবে। দুই শায়খ [(شيخين অর্থে হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা)]-এর ঐকমত্যকে ফকীহগণ মৌলনীতির মর্যাদা দিয়েছেন এবং তা মেনে চলা বাধ্যতামূলক বলে মত প্রদান করেছেন। তাঁরা বলেন ঃ

كُلُّ ماثبث فيه اتفاق الشيخين يجب الاقتداء به ـ

"যে ব্যাপারে দুই শায়খ-এর ঐকমত্য প্রমাণিত হয়েছে তা মেনে চলা ওয়াজিব।"[১৯৪]

এ থেকে প্রমাণ হয়, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে, ব্যক্তিত্ব নির্বাচনের ব্যাপারে সংখ্যার তুলনায় গুণগত মর্যাদা বেশি গ্রহণীয় হয়।

১৯২. রাযীন, মিশকাত থেকে, ২৯ পৃষ্ঠা।

১৯৩. তাওযীহ ও তালবীহ, ২য় খণ্ড, ১৭ পৃষ্ঠা। ১৯৪. ঐ

দশম উৎস ঃ স্বীকৃত ব্যক্তিত্বের অভিমত

ইসলামী ফিক্‌হের দশম উৎস হচ্ছে সর্বজনস্বীকৃত ব্যক্তিদের অভিমত। উক্তি, ফত্‌ওয়া, শালিশী মীমাংসা, আদালতের সিদ্ধান্ত, সরকারী ও বেসরকারী নির্দেশ ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত। তবে সাহাবা (রা)-এর রায়ই শীর্ষস্থানীয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ

اصحابى كالنجوم بِاَيّهِم اقْتديتم اهتديتم -

"আমার সাহাবীরা তারকামণ্ডলীর মত। তাদের মধ্য থেকে তোমরা যার-ই অনুসরণ করবে, হিদায়াত লাভ করবে।"[১৯৫]

ফকীহগণ উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

لان اكثر اقوالهم مسموع حضرة الرسالة وان اجتهدوا فرأيهم اصوب لانهم شاهدوا موارد النصوص ولتقدمهم فى الدين وبركة صحبة النبى صلى الله عليه وسلم وكونهم فى خير القرون -

"তাঁদের (সাহাবীদের) অধিকাংশ উক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে শোনা। যদি তাঁরা ইজতিহাদ করে থাকেন, তাঁদের রায় সব চাইতে যথার্থ, কারণ তাঁরা কুরআন মজীদের অবতরণের কাল প্রত্যক্ষ করেছেন, ইসলাম গ্রহণে তাঁরা ছিলেন অগ্রণী। তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহচর্যের বরকতপ্রাপ্ত। তাঁদের যুগ (generation) ছিল খাইরুল কুরূন (সবচেয়ে সেরা যুগ)।"[১৯৬]

ফকীহদের আরো একটি মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত হল ঃ

لانهم شاهدوا احوال التنزيل واسرار الشريعة -

"কারণ তাঁরা কুরআন মজীদ অবতরণের অবস্থাদি ও শরী'আতের গূঢ় তাৎপর্যাদি প্রত্যক্ষ করেছিলেন।"[১৯৭]

এসব কারণে যদি সাহাবা (রা) নিজেদের মতানুযায়ী কোন কথা বলেন, তাও অন্যদের মতের মোকাবিলায় অনেক বেশি মর্যাদার অধিকারী।

---

১৯৫. রাযীন।

১৯৬. তাওযীহ ও তালবীহ, ২য় খণ্ড।

১৯৭. নূরুল আনওয়ার, ২১৭ পৃষ্ঠা।

একথা সুস্পষ্ট, সব মানুষ সমান নয়। কাজেই সব সাহাবাও সম-পর্যায়ের নয়। তাই আইনগত ব্যাপারে কাদের রায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ হবে, তার ইঙ্গিত রয়েছে ফকীহগণের নিম্নোক্ত বাক্যে ঃ

الذين افنوا اعمارهم فى الصحبة وتخلقوا باخلاقه الشريفة كالخلفاء والازواج المطهرات والعبادلة وانس وحذيفة ومن فى طبقتهم -

"যে সব সাহাবা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহচর্যে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করেছিলেন এবং যাঁরা রাসূল (সা)-এর পরিচ্ছন্ন চরিত্রের রঙে নিজেদের রঞ্জিত করেছিলেন, যেমন খোলাফায়ে রাশেদীন, নবী (সা)-এর পবিত্রা স্ত্রীগণ, চার আবদুল্লাহ [আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা), আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা), আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর (রা), আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা),] আনাস (রা), হুযইফা (রা) এবং আর যাঁরা এই শ্রেণীভুক্ত।"[১৯৮]

সাহাবা (রা)-এর উক্তি সম্পর্কে ফকীহগণের মত হচ্ছে ঃ

قول الصحابى فيما يمكن فيه الرأى يلحق بالسنة لغيره -

যার মধ্যে কিয়াস ও রায়ের অবকাশ রয়েছে এমন বিষয়ে সাহাবা (রা)-এর উক্তি গায়র সাহাবীর জন্য সুন্নাতের পর্যায়ভুক্ত হবে।[১৯৯] অন্য কথায় যে ক্ষেত্রে কিয়াস বা রায়ের অবকাশ নেই, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখ থেকে না শুনলে কিছু বলবার উপায় নেই, সে ক্ষেত্রে তাঁদের অনুসরণ করা ওাজিব।

তাবেঈদের অবস্থান

সাহাবা (রা)-এর পরে তাবেঈ (রা)-গণের মর্যাদ। পূর্বে উদ্ধৃত আয়াতাংশ والذين اتبعوهم باحسان [যাঁরা আন্তরিকতা সহকারে তাঁদের (সাহাবার) অনুসরণ করেন] এবং নিম্নোক্ত হাদীস এর প্রমাণ ঃ

خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم -

"আমার যুগ (generation) সর্বোত্তম যুগ। তারপর পরবর্তীদের (সাহাবীদের) যুগ শ্রেষ্ঠ, তারপর যারা আসবে তাদের (তাবেঈদের) যুগ শ্রেষ্ঠ।"[২০০]

---

১৯৮. শারহে মুসলিম ১৭ পৃষ্ঠা।

১৯৯. শারহে মুসলিম, ৪৭১ পৃষ্ঠা।

২০০. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত থেকে, মানাকিবে সাহাবা অধ্যায়।

এ কারণে ফকীহগণ তাবেঈ (রা)-গণের উক্তি ও মতামত গ্রহণ করেছেন। যে সব তাবেঈর ফত্‌ওয়া সাহাবীগণের যুগে খ্যাতি লাভ করে এবং মুসলিম সমাজে স্বীকৃতি পায়, যেমন কাযী শুরাইহ্, হযরত মাসরূক প্রমুখ তাবেঈ, তাঁদেরকে বিধান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সাহাবী (রা)-এর পর্যায়ভুক্ত গণ্য করেছেন। অন্যান্য তাবেঈর উক্তির মোকাবিলায় ফকীহগণ নিজেদের কিয়াসকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং هم رجال ونحن رجال (আমরা যেমন তাঁরাও তেমন মানুষ) এ ধরনের মন্তব্য করতেও দ্বিধাবোধ করেননি।

উল্লেখ্য, এ অধ্যায়ের শিরোনামে স্বীকৃত ব্যক্তিত্বের অভিমত বলতে কিয়াস, ইস্‌তিসহ্‌সান, ইস্‌তিসলাহ্ এবং সাময়িক ও জরুরী অবস্থায় প্রদত্ত অভিমত ইত্যাদি সবকিছুই এর অন্তর্ভুক্ত বোঝান হয়েছে।

একাদশ উৎস ঃ 'উর্‌ফ (عُرف) ও রেওয়াজ (رَواج)

ইসলামী ফিক্‌হের একাদশ উৎস হচ্ছে 'উরফ্ ও রেওয়াজ।

ফিক্‌হের বিকাশে 'উর্‌ফ ও রেওয়াজের ভূমিকা

ইসলামী ফিকহের বিকাশে এ দুয়ের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। 'আরব ও অনারবের অনেকগুলি প্রচলিত রীতি ও রেওয়াজ, যেগুলি আল্লাহ্‌র হিকমত ও ইসলামের মূলনীতির বিরোধী ছিল না এবং কুরআন -সুন্নাহর সুস্পষ্ট বর্ণনা যেগুলির ব্যাপারে নীরব ছিল, সেগুলিকে সাহাবা (রা) তাবেঈগণ (রা) এবং তাঁহাদের পরে ফকীহ্‌গণ অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন, ফিকহের পুস্তকাদি রচনার যুগে সেগুলি ফিক্‌হ সাহিত্যের অংশে পরিণত হয়। উদাহরণ ঃ دية (শোণিত পণ) প্রচলিত ছিল এক'শটি উট। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দাদা আবদুল মুত্তালিব জনৈকা কাহিনা (كاهنة = মহিলার) প্রস্তাব অনুযায়ী শোণিত পণের এই নিরিখ গ্রহণ করেছিলেন।[২০১] সাহাবা (রা) ও তাবেঈন (রা)-এর যুগেও এ রীতি প্রচলিত ছিল।

হযরত শাহ অলিউল্লাহ্ (রা) জাহেলী যুগে আরবে প্রচলিত ভালো রসম রেওয়াজগুলোকে مادة تشريعية অর্থাৎ আইনের উপকরণ বলে আখ্যায়িত করেছেন।[২০২]

নবীদের এই শরী'আতের সাথে এই সব রেওয়াজের অন্তত আংশিক সম্পর্ক না থাকলেও পূর্ববর্তী নবীদের শরী'আতের সাথে এই সব সুষ্ঠু রীতি-রেওয়াজের অন্তত আংশিক সম্পর্ক অবশ্যই ছিল, যদি না থাকে তাতেও ক্ষতি নেই যদি তা কল্যাণ এবং ক্ষতিরোধক হয়।

---

২০১. ইমাম আবূ হানীফার ইসলামী আইন প্রণয়ন (উর্দূ), ২৬ পৃষ্ঠা।

২০২. হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ, ১২৩ পৃষ্ঠা।

উরফের সংজ্ঞা

عُرف -এর আভিধানিক অর্থ সাধারণ্যে প্রচলিত রীতি। رواج-এর সমার্থক শব্দ। ফকীহগণ উরফ ও রেওয়াজের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা পেশ করেছেন ঃ

عادة جمهور قوم فى قول او عمل

"কথা বা কর্মে বিপুল জনগণের (جمهور) অভ্যাস (عادة)-এর নাম 'উর্‌ফ'। এর অপর নাম হচ্ছে "التعامل" যা ফকীহদের কথায় ঃ

هو عادة الناس فى المعاملات من البيع والشراء وغيرهما ـ

কেনাবেচা ও অন্যান্য বিষয়ে লোকদের অভ্যাস অর্থাৎ লোকাচার।

'উরফ' ও 'আদতের' সাথে সামঞ্জস্যশীল আর একটি শব্দ হচ্ছে 'ইস্‌তি'মাল' (استعمال -ব্যবহার)। শব্দটি তার আসল অর্থ থেকে বিচ্যুত হয়ে শরী'আতের একটি পারিভাষিক শব্দরূপে ব্যবহৃত হতে থাকে। ফকীহগণের নিম্নোক্ত উক্তিতে এর ইংগিত রয়েছে।

استعمال الناس حجة يجب العمل بها

অর্থাৎ লোকদের ইস্‌তি'মাল (ব্যবহারিক রীতি) হুজ্জাত বা প্রমাণ। এর ওপর আমল করা ওয়াজিব।

আদত (অভ্যাস)-এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ ঃ

العادة عبارة عما يستقر فى النفوس من الامور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة ـ

"আদত বলতে বোঝায়, পৌনপুনিক ব্যাপারগুলির মধ্যে যা মানুষের মনে ঠাঁই করে নেয় এবং যা সুস্থ প্রকৃতির পক্ষে গ্রহণযোগ্য।"২০৩

কোন কোন ফকীহ 'উরফ ও 'আদতকে একই অর্থে গ্রহণ করেছেন, যেমন উল্লেখিত বক্তব্যগুলি থেকে বুঝা যায়। আবার কেউ কেউ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ উরফ হচ্ছে আম (عام = ব্যাপকতর) এবং আদত হচ্ছে খাস্‌ (خاص = নির্দিষ্ট, ব্যাপকতা কম) এই দৃষ্টিতে বিচার করলে প্রত্যেক উরফ অবশ্যি আদত হবে; কিন্তু প্রত্যেক আদতের পক্ষে উরফ হওয়া জরুরী নয়।

আদতের ব্যাপারে ফকীহগণের দৃষ্টিভংগী সম্বন্ধ তাঁদের উক্তি হচ্ছে ঃ

العادة تجعل حكما اذا لم يوجد التصريح بخلافه فاما عند وجود التصريح بخلافه يسقط اعتباره ـ

২০৩. আল আশ্‌বাহ ওয়ান নাযায়ের, ৬৪ পৃষ্ঠা।

"আদতকে বিধানরূপে গণ্য করা হবে যদি তার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বক্তব্য না থাকে আর যদি সুস্পষ্ট বিরুদ্ধ বক্তব্য থাকে তাহলে আদতের বিবেচন হবে না।"[২০৪]

কুরআন ও সুন্নাত থেকে প্রমাণ

কুরআন হাকীমের নিম্নোক্ত আয়াতটি এর বুনিয়াদ হতে পারে ঃ

خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ ـ (الاعراف : ١٩٩)

"ক্ষমার পথ অবলম্বন করো عرف অনুযায়ী হুকুম দাও এবং মূর্খদেরকে এড়িয়ে চলো।"

মুফাস্‌সিরগণের মতে সমস্ত যৌক্তিক ও প্রচলিত ভালো কথা ও কর্ম উরফ এর অন্তর্ভুক্ত। মারূফ (معروف) এবং উরফ একই ধাতু থেকে উদ্ভূত এবং সমার্থক। কুরআন মজীদে معروف শব্দের ব্যবহার বেশি।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ انتم اعلم بامور دنياكم ـ "পার্থিব বিষয়গুলো তোমরাই ভালো জানো।" হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ

ماراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وماراه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح ـ

"মুসলিমরা যে বিষয়টিকে ভালো মনে করে (অবশ্য ইসলামী বুনিয়াদী নীতির বিরোধী না হলে) আল্লাহ্‌র কাছেও তা ভালো এবং মুসলিমরা যা খারাপ মনে করে আল্লাহ্‌র কাছেও খারাপ।"[২০৫]

ফকীহ্‌গণের কাছে উরফের মর্যাদা

ফকীহ্‌গণ উরফ ও রেওয়াজকে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন। যেমন তাঁরা বলেন, العادة محكمة। অর্থাৎ আদত একটি সিদ্ধান্তকারী জিনিস। তাদের মতে ঃ الثابت بالعرف كالثابت بالنص ـ

"যে ব্যাপারটি উরফের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত তা নাস (কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট উক্তি)-এর মাধ্যমে প্রমাণিত ব্যাপারের মতো।"[২০৬]

الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعى ـ

"যা উপফের সাহায্যে প্রমাণিত তা শরী'আতের দলীলের মাধ্যমে প্রমাণিত মনে করা হবে।[২০৭]

২০৪. শরহে সিয়ারে কবীর, ১ম খণ্ড, ১৯৮ পৃষ্ঠা।
২০৫. মাজমূ'আ রাসায়েল ইব্‌ন আবেদীন, ১২০ পৃষ্ঠা।
২০৬. শরহে সীয়ারে কবীর, ১ম খণ্ড, ১১ পৃষ্ঠা।
২০৭. মাজমূ'আ রাসায়েলে ইব্‌ন আবেদীন, ১১৫ পৃষ্ঠা।

ফকীহগণ অনেক মাসায়েলের ক্ষেত্রে উরফ ও রেওয়াজকেই ভিত্তি বানিয়ে হুকুম জারী করেন। কাজেই তাঁরা বলেন ঃ

يُفتى على عرف اهل زمانه وان خالف زمان المتقدمين ـ

"সমকালীন উরফ অনুযায়ী ফত্‌ওয়া দেয়া হবে, তা পূর্ববর্তী লোকদের উরফের বিরোধী হলেও।"[২০৮]

উরফ নির্ভরযোগ্য হবার জন্য তার ওপর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর আমল হওয়া জরুরী। বিপুল গরিষ্ঠ অংশের আমলের ক্ষেত্রে মুফতী ও কাযীর উরফ বিরোধী ফত্‌ওয়া দেয়া বা ফায়সালা করা জায়েয নয়।

انما تعتبر العادة اذا اطررت وغلبت ـ

"যখন আদত বহুল প্রচলিত হয় ও প্রাধান্য বিস্তার করে তখনই তার বিবেচনা হবে।"[২০৯]

ফকীহগণ اطرار শব্দের অর্থ বর্ণনা করে বলেন ঃ

ان تكون العادة كلية بمعنى انها لاتتخلف ـ

"আদত হবে ব্যাপক এ অর্থে যে, তা কখনও পিছিয়ে পড়বে না"[২১০]। অর্থাৎ বরাবর প্রচলিত থাকবে।

আর غلبت শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে ঃ

ان تكون اكثريته بمعنى انها لاتتخلف ـ

"অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহার প্রচলন থাকতে হবে, পিছিয়ে পড়বে না।[৪]"

দুইপ্রকার উর্‌ফ

ফকীহগণের বর্ণনা অনুযায়ী উর্‌ফ দুই প্রকার ঃ ১. উরফে খাস (خاص) এবং ২. উরফে আম (عام)।

কোন বিশেষ এলাকায়, পেশায় বা বিশেষ ব্যবসায়ী শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত উরফ-কে উরফে খাস বলে।

আর উরফে আম বলা হয় ব্যাপকভাবে প্রচলিত উরফকে যা কোন শ্রেণী বা এলাকা ইত্যাদির সাথে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট হয় না।

২০৮. রদ্দুল মুমতার।

২০৯. আল আশ্‌বাহ ওয়ান নাযায়েব, ৬৫ পৃষ্ঠা।

২১০. আল উরফু ওয়াল 'আদাত ফী রাইল ফুকাহা, মাআরিফ থেকে।

২১১. ঐ।

মানুষের গড়া আইনে উরফের অবস্থান

সাধারণভাবে প্রত্যেকটি উরফ ও রেওয়াজকে আইনগত মর্যাদা দেয়া হয় না। কতগুলো মতে আদালত তাকে গ্রহণযোগ্য মনে করে। শর্তাবলীর কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে দেয়া হলো ঃ

১. উরফ যুক্তিসঙ্গত হতে হবে। এই প্রেক্ষিতে আইনে একটি Maxim বা স্বীকৃত নীতি হচ্ছে ঃ কুপ্রথা বাতিলযোগ্য" অর্থাৎ উরফের গ্রহণযোগ্যতা জনকল্যাণের স্বার্থের সাথে জড়িত।

২. উরফ অপরিহার্য হতে হবে অর্থাৎ জনগণ তাকে ওয়াজিব ও জরুরী বলে বিশ্বাস করতে হবে। কোন ব্যক্তির স্বেচ্ছাচার মূলকভাবে চাপিয়ে দেয়া রেওয়াজ উরফের মর্যাদা পাবে না।

৩. উরফ দেশের আইনের পরিপন্থী হলে তা অগ্রাহ্য হবে। আইন প্রণয়ন সংস্থা (যথা পার্লামেন্ট) কর্তৃক রচিত আইনের সাথে সংগতি থাকা আবশ্যক, অন্তঃপক্ষে বিরোধ থাকবে না।

৪. সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত জারী থাকা (Long standing custom হওয়া) জরুরী। আগে শর্ত ছিল, উরফ হবে স্মরণাতীত কালের, এই শর্ত শিথিল করা হয়েছে। সুনির্দিষ্ট রেওয়াজ অনুযায়ী জনগণের আমল প্রমাণিত হয়ে যাওয়াই যথেষ্ট। তবে, গ্রহণযোগ্যতার জন্য এখনও রেওয়াজে সূচনা কাল প্রমাণ করা জরুরী মনে করা হয়ে থাকে। উল্লেখিত মেয়াদের শর্তটি খ্রীষ্টীয় গির্জাধ্যক্ষগণ রোমান আইন থেকে গ্রহণ করেছিল।

ফকীহগণ প্রায়ই উরফ ও রেওয়াজের দীর্ঘস্থায়িত্বকে বেশি গুরুত্ব দেননি। যেমন সাহাবায়ে কেরামের যামানা থেকে তার প্রচলিত হওয়া অপরিহার্য নয়।

ফিক্‌হের গ্রন্থসমূহে বলা হয়েছে ঃ

المعتبر العرف الطارى بانه لايخالف النص بل يوافقه ـ

(উল্লেখিত অবস্থাগুলিতে) "প্রচলিত উরফই বিবেচনাযোগ্য হবে। এই অবস্থায় যে তা নসের (সুস্পষ্ট বিধানের) বিরোধী নয়, বরং অনুকূল।"[২১২]

---

২১২. রদ্দুল মোহ্‌তার, ৪র্থ খণ্ড।

দ্বাদশ উৎস ঃ দেশজ আইন

ইসলামী ফিকহের দ্বাদশ উৎস হচ্ছে দেশজ আইন। উরফ ও রেওয়াজ অধ্যায়ে কুরআনের যেসব আয়াত ও হাদীস পেশ করা হয়েছে, দেশজ আইনের সমর্থনেও সেগুলি পেশ করা যেতে পারে। ইসলামী দাওয়াতের অতিগুরুত্বপূর্ণএকটি উদ্দেশ্য হচ্ছে الامر بالمعروف। অর্থাৎ সৎকর্মের আদেশ দান। আর মারূফ ব্যাপক পরিধিতে এমন সব দেশজ আইনও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, যা ইসলামী নীতির সাথে সামঞ্জস্যশীল এবং শরী'আত ও বুদ্ধি বিরোধী নয়। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ـ (ال عمران : ١١٠)

"সমগ্র মানব জাতির মধ্যে তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত তোমাদের অভ্যুদয় ঘটান হয়েছে মানুষের (সংশোধন ও হেদায়াত তথা সৎপথ দেখাবার) জন্যে, তোমরা সৎকাজের হুকুম দেবে, অসৎকাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখবে এবং আল্লাহ্‌র সাচ্চা ঈমানদার হবে।"

উম্মতে মুহাম্মদী (সা) দুনিয়ার যেখানেই গিয়েছে সেখানকার ভালো (معروف) রস্‌ম-রেওয়াজ ও আইনকে উৎসাহিত করেছে। উপরোক্ত আয়াতের আলোকে এবং প্রেরণায় এগুলি ছিল পূর্ববর্তী শরী'আতের অবশিষ্টাংশ, এমন ঢালাও দাবী ভিত্তিহীন। কল্যাণের লক্ষ্যে প্রত্যেক দেশের অধিবাসীরা কতিপয় আইন অবশ্যই রচনা করেছিল, তার সাথে পূর্ববর্তী নবীদের শরী'আতের সম্পর্কও অবশ্যই ঘটেছে। তা আংশিক হউক বা সামগ্রিক, যদিও যথাযথ রেকর্ডের অভাবে তা প্রমাণ করা সম্ভব নয়।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) কি করেছিলেন ?

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তদানীন্তন আরবে প্রচলিত বহু আইন প্রয়োজনমত সংশোধন ও পরিবর্তন করে গ্রহণ করেন। পূর্ববর্তী কোন শরী'আতের সাথে সম্পর্কের প্রতি কোন গুরুত্ব দেননি। পরবর্তীকালে এই আইনগুলি ইসলামী ফিকহের গ্রন্থগুলিতে স্থান লাভ করেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তৎকালীন আরব সমাজে প্রচলিত নিম্নোক্ত আইনগুলি গ্রহণ করেছিলেন ঃ

১. البينة على المدّعى واليمين على من انكر (মামলা-মোকদ্দমার ক্ষেত্রে) প্রমাণ উপস্থাপন করা বাদীর দায়িত্ব, যে ব্যক্তি দাবী অস্বীকার করে (বিবাদী) তার ওপর কসম বা শপথ ওয়াজিব।

২. বিয়ের ব্যাপারে কয়েকটি পদ্ধতি যথা ঈজাব, কবূল, মহর ইত্যাদি।

৩. সম্পত্তি ব্যবহার ও হস্তান্তরের কয়েকটি পদ্ধতি যথা ঃ বিক্রয় (بيع), হিবা (هبة), রেহেন (رهن), ইজারা (اجارة) ইত্যাদি। ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি, যাতে ঝগড়া সৃষ্টির সম্ভাবনাছিল তা বাদ দেয়া বা তাতে শর্তারোপ করা হয়েছিল।

৪. অসিয়তের (وصية) নিয়ম।

৫. আইন প্রয়োগ করা এবং বলবৎ রাখার কতিপয় পদ্ধতি ইত্যাদি।[২১৩]

ভিন্ন দেশের মুসলিমদের সংস্পর্শ–তাদের প্রতি মুসলিমদের আচরণ

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পর সাহাবীগণ এবং তাঁদের পরবর্তী মুসলিমগণ বহু দেশ ও জাতির সংস্পর্শে এসেছিলেন প্রধানত ব্যবসায় উপলক্ষে এবং সামরিক অভিযান সূত্রে। সিরিয়ায় ও মিসরে তাঁরা রোমীয় এবং ইরাকে ইরানী আইন, ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদির মুখোমুখি হতেন। ইয়ামানেও ইয়াহুদী, রোমীয় ও ইরানী প্রভাব ছিল। হযরত উস্‌মান (রা)-এর খিলাফত আমলে ইসলামের বিজয় অভিযান পশ্চিম চীন থেকে স্পেনের কিছু অংশ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। এই বিস্তৃত এলাকার দেশগুলিতে প্রাচীন কয়েকটি সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং বিভিন্ন প্রকার আইনেরও প্রচলন ছিল। মুসলিমগণ বিজিত দেশগুলির ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম ইত্যাদি সংরক্ষণ করতে তাদের বৈষয়িক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ, তাদের সামাজিক আচার অনুষ্ঠান পালনের ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব দেশজ ও ধর্মীয় আইনে হস্তক্ষেপ করতেন না।

মুসলিম শাসকগণ তাদের বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থাও অক্ষুণ্ন রাখেন। তারা ছিল ঃ احرار فى شهاداتهم ومناكحتهم ومواريثهم وجميع احكامهم "সাক্ষ্যদান, বিয়েশাদী, উত্তরাধিকার ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপারে তারা স্বাধীন ছিল (নিজেদের আইন কার্যকরী ছিল)।

দীর্ঘকাল পর্যন্ত বিজিত দেশসমূহের অফিস-আদালতের কাজকর্ম স্থানীয় ভাষায় চলার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। কাজেই ইরাকে ফারসী ভাষায়, সিরিয়ায় রোমান ভাষায় এবং মিসরে কিব্‌তী (Coptic) ভাষায় কাজ চলতো। আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের সময় আরবী সরকারী ভাষারূপে প্রবর্তিত হয়েছিল।

যুদ্ধরত বা বিজিত দেশসমূহের অমুসলিমদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হলে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে মুসলিমগণ চুক্তির শর্তগুলো পালন করতেন; এমন কি মুসলিম সেনাপতি হিম্‌স-এর অধিবাসীদেরকে তাদের কাছ থেকে আদায়কৃত রাজস্বের অর্থ ফেরৎ দিয়েছিলেন, যখন তিনি রণকৌশল স্বরূপ হিম্‌স্ ছেড়ে পশ্চাদপ্রসরণ করে শত্রুর মুকাবিলা করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন– কারণ করদাতার অধিকার-নিরাপত্তা তিনি দিতে পারলেন না। মুসলিম শাসকগণ সাধারণত বিজিত দেশের অমুসলিমদের বিধিবিধান ও রীতিরেওয়াজের প্রতি যথাসম্ভব সহানুভূতিশিলতা অবলম্বন করেন।

---

২১৩. দেখুন হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ ইত্যাদি।

হযরত উমর (রা) বিজিত দেশের বহু আইন অক্ষুণ্ন রাখেন

১. ইরাক, সিরিয়া ও মিসর বিজয়ের পর হযরত উমর (রা) রোমান, গ্রীক ও ইরানী ভূমিকর ও রাজস্ব আইনের বৃহদংশ অপরিবর্তিত রেখেছিলেন। তবে এই সংগে তিনি জুলুম ও অন্যায়মূলক ব্যবস্থা এবং কৃষকদের ব্যাপারে কঠোর নীতি অবলম্বনের আইন সংশোধন ও পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন।[২১৪]

২. নগর শুল্কের ক্ষেত্রে আইন ছিল, বিদেশী ব্যবসায়ীদের সাথে ব্যবহার করা হবে যেমন তারা নিজেদের দেশের আইন অনুযায়ী মুসলিম ব্যবসায়ীদের সাথে করে থাকে।

এভাবে মুসলিমগণ অন্য জাতিদের ও দেশের কোন কোন ভাল আইন গ্রহণ করার ব্যাপারে মোটেই কুণ্ঠাবোধ করেননি। বিভিন্ন জাতির ও বিভিন্ন দেশের মধ্যে এধরনের বিনিময় সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও অনিবার্য বিষয় ছিল।

নবী (সা) বলেছেন ঃ

كلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو احق بها -

"জ্ঞানগর্ভ কথা মু'মিনের হারানো সম্পদ। যেখানেই সে তা পাবে সে-ই তা গ্রহণ করার সবচেয়ে বেশী হকদার।

"কালেমাতুল হিকমত"-এর মধ্যে সমস্ত ভাল জিনিস শামিল রয়েছে।

ইসলামী ফিক্‌হের ভিত্তি কি বিদেশী আইনের ওপর স্থাপিত

কোন কোন প্রাচ্যবিদ অবশ্যি এমনি ধরনের কথাই লিখেছেন। তারা বলেছেন, ইসলামী ফিক্‌হ রোমান আইন থেকেই গ্রহীত। কেউ কেউ তো একে রোমান আইনের ভিন্ন রূপ বলে অভিহিত করেছেন।

প্রমাণ হিসেবে তাঁরা নিচে উল্লেখিত কয়েকটি উদাহরণ পেশ করে থাকেন ঃ

১. البينة على المدّعى واليمين على من انكر এ বিধানটি রোমান আইনেও পাওয়া যায়।

২. পারস্পরিক লেনদেন ও অর্থনৈতিক কতিপয় বিধানের মধ্যে রোমান আইনের সাদৃশ্য রয়েছে।

৩. কোন কোন পরিভাষাগত শব্দ যেমন ফিক্‌হ ও ফকীহ -এর সমার্থক শব্দের ব্যবহার রোমীয়দের মধ্যেও ছিল।

---

২১৪. বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন লেখকের উর্দূ ভাষায় লিখিত গ্রন্থ ঃ ইসলামকা যারঈ নিযাম (ইসলামের ভূমি ব্যবস্থা)।

৪. ইসলামের বিজয় অভিযানকালে সিরিয়ায় কাইসারীয়া ইত্যাদি স্থানে রোমান আইনের কোন কোন শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল।

৫. এমন কতিপয় প্রতিষ্ঠান ও বিভাগ প্রতিষ্ঠিত ছিল, যেগুলিতে রোমান আইন কার্যকরী ছিল।

মাত্র গুটিকতেক দৃষ্টান্ত অথবা কোন আইনের সাথে কিছুটা সামঞ্জস্য একথা প্রমাণ করে না যে, ইসলামী ফিক্‌হের বিরাট ভাণ্ডার রোমীয় আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিছুটা সম্পর্ক অস্বাভাবিক নয়, বরং স্বীকার্য।

শরী'আতের উৎস সম্পর্কিত এই বিস্তারিত আলোচনার উপসংহারে আল্লামা শাতিবী (র)-এর একটি বক্তব্য খুবই প্রাসংগিক হবে। তিনি বলেন ঃ

الادلة الشرعية ضربان احدهمامايرجع الى النقل المحض والثانى مايرجع الى الرأى المحض فاما الضرب الاول فالكتاب و السنة واما الثانى فالقياس والاستدلال ان الادلة الترعية فى اصلها محصورة فى الضرب الاول لانا لم نثبت الضرب الثانى بالعقل وانما اثبتناه بالاول اذمنه قامت ادلة صحة الاعتماد عليه ـ

"শরী'আতের দলীলসমূহ (উৎস) আসলে দুই প্রকার। এক. যাদের সম্পর্ক শুধুমাত্র নকল (نقل)-এর সাথে। দুই. যাদের সম্পর্ক কেবল রায় (الرأى)-এর সাথে। প্রথম প্রকার দলীলের ভিত্তি হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ্ (النقل) এবং দ্বিতীয় প্রকার দলীলের ভিত্তি হচ্ছে কিয়াস ও ইস্‌তিদলাল (الرأى) কিন্তু দলীল মূলত কুরআন ও সুন্নাহতে সীমাবদ্ধ। কিয়াস ও ইস্‌তিদলাল কেবল বুদ্ধির সাহায্যে দলীলরূপে প্রমাণিত হয়নি, বরং কুরআন ও সুন্নাহ থেকেই আমরা তা প্রমাণ করেছি; এটাই رأى-এর নির্ভরযোগ্যতার ভিত্তি।

ইসলামী আইনে বুনিয়াদী ও কেন্দ্রীয় মর্যাদার অধিকারী হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ, বুদ্ধি তার অনুসারী মাত্র।

অন্যদিকে মানব রচিত আইন অধিকতর বুদ্ধিনির্ভর। ধর্মের নাম যদি এবং যুতটুকু নেয়া হয়, তা রাজনৈতিক কারণে নেয়া হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

ফিক্‌হের মূলনীতি (اصول) এবং ব্যাপক নিয়ম (كليات)

ফিক্‌হে ইসলামীর কয়েকটি ব্যাপক নিয়ম, যাকে আমরা Legal maxim-এর সাথে তুলনা করতে পারি, এ অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করবো। ইসলামের মূলনীতির পরিপ্রেক্ষিতে বিধান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে ফকীহ্‌গণ এই ব্যাপক নিয়মগুলো (كليات)-এর সাহায্য নিয়েছেন যথেষ্ট পরিমাণে। এ জাতীয় নিয়ম বা সূত্রগুলি আইনগত প্রবচনে পরিণত হয়েছে। এ অধ্যায়ে আমরা ও গুলোকে প্রবচন আখ্যায় আখ্যায়িত করবো।

প্রবচন ঃ ১

المشقّة تجلب التيسير

"কষ্টসাধ্যতা সহজতর বিধান আকর্ষণ করে বা চাহিদা সৃষ্টি করে।"

কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতগুলিতে এর সমর্থন পাওয়া যায় ঃ

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَايُرِيْدُبِكُمُ الْعُسْرَ ـ (البقرة : ١٨٥)

"আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা সহজ তাই চান, যা কঠিন তা চাননা।"

يُرِيْدُ اللّٰهُ اَن يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ـ (النساء : ٢٨)

"আল্লাহ্ চান তোমাদের বোঝা হাল্‌কা করে দিতে এবং মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।"

لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا ـ (البقرة : ٢٨٦)

"আল্লাহ্ কারো ওপর তার ক্ষমতার বাইরে দায়িত্ব চাপিয়ে দেননা।

ইয়াহুদী এবং খৃষ্টানদের জন্যও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নুবুওয়াত ছিল রহমত। এ সম্বন্ধে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلاَلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ـ (الاعراف : ١٥٧)

"আল্লাহ্‌র রাসূল নামিয়ে দিচ্ছে তাদের সেই বোঝা এবং সেই জিঞ্জির যা তাদের ওপর (জগদ্দল পাথরের মত) চেপে ছিল।"

আয়াতে যে বোঝা আর জিঞ্জিরের কথা বলা হয়েছে, তার কিছুটা আল্লাহ্ ইয়াহুদীদের অবাধ্যতার শাস্তি স্বরূপ তাদের ওপর চাপিয়েছিলেন। বাকি ইয়াহুদী এবং খৃষ্টানদের জন্য চাপিয়েছিল তাদের ধর্মীয় নেতা যাজক পূরোহিতরা। এদের বাড়াবাড়ি (غلو فی الدین)-তে তাদের ধর্ম তাদের ওপর জগদ্দল পাথরের মত গুরুভার বোঝায় পরিণত হয়েছিল। শরী'আতে ইসলামে সে সব বোঝা থেকে নিষ্কৃতির ব্যবস্থা ছিল এবং হযরত (সা) এ সব বোঝা নামিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ প্রসংগে বলেছেন ঃ ان الدین یُسر ولن یشادَّ الدین احد الا غلبه ۔

"দীন অবশ্যই সহজ, কেউ তার মধ্যে অযথা বাঁধন-কর্ষণ যোগ করলে দীন অবশ্যই তাকে পরাভূত করবে। অর্থাৎ সে দীনের অনুসরণ মুশকিল হবে।"২১৫

হযরত (সা) মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করাকে নুবুওয়াতের অংশ গণ্য করে বলেন ঃ

الاقتصاد جزء من خمس وعشرین جزء من النبوة ۔

"মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন নুবুওয়াতের পঁচিশ ভাগের একভাগ।"২১৬

আলোচ্য مشقة বা কষ্টের অর্থ

ফকীহগণ প্রত্যেকটি কষ্টকে আলোচ্য مشقة-এর মধ্যে শামিল করেননি, বরং এরও সীমারেখা নির্ধারিত করেছেন। আল্লাহ্‌র হিকমাতও মানুষকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করে দেয়ার পক্ষপাতি নয়, যাতে আরামপ্রিয় ও অদূরদর্শী লোকদের হাতে দীন খেলনায় পরিণত হয়ে যায়।

শরী'আতের লক্ষ্য হচ্ছে, মানুষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করবে, কামনা-বাসনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার যোগ্যতা অর্জন করবে ব্যক্তিস্বার্থ ও প্রবৃত্তিকে সংযত করবার সাহস ও শক্তি লাভ করবে।

একথা সুস্পষ্ট, মানুষের জীবনে তখনই এসব গুণের প্রকাশ ঘটতে পারে যখন তার জৈব প্রকৃতির ওপর নৈতিক বিধি-নিষেধ আরোপিত হবে এবং গ্রহণ ও বর্জনের নৈতিক ও আইনগত বিধানের আওতাধীনে সে জীবন যাপন করবে। এ ছাড়া মানুষের জীবন গড়ে উঠতে পারে না এবং একটি সৎ ও সত্যনিষ্ঠ সমাজও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

---

২১৫. বুখারী ও মিশকাত, আল কাসদু ফিল আমল।

২১৬. আবূ দাউদ ও মিশকাত, বাবু আল হায্‌র ওয়াত্ তান্নী ফিল উমূর।

فاحوال الانسان كلها كلفة فى هذه الدار فى اكله وشربه وسائر تصرفاته ولكن جعل الله له قدرة عليها بحيث تكون تلك التصرفات تحت قهرة لا ان تكون هوقهر التصرفات ـ

"এই দুনিয়ায় মানুষের সমস্ত অবস্থাই কষ্টসাধ্য। এমনকি তার পানাহার এবং অন্য সমস্ত কর্মও শ্রমমুক্ত নয়। কিন্তু আল্লাহ্ তাকে ক্ষমতা দিয়েছেন যাতে সে-ও সব কর্মের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করে, যাতে সে তার কর্মের নিয়ন্ত্রাধীন না হয়ে যায়।"[২১৭]

এ অবস্থায় শরী'আতের বিধান মেনে চলার ক্ষেত্রে কষ্ট ও শ্রমকে পুরোপুরি বাদ দেয়া কেমন করে সম্ভব ?

পার্থিব সংগ্রামের ক্ষেত্রে মানুষকে যে পরিমাণ কষ্ট ও পরিশ্রম করতে হয়, জীবন যুদ্ধে টিকে থাকার জন্য ততটুকু কষ্ট অপরিহার্য এবং একটি বিশেষ পরিমাণ কষ্ট সুস্বাস্থ্য ও শারীরিক শক্তি বজায় রাখার জন্যও প্রয়োজনীয়।

এই দু ধরনের কষ্টকে مشقة-এর পরিবর্তে محنة (পরিশ্রম) বলাই ভালো। ফকীহগণের ভাষায় একে অভ্যাস সংশ্লিষ্ট (معتاد) কষ্ট বলা হয়। শরী'আত এ দু'ধরনের কষ্টের ব্যাপারে প্রধানত কোন রুখ্‌সাত (رخصة) বা সহজ ব্যবস্থার সুযোগ দেয়নি। কিন্তু যে কষ্ট অভ্যাসের পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য করার মতো নয় অথবা যার পরিমাণ এত বেশি যে, জীবনকে টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে তা কল্যাণকর হবার পরিবর্তে ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়, তার মধ্যে رخصة -এর ব্যবস্থা রয়েছে শরী'আতে। ফিক্‌হের কিতাবগুলিতে এ দু' ধরনের কষ্টের পরিচিতি এবং পার্থক্য নিম্নরূপ ঃ

ان كان العمل يودى الداوم عليه الى الانقطاع عنه او عن بعضه والى وقوع خلل فى صاحبه فى نفسه او ماله اوحال فى احواله فالمشقة هنا خارجة عن المعتاد وان لم يكن فيها شيئ من ذلك فى الغالب فلا يعده فى العادة مشقة ـ

(যে ধরনের কর্মে مشقة -এর দরুন تيسير অর্থাৎ সহজসাধ্য বিধানের প্রয়োজন পড়ে) "সে কর্মটি এমন যদি তা সর্বক্ষণ করা হয়, তাহলে কর্মীর জান-মালের ক্ষতি হয় অথবা তার কোন না কোন বিরূপ পরিবর্তন দেখা দেয়, যার ফলে সে কাজটি সম্পূর্ণ বা আংশিক পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এই ধরনের مشقة-কে অভ্যস্থ (معتاد) কষ্ট বহির্ভূত মনে করা হবে (এবং এতে تيسير প্রয়োজন হবে)। আর যে مشقة-এ উপরোক্ত কোন অবস্থার উদ্ভব প্রায়শ হয় না ফকীহগণ তাকে তাদের পারিভাষিক مشقة বলে গণ্য করেন না।[২১৮]

---

২১৭. আল মাওয়াফিকাত লিশ্‌শাতবী, ২য় খণ্ড, ১২২ পৃষ্ঠা।

২১৮. আল মাওয়াফিকাত, ২য় খণ্ড, ১২৩ পৃষ্ঠা।

মাশাক্কাত (مشقة)-এর প্রকারভেদ

এক. যথার্থ (واقعى) মাশাক্কাত এবং

দুই. কাল্পনিক (وهمى) মাশাক্কাত।

প্রথমোক্ত মাশাক্কাত সহজতার বিধানের اسباب (কারণসমূহ) রূপে গণ্য। এই اسباب নিম্নরূপ ঃ

১. সফর (سفر), ২. রোগ (مرض), ৩. ইকরাহ (اكراه = জোরজবরদস্তি), ৪. বিস্মৃতি (نسيان), ৫. জাহ্‌ল (جهل), ৬. উস্‌র (عسر = মুশকিল অবস্থার সম্মুখীন হওয়া), ৭. উমুমুল বালওয়া (عموم البلوى = দুর্বিপাকের ব্যাপকতা), ৭. নুক্‌স (نقص) প্রকৃতিগত অক্ষমতা, (৯) উন্মাদ (جنوب), ১০. সংজ্ঞাহীনতা (غشى), ১১. নিদ্রা (نوم), ১২. অল্প বয়স (صغر) ইত্যাদি (সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।)

যথার্থ কষ্টের একটি দৃষ্টান্ত ঃ রুগ্নাবস্থায় রমযান শরীফের ফরয রোযা ভঙ্গ করা জায়েয, কারণ তাতে যথার্থ মাশাক্কাত বিদ্যমান। তদ্রূপ একজন রোগগ্রস্ত ব্যক্তি কোন অভিজ্ঞ ও পারদর্শী চিকিৎসকের অভিমতের ভিত্তিতে এরূপ রোযা ভাংগতে পারে, যদিও সে সাম্প্রতিকভাবে রোযা রেখে যাঁচাই করে নাই রোযা রাখলে তার যথার্থ মাশাক্কাত হবে কিনা।

ফকীহগণ رخصة অর্থাৎ সহজতর বিধান দানের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক। তাই উল্লেখিত উদাহরণে তাঁদের বিধানের আসল রূপ হচ্ছে ঃ প্রথমে রোগীকে রোযা রেখে দেখতে হবে; যদি অসহ্য হয় তাহলেই রুখ্‌সাত -এর আশ্রয় নিতে হবে। অবশ্য বিগত অভিজ্ঞতার আলোকে বা ডাক্তারের পরামর্শেও রুখসাতের আশ্রয় নেয়া যাবে; কারণ ইল্লত পাওয়া গেলে হুকুমও স্থিত হয়।

খেয়ালী মাশাক্কাত-একটি উদাহরণ ঃ এক ব্যক্তি দুই/তিন দিন অন্তর একদিন কিছুক্ষণ জ্বরে ভোগে, অন্য দিনগুলি প্রায় সুস্থ এবং রোযা রাখতে সক্ষম থাকে। সে রুখসাতের দাবিদার হবে যখন বাস্তবে জ্বর আসে। কারণ ইল্লতের সম্ভাবনা থাকলেও জ্বর আসার কিংবা ঋতু শুরু হবার পূর্বে ইল্লত অনুপস্থিত, সুতরাং হুকুমও স্থিত হবে না। অন্য পক্ষে পালামত জ্বর না আসা কিংবা ঋতুস্রাব না হওয়ারও সম্ভাবনা আছে, কারণ পালা এবং অভ্যাস বদলায়।

কাল্পনিক বা সাধারণ রকমের মাশাক্কাত সয়ে নেয়া যায়, শরী'আতের বিধান পালনের মহান উদ্দেশ্যে তা সয়ে নেয়াই কর্তব্য।

মাশাক্কাতের প্রেক্ষিতে রুখসাত ফকীহগণের মতে শর্ত সাপেক্ষ। তাঁরা বলেন ঃ

المشقة والحرج انما يعتبر فى موضع لا نص فيه بخلافة امامع النص بخلافه فلا يعتبر -

(প্রথম শর্ত হচ্ছে) "মাশাক্কাত (এবং حرج সংকীর্ণতা)-এর বিবেচনা কেবল সে ক্ষেত্রেই হবে, যে ক্ষেত্রে বিবেচনার বিরুদ্ধে কোন দলীল (نص) না থাকে; যদি থাকে তবে সে মাশক্কাতের বিবেচনায় রুখসাত পাওয়া যাবে না। কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতে এই শর্তের সাক্ষ্য পাওয়া যায় ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ ـ (البقرة : ٢١٦)

"তোমাদেরকে জিহাদের হুকুম দেয়া হয়েছে অথচ তোমাদের তাতে অনীহা। কিন্তু সম্ভবত যাতে তোমাদের অনীহা তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং সম্ভাবত যা তোমরা পছন্দ করো তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জানোনা।"

জিহাদে অবশ্যই মাশাক্কাত আছে, মৃত্যুরও সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তাই বলে রুখসাত মিলবেনা। কারণ نص (এ ক্ষেত্রে কুরআনের স্পষ্ট বাক্য) মাশাক্কাতের প্রেক্ষিতে রুখসাতের খিলাফ হুকুম দিচ্ছে। সুতরাং জিহাদ সক্ষম মুসলিমের জন্য ফরয। মাশাক্কাতের বিচার এক্ষেত্রে অচল।

দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে ঃ সব ক্ষেত্রে মানুষের প্রবৃত্তি বা ভাবাবেগের প্রেক্ষিতে মাশাক্কাতের বিবেচনা করা যাবে না; কারণ শরী'আতের লক্ষ্যসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে মানুষকে প্রবৃত্তির দাসত্বমুক্ত করা; প্রবৃত্তিকে শরী'আতের শৃংখলে আবদ্ধ করাই উদ্দেশ্য। এর সমর্থনে কুরআন ও সুন্নাহর কয়েকটি বক্তব্য উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করা গেল ঃ

اَفَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهُ هَوَاهُ ـ (الجاثية : ٢٣)

"তুমি কি দেখছো এমন ব্যক্তিকে, যে প্রবৃত্তিকে তার মাবূদ বানিয়ে রেখেছে?"

প্রবৃত্তি ও আবেগতাড়িত ফায়সালাকে অনির্ভরযোগ্য ঘোষণা করে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ ـ (يوسف : ٥٣)

"অবশ্যই নাফ্‌স প্ররোচনা সৃষ্টিতে অত্যন্ত পটু।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

لايؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ـ

"তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পুরা মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ তার প্রবৃত্তি আমি যা নিয়ে এসেছি (শরী'আত) তার অনুবর্তী না হয়ে যাবে।"

তাই ফকীহগণ বলেন ঃ

ان قصد الشارع من وضع الشرائع اخراج النفوس عن اهوائها وعوائدها فلا تعتبر فى شرعية الرخصة بالنسبة الى كل من شربت نفسه امرا ـ

"শরী'আত প্রণয়নের মাধ্যমে শরী'আত প্রণেতার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা ও আচার-আচরণের শৃংখল মুক্ত করা। তাই রুখসাত তথা সহজতর বিধান দানের ক্ষেত্রে মানুষের প্রত্যেকটি প্রবৃত্তিমূলক বিষয় বিবেচ্য।

শরী'আত প্রণেতা আবেগ-প্রবৃত্তি এক পর্যায় পর্যন্ত গ্রাহ্য করেছেন

তবে এ শর্তটি ব্যাপক নয়। শরী'আত আবেগ-অনুভূতি ও প্রবৃত্তিকে পুরোপুরি ও সর্বত্র অগ্রাহ্য করেছে, একথা ঠিক নয়। বরং কল্যাণ লাভ এবং ক্ষতির হাত থেকে নিষ্কৃতির জন্য যে সব ক্ষেত্রে আবেগ ও প্রবৃত্তির বিবেচনা জরুরী ছিল, শরী'আত প্রণেতা খুঁটে খুঁটে সে ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করেছেন এবং বিধান প্রণয়নের ব্যাপারে সেগুলির পুরোপুরি বিবেচনা করেছেন, এমন কি অনেক বিষয়ে মূলনীতির প্রতিকূলেও তা করা হয়েছে।

ফকীহ্‌গণ তাই বলেন ঃ

وقد وسّع اللّه تعالى على العباد فى شهواتهم واحوالهم وتنعماتهم على وجه لايفضى الى مفسدة ولايحصل بها المكلف على مشقة ولاينقطع بها عنه التمتع اذا اخذه على الوجه المحدود له فلذلك شرع له ابتداء رخصة السلم والقراض والمساقاة وغير ذلك مما هو توسعة عليه وان كان فيه مانع فى قاعدة اخرى ـ

"মহান আল্লাহ্‌ মানবিক কামনা-বাসনা, তার বিভিন্ন অবস্থা ও তার সুখী-সমৃদ্ধ জীবন যাপনের ক্ষেত্রে তাঁর বিবেচনাকে এমন প্রশস্ত করেছেন, যাতে মানব কোন ক্ষতি বা (অযথা) কষ্টের সম্মুখীন হয় না, তার সুখ-সমৃদ্ধির পথও রুদ্ধ হয় না, অবশ্য সে সমৃদ্ধ হবে শরী'আত কর্তৃক নির্দ্ধারিত পরিধির মধ্যে। এই কারণেই শুরুতে রুখতাস-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে (উদাহরণ স্বরূপ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে) بيع سلم এবং قراض (যথাক্রমে ধারে বিক্রয় এবং লাভের অংশ প্রাপ্তির শর্তে কর্জ দেয়া)-এর ব্যাপারে এবং শরীকানা জমি চাষ (مساقات)-এর ক্ষেত্র, ইত্যাদি, এ সবই শরী'আতের প্রশস্তি স্বরূপ, যদিও অন্য নিয়ম (কিয়াস) অনুযায়ী এই রুখসাতে বাধা রয়েছে।"[২১৯]

২১৯. আল মাওয়াফিকাত, ১ম খণ্ড, ২৩৬ পৃষ্ঠা।

তৃতীয় শর্ত ঃ সম্ভাব্য পরিণতির বিবেচনা হবে না। এর একটি উদাহরণ কুরআন মজীদ নিম্নোক্ত আয়াতে দেখা যায় ঃ

وَمِنْهُمْ مَنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ وَلَا تَفْتِنِّيْ اَلَا فِى الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا ـ

(তাদের মধ্যে কেউ বলে "আমাকে অনুমতি দিন (যাতে তাবূক-এর জিহাদে যোগ না দিতে হয়) এবং আমাকে (ঐ অঞ্চলের সুন্দরী নারীদের) ফিত্‌নায় ফেলবেন না। মনে রেখো, এরা আসলে তিফনার মধ্যে পড়েই গেছে।]

গ্রীষ্মের খরতাপে বিশাল মরুঅঞ্চল অতিক্রম করে সুদূর তাবুক-এ গিয়ে জিহাদ করা অবশ্যই বিস্তর মাশাক্কাতের ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে অক্ষম ব্যক্তিদেরকে রাসূল (সা) রুখসাত দিয়েছেন অবশ্যই। কিন্তু আয়াতে উল্লেখিত ব্যক্তি রুখসাত চাচ্ছেন– একটি সম্ভাব্য مشقة-এর অজুহাতে, আর তা হচ্ছে সুন্দরীদের ফাঁদে পড়ে তার চরিত্রের দূষণের ভয়। এই মাশাক্কাত সম্ভাব্য বাস্তব বা অবশ্যম্ভাবী নয়, আসলে তা ছিল অজুহাত মাত্র; সুতরাং লোকটি রুখসাত দাবি করতে পারে না সম্ভাব্য পরিণতির বিবেচনায়।

শরী'আতে হারজ (حرج = সংকীর্ণতা) থাকবে না

কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতগুলি এই নীতির ভিত্তি ঃ

مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ـ (الحج : ٧٨)

"আল্লাহ্ দীনের মধ্যে (তোমাদের পক্ষে অসুবিধাজনক) কোন সংকীর্ণতা সৃষ্টি করেননি।"

مَايُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّ لٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ـ

"আল্লাহ্ চান না তোমাদের ওপর সংকীর্ণতা সৃষ্টি, তবে তিনি তোমাদেরকে পরিচ্ছন্ন করতে চান।"

এই কারণে ফকীহগণ বলেন ঃ الحرج مرفوع। অর্থাৎ হারাজ তুলে নেয়া হয়েছে বা রহিত।

হারাজের তাৎপর্য

আরবী ভাষায় 'হারাজ' মানে হচ্ছে ঃ الحرجة من الشجر ماليس له مخرج

(ঘন সন্নিবেশিত) বৃক্ষাদির মধ্যে حرجة বলতে বোঝায় তা (বৃক্ষাদির জট) থেকে বের হবার উপায় না থাকাকে।[২১৯]

---

২১৯. আল মাওয়াফেকাত, ২য় খণ্ড, ১৫৯ পৃষ্ঠা।

হযরত আয়েশা (রা) 'হারাজ'-এর মানে বলেছেন ضيق [২২০] অর্থাৎ সংকীর্ণতা২ ফিক্‌হের গ্রন্থেও তাই বলা হয়েছে।[২২১]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) একবার বিখ্যাত কুরআন ব্যাখ্যাতা হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, 'দীনের মধ্যে সংকীর্ণতা নেই'– এ কথার অর্থ কি, অথচ অনেক কামনা-বাসনা থেকে আমাদেরকে বিরত রাখা হয়েছে?' জবাবে তিনি বলেন, 'সংকীর্ণতা না থাকার মানে হচ্ছে, প্রাচীন জাতিদের জন্য (তাদের অবস্থা অনুযায়ী) যে সব কঠোর বিধান নির্ধারিত হয়েছিল, তেমনি ধরনের কঠোর বিধান এই উম্মতের জন্য নির্ধারিত হয়নি।'[২২২] হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) আরো বলেন ঃ

انما ذلك سعة الاسلام ماجعل الله من التوبة والكفارات ـ

"আল্লাহ্ যে তাওবা (توبة) ও কাফ্‌রারা (كفارة)-এর ব্যবস্থা করেছেন, তা হচ্ছে ইসলামী শরী'আতের প্রশস্ততার (سعة –ইহার বিপরীতার্থক শব্দ حرج বা حرجة) প্রমাণ স্বরূপ।"

বিশিষ্ট তাবে'ঈ হযরত ইকরামা (র) ইসলামের প্রশস্ততা (سعة) এবং حرج বিহীনতার একটি উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ

مَا اَحَلَّ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ـ

"আল্লাহ্ যে দুই দুই, তিন তিন, চার চারটি বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছেন," (তাও শরী'আতে ইসলামে سعة-এর প্রমাণ)।

ইসলাম চিরকৌমার্য যেমন অনুমোদন করে না, তেমনি চারটির অধিক বিয়েরও অনুমতি দেয় না, অন্যপক্ষে একাধিক বিয়েতে আদল (عدل = স্ত্রীদের সাথে সম্পর্কে যথাসাধ্য সমতা রক্ষা)-এর শর্ত আরোপ করে হিকমতে ইলাহী দীনে এই وسعة-এর ব্যবস্থা করেছে, যাতে কোন মুসলিম বা মুসলিম সমাজ কোন যুগে এবং কোন অস্থায় حرج-এর সম্মুখীন না হয়। ইসলাম বিধবা এবং বিপত্নীকদের বিয়ে দেবার আদেশ দিয়েছে। বালবিধবাকে বাকি জীবন একলা থাকতে বললে দীনে حرج এসে যাবে এবং সমাজে ব্যভিচারের প্রাবল্য হবে।

২২০. তাফসীরে কাশ্‌শাফ, ২৯২ পৃঃ, তাফসীরে কবীর, ১২৮ পৃঃ ফুটনোট তাফসীরে কবীর, ৩০০ পৃষ্ঠা।

২২১. আল মাওয়াফেকাত, ২য় খণ্ড ১৫৯ পৃষ্ঠা।

২২২. তাফসীরে কবীর ইত্যাদি।

প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কোন কর্ম বা কৃচ্ছ্রসাধন দীনের অংগ হতে পারে না। তাতেও দীনের মধ্যে হারাজ সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ নিম্নোক্ত আয়াতটির কথা ধরা যাক ঃ

وَاَعْلَمُوْا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ ـ (الانفال : ٢٨)

"আর জেনে রাখো, তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি (তোমাদের জন্য) একটি পরীক্ষা বিশেষ।"

যখন আয়াতটি নাযিল হয়, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে এক সাহাবী বললেন, তিনি লাগাতার রোযা রাখেন, আর একজন বললেন, তিনি সারা রাত নামায পড়েন প্রত্যেক দিন, তৃতীয়জন বললেন, তিনি বিয়ে না করার সংকল্প করেছেন। তাঁরা হয়ত আশা করেছিলেন রাসূল (সা) তাঁদের এ সব কৃচ্ছ্রসাধন অনুমোদন করবেন। কিন্তু হযরত (সা) বললেন ঃ

لكنى اصوم وافطر واصلى وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس منى ـ

"কিন্তু (আমাকে দেখো) আমি রোযা (নফল) রাখি, আবার কখনো রাখিনা, নামায পড়ি, আবার ঘুমাইও এবং আমি মেয়েদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কও রাখি। মনে রেখো, যে ব্যক্তি আমার এই সুন্নত ছেড়ে দেয় সে আমার দলভুক্ত নয়।"[২২৩]

'হারাজ'-এর সীমানা

ফকীহগণ বলেন ঃ

اصل الحرج الضيق فما كان من معتادات المشقات فى الاعمال المعتادة مثلها فليس بحرج لغة ولاشرعا ـ

"মূলত হারাজ এর মর্ম হচ্ছে সংকীর্ণতা। কাজেই নিত্যদিনকার কাজকামে অভ্যাসগতভাবে যেসব কষ্ট হয় তা হারাজের অন্তর্ভুক্ত নয়, না আভিধানিক অর্থের দিক থেকে না শরী'আতে পারিভাষিক দিক দিয়ে। দেখা যাচ্ছে, মাশাক্কাত সম্বন্ধে পূর্বে যা বলা হয়েছে, হারাজ-এর বেলায়ও তা প্রযোজ্য।"[২২৪]

প্রবচন ঃ ২

মাশাক্কাত এবং হারাজ সম্বন্ধে শরী'আতের যে দৃষ্টিভঙ্গী তার প্রেক্ষিতে ফকীহগণ যে নীতিমূলক প্রবচন উদ্ভাবন করেছেন তা হচ্ছে ঃ الضرر يزال। অর্থাৎ ক্ষতি দূর করতে হবে।

---

২২৩. বুখারী ও নাসায়ী।

২২৪. আল মাওয়াফেকাত, ২য় খণ্ড, ১৬৭ পৃষ্ঠা।

কুরআন ও হাদীসে এ নীতির সমর্থন মিলে। হাদীসে পূর্বে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূল (সা) বলেন ঃ لاضرر ولاضرار فى الاسلام ـ

"ইসলামে (নিজে) ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ও (অন্যকে) ক্ষতিগ্রস্ত করার কোন অবকাশ নেই।

নিম্নোক্ত আয়াতটিও এর ওপর আলোকপাত করে ঃ

وَاعْلَمُوْا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ـ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهُ فِىْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ـ (الحجرات : ٧)

"আর জেনে রাখো, তোমাদের মধ্যে রয়েছেন আল্লাহ্‌র রাসূল। এমন অনেক ব্যাপার আছে, যদি রাসূল সেসব ব্যাপারে তোমাদের কথা মেনে চলেন তাহলে তোমরা কষ্টে (ضرر) পড়বে। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের জন্য ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং তাকে তোমাদের হৃদয়াগ্রাহী করেছেন; কুফরী, নাফরমানী ও গুনাহকে তিনি তোমাদের দৃষ্টিতে ঘৃণ্য করেছেন।"

ফকীহগণ এই আয়াতটির একটি ইঙ্গিতের উল্লেখ করে বলেন ঃ

قد اخبرت الاية ان اللّٰه حبب الينا الايمان بتيسيره وتسهيله وزينه فى قلوبنا بذلك ـ

"এই আয়াত জানিয়ে দিচ্ছে যে, দীনকে সহজ করে (تيسير ـ تسهيل) আল্লাহ্ আমাদের জন্য ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং তদুপায়ে তাকে আমাদের অন্তরে সুসজ্জিত করেছেন।[২২৫]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো বলেছেন ঃ

عليكم من الاعمال ماتطيقون فان اللّٰه لايمل حتى تملوا ـ

"যথাসামর্থ্য কাজ করে যাওয়াই তোমাদের কর্তব্য। (তোমাদের কাজের বহর যাই কিনা হোক) আল্লাহ্ বিরক্তি বোধ করেন না, বরং তোমরাই (কাজ করতে করতে) ক্লান্ত হয়ে পড়ছে।[২২৬]

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নীতি সম্পর্কীয় পূর্বে বর্ণিত রেওয়াত প্রসঙ্গত উল্লেখ করা হলো ঃ

وما خير عليه الصلوة والسلام من امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما ـ

---

২২৫. মুআত্তা ও দারে কুতনী।

২২৬. নাসায়ী ইত্যাদি

"রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যখন দু'টি ব্যাপারের মধ্য থেকে কোন একটিকে গ্রহণ করার ইখতিয়ার দেয়া হতো, তখন তিনি যেটা বেশি সহজ সেটাই গ্রহণ করতেন।[২২৭]

এই নীতি প্রয়োগের উদাহরণ

"الضرر يزال" -নীতির আওতায় ক্ষতির পথ রোধ করার ব্যাপারে উদ্ভাবিত বিধানসমূহের কয়েকটির সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত নিম্নে দেয়া গেল ঃ

خيار الفسخ অর্থাৎ বেচা-কেনার পণ্যের মধ্যে দোষ দেখা গেলে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে بيع (বিক্রয়) নাকচ (فسخ) করার خيار الرؤية (অর্থাৎ পণ্য দর্শন পর্যন্ত লেন-দেন স্থগিত রাখার ইখতিয়ার), خيار الشرط অর্থাৎ শর্তসাপেক্ষভাবে বেচা কেনার ইখতিয়ার ইত্যাদিতে ضرر-এর প্রতিরোধমূলক বিধান প্রণীত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত حق الشفعة অর্থাৎ জমি, বাড়ি ইত্যাদি বিক্রির ব্যাপারে সংলগ্ন জমি বা বাড়ির মালিকের অগ্রাধিকার; قصاص (শোণিত পণ), حدود (দণ্ডবিধান), كفارة (নিষিদ্ধ কর্মের প্রতিবিধান), امانة এবং ضمانة -এর জিনিস নষ্ট হয়ে গেলে তার ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের সুবিধা/অসুবিধার বিবেচনা, এমন কি বিচারক নিয়োগের ব্যাপারেও ফকীহগণ উক্ত নীতি প্রয়োগ করেছেন, যাতে যথাসম্ভব ক্ষতির পথ রোধ করা যায়।

প্রবচন ঃ ৩

الضرورة تبيح المحظورات -

"প্রয়োজন নিষিদ্ধ বস্তু (বা ব্যাপার)-কে মুবাহ (জায়িয) করে দেয়।"

কুরআন মজীদে এ নীতির ভিত্তি রয়েছে। মৃত প্রাণী, শূকরের মাংস এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে যবাহ করা জন্তুর গোশত হারাম ঘোষণার পর আল্লাহ্ বলছেনঃ

فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِاِثْمٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"যে ব্যক্তি চরম ক্ষুধায় বাধ্য হয়ে গুনাহের দিকে না গিয়ে (প্রয়োজনের অতিরিক্ত না খেলে) অবশ্যই আল্লাহ্ অসীম ক্ষমাশীল, দয়ালু।"

কাফির অভিশপ্ত হবে এবং عَذَابٌ عَظِيْمٌ ভোগ করবে এই কথার পর আল্লাহ্ বলছেন ঃ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ (النحل : ١٠٦)

"যার ওপর যবরদস্তী করা হয় অথচ তার মন অবিচল ঈমানে প্রশান্ত তার পক্ষে প্রাণ রক্ষার জন্য মুখে কুফরী বাক্য উচ্চারণ জায়েয।"

---

২২৭. আল মাওয়াফিকাত, ২য় খণ্ড, ১৩৬ পৃষ্ঠা।

কুরআন মজীদের এই মর্মের আয়াতের ভিত্তিতে ফকীহগণ উপরোক্ত নীতি (maxim) রচনা করেছেন এবং অনুরূপ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন, যথা ঃ

(ক) আক্রমণকারীকে সর্ববিধ উপায়ে হটিয়ে দেয়া জায়েয, এমনকি এতে আক্রমণকারীর মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকলেও।

(খ) গলায় কিছু আটকে গেছে এমনভাবে যে দম বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম , অথচ মদ্য ছাড়া নাগালের মধ্যে পানি বা অন্য পানীয় নেই, এ অবস্থায় প্রয়োজনের পরিমাণে মদ্য গেলা জায়েয ইত্যাদি।

ফকীহগণ উপরোক্ত নীতি প্রয়োগের কতিপয় শর্ত সাব্যস্ত করেছেন; যেমন ঃ

ماابيح للضرورة يتقدر بقدرها

"ضرورة (প্রয়োজন)-এর দরুন যাকে মুবাহ গণ্য করা হবে তার ব্যবহার করতে হবে প্রয়োজনের পরিমাণে।" এই শর্তের ভিত্তি হচ্ছে কুরআন মজীদের غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاثْمٍ বা غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ (২ ঃ ১৭৩) এবং অনুরূপ আয়াতাংশ। এই শর্ত অনুযায়ী ডাক্তার কিংবা ধাত্রীকে ঠিক অতটুকু অংশ অনাবৃত করে দেখানো জায়েয হবে যতটা না হলে চিকিৎসা বা সন্তান প্রসব করানো সম্ভব নয়।

مَاجاز بعذر بطل بزواله ـ

"ওযর (عذر)-এর কারণে যা জায়েয হয়, ওযর খতম হয়ে গেলে তা আর জায়েয থাকবে না।"

উদাহরণ ঃ জীবন রক্ষার জন্য যতটুকু পানি আছে তা দিয়ে অজু করা চলবে না, সুতরাং تيمم (তায়াম্মুম) জায়েয হবে। এ সংকট দূরীভূত হলে তায়াম্মুম জায়েয হবে না।

প্রবচন ঃ ৪

الضرر لايزال بالضرر ـ

"একটি ক্ষতিকে অন্য ক্ষতির সাহায্যে দূর করা হবে না।"

উদাহরণ ঃ খাদ্যাভাবে জান যাবে এমন এক অনন্যোপায় مضطر (মুদতার) ব্যক্তিকে অন্য এক ব্যক্তির যৎসামান্য খাদ্য খাইয়ে দেয়া জায়েয নয়। কারণ তাতে এক ব্যক্তির জান রক্ষা করতে গিয়ে আর এক জনের জীবন বিপন্ন করা হবে।

প্রবচন ঃ ৫

يتحمل الضرر الخاص لاجل دفع الضرر العام

"ব্যাপক (عام) ক্ষতি রোধের জন্য বিশেষ (خاص -সীমিত) কোন ক্ষতি বরদাশ্‌ত করতে হবে।" যেমন–

১. হোদাইবিয়াতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবাদের আপত্তি সত্ত্বেও মক্কাবাসীদের অন্যায় শর্তসমূহ মেনে নিয়েছিলেন, যাতে সে যাত্রা যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব হয়েছিল এবং পরিণামে মুসলিম পক্ষের বিস্তর লাভ হয়েছিল। যদিও আশু তাদের মর্যাদাহানি হয় এবং অত্যাচারের শিকার পলাতক মুসলিম আবূ জানদালকে অত্যাচারীদের হাতে সোপর্দ করতে হয়। যেমন–

২. (পূর্বে বর্ণিত হয়েছে) ইসলামের শত্রুরা তাদের কর্তৃত্বাধীন মুসলিমগণকে ঢালরূপে ব্যবহারের জন্যে তাদের বাহিনীর পুরোভাগে ঠেলে দেয় তাহলে বৃহত্তর স্বার্থে মুসলিম সেনাদলের জন্য তাদের নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করা জায়েয। যেমন–

৩. কারো দেয়াল বা গাছ যদি রাস্তার ওপর এমনভাবে ঝুঁকে পড়ে যাতে পথচারীদের জানের ক্ষতির কারণ বা যাতায়াতে বাধার সৃষ্টি এবং যদি মালিক তা সরাতে না চায় তাহলে কর্তৃপক্ষীয়দের জন্য দেয়াল বা গাছ পথ থেকে সরিয়ে ফেলা জায়েয বরং জরুরী হবে। যেমন–

৪. যে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি কারাগারে আবদ্ধ থাকে, এ ঋণ আদায়ের জন্য তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আদালত বা সংশ্লিষ্ট কৃর্তপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তার সম্পদ বিক্রি করা জায়েয, যাতে ঋণদাতারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। যেমন –

৫. ব্যবসায়ীরা পণ্যের মূল্য অত্যধিক বাড়িয়ে দিলে গণস্বার্থে রাষ্ট্রের পক্ষে পণ্যের দাম বেঁধে দেয়া জায়েয।

৬. যারা খাদ্য দ্রব্য মজুদ করে জনজীবন দুর্বিষহ করে তোলে, জোরপূর্বক তাদের মজুদকারীর মাল বিক্রি করে দেয়া জায়েয।

প্রবচন ঃ ৬

اعظم ضرر ايزال بالاخف -

"অপেক্ষাকৃত ছোট ক্ষতি দিয়ে (মেনে নিয়ে) বৃহত্তর ক্ষতি নিবারণ করতে হবে।"

যেমন জবর দখলকৃত কাঠ বা লোহা-লক্কড় ইমারতে লাগিয়েছে কিন্তু সে জবর দখলকারী ক্ষতিপূরণ করতে অস্বীকার করে এবং দেখা যায় ইমারত অপেক্ষা ঐ কাঠ বা লোহার মূল্য বেশি, তাহলে ইমারত ভেঙে কাঠ-লোহা ইত্যাদির ক্ষতিপূরণ করে দেওয়া জায়েয হবে।

অদ্রূপ যদি জবর দখলকৃত জমির ওপর ইমারত তৈরী করা হয়ে থাকে, তাহলে জমি এবং ইমারতের দামের তারতম্যের ভিত্তিতে উক্ত নীতিতে বিধান দিতে হবে।

মৃত মায়ের পেটে জীবিত সন্তান থাকার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেলে মায়ের পেট চিরে সন্তান বের করে নেওয়া জায়েয হবে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি এক খণ্ড মূল্যবান পাথর গিলে ফেলে এবং তারপর মারা যায়, তাহলে তার পেট চিরে সে পাথর বের করে নেয়া জায়েয নয়। কারণ শরীআতের দৃষ্টিতে মানুষের মর্যাদা সম্পদের মর্যাদার চাইতে অনেক বেশি। এ অবস্থায় মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে মূল্য আদায় করা হবে।

প্রবচন ঃ ৭

درء المفاسد اولى من جلب المصالح ـ

"মাসলাহাত (কল্যাণ) অর্জন অপেক্ষা ক্ষতি রোধ অগ্রগণ্য।" অর্থাৎ বৈধ কর্ম সম্পাদন করার তুলনায় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে দূরে থাকার ওপর শরী'আতে বেশি জোর দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

اذا امرتكم بشئ فأتوا منه ماستطعتم واذا نهيتكم عن شئ فاجتنبوه ـ

"যখন আমি তোমাদের কোন কাজ করার হুকুম করি তোমাদের শক্তি সামর্থ্য মোতাবিক তা সম্পাদন কর। আর যখন কোন কিছু করতে নিষেধ করি তখন তা থেকে দূরে থেকো।"

এই হাদীসে (امرتكم।) (হুকুম করার)সাথে "ما استطعتم" (তোমাদের শক্তিসামর্থ্য অনুযায়ী) শব্দদ্বয় যুক্ত করা হয়েছে, অথচ فاجتنبوه (তোমরা তা থেকে দূরে থেকো) কথাটির সাথে এমন কোন কথা যোগ করা হয়নি। এক্ষেত্রে বোঝা যায়, মান্য করার তুলনায় নিষিদ্ধ বর্জনের গুরুত্ব বেশি।

গুরুত্বপূর্ণ মাসলাহাতের তাগিদে খুঁটিনাটি বিষয়ে (جزئيات) উল্লেখিত মূলনীতি প্রয়োগের শিথিলতার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল ঃ

১. বাপ-মায়ের একজন যদি কিতাবী (ইয়াহুদী বা খৃষ্টান) এবং অন্যজন মাজূসী (অগ্নি উপাসক) হয় তাহলে সন্তানকে কিতাবী গণ্য করা হবে, অথচ (درء المفاسد। নীতি অনুযায়ী শিশু ধর্মীয় বিচারে "خير الابوين।" (বাপ-মার মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ) তার অনুসারী হয়। এই ক্ষেত্রে তাওহীদবাদী কিতাবী অগ্নিউপাসক মাজূসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সুতরাং এই সন্তান কোন প্রাণী যবাহ্ করলে তা হালাল হবে এবং যদি মেয়ে সন্তান হয় মুসলিমের সাথে তার বিয়েও জায়েয হবে।

২. যদি ছাগল মদ্য পান করে অথবা তাকে এ জাতের কোন হারাম খাদ্য খাওয়ানো হয় তাহলেও তার গোশত এবং দুধ হালাল হবে। যদিও তাকওয়া এবং درء المفاسد। নীতিতে তার গোশত এবং দুধ বর্জন করতে হয়। কিন্তু তা মাসলাহাত-এর খিলাফ তথা সমাজকে ক্ষতির সম্মুখীন করে।

৩. যদি কোনো ব্যক্তির উপার্জনে হালাল ও হারামের মিশ্রণ ঘটে এবং তার হালাল আয়ের পরিমাণ থাকে বেশি, তাহলে এহেন ব্যক্তির হাদিয়া (هدية =উপহার)ও দাওয়াত (دعوة) গ্রহণ করা জায়েয হবে, বিপরীত অবস্থায় হবে না। প্রসংগত উল্লেখ্য, যদি নিশ্চিত জানা যায় যে, এই হাদিয়া সামগ্রী ও দাওয়াতের খাদ্য সম্ভার হারাম আয় থেকে অর্জিত হয়েছে তাহলে তা গ্রহণ করা একেবারেই নাজায়েয।

৪. যদি একটি দোকানে হালাল ও হারাম উভয় পন্থায় লব্ধ পণ্য বিক্রয় হতে থাকে, তাহলে হারাম পন্থায় লব্ধ পণ্য চিহ্নিত না হওয়া পর্যন্ত সে দোকানে কেনাকাটা করা জায়েয।

প্রবচন ঃ ৮

اذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع -

যখন সংঘর্ষ বাধবে একটি মানি (مانع = বোধক, বাধা প্রদানকারী অর্থাৎ (নেতিবাচক) আর একটি মুকতাযী (مقتضى = দাবীদার অর্থাৎ ইতিবাচক) হুকুম -এর মধ্যে, তখন মানি হুকুমটি অগ্রগণ্য হবে।[২২৮] উদাহরণ ঃ

১. যেমন, কোন ব্যক্তির গায়ে দুটো আঘাতের মধ্যে একটি আঘাত ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়েছে; এ ক্ষেত্রে قصاص (তুল্য আঘাত বা মৃত্যুদণ্ড)। আর দ্বিতীয় আঘাতটি ভুলক্রমে করা হয়েছে; এতে কিসাস ওয়াজিব হয় না। এ অবস্থায় কিসাস ওয়াজিব হবে না, বরং দিয়াত (শোনিত পণ دية) ওয়াজিব হবে।

২. জানাবাত (جنابة -গোসল ওয়াজিব হয় এমন অপবিত্রতা) অবস্থায় গোসল ওয়াজিব, কিন্তু এমন অবস্থায় শহীদ হলে কি হবে? শহীদকে গোসল করানোর বিধান নেই। এই কারণে নেতিবাচক হুকুমকে অগ্রগণ্য মনে করে কোন কোন ফকীহ বলেন, জানাবাত অবস্থায়ও শহীদ হলে তাকে গোসল করানো জায়েয নয়। কিন্তু মনি (مانع)-কে অগ্রগণ্য স্থির করলে যদি গুনাহ কাবীরা (كبيرة = বড়) জনিত গুরু দণ্ড প্রাপ্তির অবস্থায় দাঁড়ায়, তখন মানিকে উপেক্ষা করতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ মাসলাহাতের ভিত্তিতে যেমন মৃত মুসলিম এবং অমুসলিমের লাশ এমন অবস্থায় রয়েছে যে, কোন্‌টি মুসলিমের লাশ, তা সনাক্ত করার উপায় নেই। শরী'আতের বিধান অনুযায়ী এমতাবস্থায় সবগুলি লাশের জন্য গোসল কাফন এবং নামায-এ জানাযা ওয়াজিব, অর্থাৎ অ-মুসলিম লাশের গোসল কাফ্‌ন ইত্যাদি যে হয় না এই মানি হুকুমটিকে অগ্রগণ্য করা হলে মুসলিমের লাশেরও গোসল, কাফন বাদ পড়ে যাবে এবং তাতে গুনাহ কাবীরা হয়ে যাবে। সুতরাং মানি হুকুমটি নামায শুদ্ধ হবার

---

২২৮. আল ইশ্‌বাহ ওয়ান নাযা-ইর, ৮৩ পৃষ্ঠা।

শর্ত (তথা তাহারাত (طهارة = পবিত্রতা, অযু, গোসল, তায়াম্মুম), সাত্‌রুল আওরাত (লজ্জাস্থান ঢাকা ستر العورة) এবং কিব্‌লা মুখী হওয়া,যদি কোনটিরই সামর্থ্য না থাকে অথচ এইগুলি নামাযের مانع -তাহলেও নামাযের সময় এলে নামায আদায় করতে হবে বলে ফকীহগণ মত প্রকাশ করেছেন। কারণ গুনাহ কাবীরা এড়াতে হবে। অনুরূপভাবে মিথ্যা বলা হারাম তথা মিথ্যা বলার হুকুম হচ্ছে مانع কিন্তু কোন গুরুত্বপূর্ণ মাসলাহাতের তাগিদে 'তারীয' (تعريض = ইংগিত, কথার মারপ্যাঁচে মিথ্যা বলা)-এর, এমন কি মিথ্যা বলারও অনুমতি আছে। মাসলাহাতের উদাহরণ যেমন লোকদের মধ্যে মিলমিশ বা ঝগড়া মিটমাট করে দেওয়া বা স্বামী-স্ত্রীর ভেঙে পড়া সম্পর্ককে জুড়ে দেবার এবং সম্পর্ক মধুর করার উদ্দেশ্যে 'তারীয'-এর মাধ্যমে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে।

প্রবচন ঃ ৯

الحاجة تنزل منزل الضرورة عامة او خاصة ـ

"প্রয়োজন (necessiy) ضرورة (emergency)-এর স্থান গ্রহণ করে, তা সাধারণ পর্যায়ের হোক বা বিশেষ পর্যায়ের।"

উদাহরণ ঃ যখন কোথাও সূদবিহীন ঋণ পাওয়া যায় না অতি প্রয়োজনে সে ক্ষেত্রে সূদে ঋণ নেওয়া জায়েয যদি প্রয়োজনটি শরী'আত সম্মত হয়।

প্রবচন ঃ ১০

اذ اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام ـ

"যখন হালাল ও হারাম উভয় একত্র হয়ে যায় তখন হারাম প্রাধান্য লাভ করে।[২২৯]

একই মর্মে একটি হাদীস যার বাচনভংগী কিছুটা ভিন্ন ধরনের, নিম্নরূপ ঃ

ماجتمع الحلال والحرام الا غلب الحرام ـ

ফকীহগণ এ থেকেই উপরোক্ত প্রবচন প্রণয়ন করেছেন এবং তাকে সম্প্রসারিত করেছেন নিম্নোক্ত রূপে ঃ

اذا تعارض دليلان احدهما يقتضى التحريم والاخر الاباحة قدم التحريمُ ـ

"যখন এমন ধরনের দুটি দলীলের সংঘাত হয়, যার একটির চাহিদা কোন কিছুকে হারাম করে দেয়া এবং অন্যটির চাহিদা তাকে মুবাহ করে দেয়া; তখন হারামকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।"

২২৯. যাইলায়ী, কিতাবু সইদ।

উদাহরণ ঃ ১. যেমন পশু যহেব করার সময় ছুরি ছিল এক মুসলিমের হাতে; কিন্তু কোন কাফির বা মুশরিক সে মুসলিমের হাত চেপে ধরে যদি ছুরি চালিয়ে দেয়, এ অবস্থায় যবাহ করা পশু হালাল হবে না।

২. যদি মৃত পশুর চর্বি তেলের সাথে মিশে যায় তাহলে সে তেল ব্যবহার করা জায়েয হবে না।

৩. যদি গাভীর দুধ গাধীর দুধের সাথে মিশে যায় তাহলে তা ব্যবহার করা জায়েয হবে না।

প্রবচন ঃ ১১

اذا ضاق الامر اتسع واذا اتسع ضاق

"যখন কোন হুকুমের পরিসর সংকীর্ণ হয়ে পড়ে তখন বিধানের ব্যাপকতা সাধন করা হবে, আবার যখন পরিসর ব্যাপক হয়ে পড়ে তখন তাকে সংকীর্ণ করতে হবে।"

উদাহরণ ঃ একজন উচ্চ স্তরের ফকীহ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর নিম্নোক্ত উক্তিতে এই নীতি প্রয়োগের একটি উদাহরণ দেখা যায়। তিনি বলেন ঃ

لايجعلن احدكم الشيطان من نفسه جزء لا يرى الا ان حقا عليه ان لا ينصرف الا عن يمينه ـ اكثر ما رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ينصرف عن شماله ـ

"কোন ব্যক্তি যেন নিজের মধ্যে শয়তানের জন্যে একটি বখরার ব্যবস্থা না করে– সে কেবল ভান দিক থেকে ঘুরে বসাকে ওয়াজিব গণ্য করে। আমি অনেক বার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বাম দিক থেকে ঘুরে (মুসল্লীদের দিকে মুখ করে) বসতে দেখেছি।"[২৩০]

নামাযে সালামের পর ইমাম ডান দিক থেকে বাম দিকে ঘুরে বসাটা কোন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, উভয় দিক থেকে ফিরে বসা সম্পর্কে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যে সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যে দিক থেকে ঘুরতে দেখেছেন, তিনি তেমনটা রেওয়ায়েত করেছেন। এ কারণে ফকীহগণ উভয় দিক দিয়ে ঘুরে বসাকে জায়েয গণ্য করেছেন। এদিক বা ওদিক কোন দিক থেকে ফেরাকে ওয়াজিব বলে মতপ্রকাশ করলে হুকুমের ব্যাপকতার স্থলে সংকীর্ণতা (ضيق) এসে গেল। এই সংকীর্ণতাকে রুখতে হবে এবং এই কারণেই হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ উপরোক্ত কড়া মন্তব্য করেছেন। বাম দিয়ে ফেরার পক্ষ সমর্থন করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়।

২৩০. মুসলিম।

হাদীসবিদগণের মধ্যে কেউ কেউ ডান দিক ওয়ালা হাদীসের নির্ভরযোগ্যতা অধিক মনে করে ডানদিক থেকে ঘুরে বসা শ্রেয় মনে করেন। কিন্তু কোন এক দিক থেকে ফিরে বসাকে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে নিলেই সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া হয় এবং ব্যাপককে সংকীর্ণ করা হয়। আল্লামা নববী (نووى) এই হাদীসটি উদ্ধৃত করার পর নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন ঃ

انما هى فى حق من يرى ان ذالك لابد منه فان من اعتقد وجوب واحد من الامرين فيخطى -

এই (উক্তি) তার-ই সম্পর্কে, যে একটি দিকে ফেরা অপরিহার্য মনে করে, যে ব্যক্তি দুটির মধ্যে একটিকে অপরিহার্য মনে করবে সে ভুল করবে।"

এ নীতির (اذا ضاق الامر اتسع واذا اتسع ضاق) প্রেক্ষিতে শরী'আত আইন প্রয়োগ সংস্থা (قوة نافذه)-কে ব্যাপক ইখতিয়ার দেয়। যখন কোন অগুরুত্বপূর্ণ কাজকে লোকেরা অপরিহার্য মনে করে এবং কার্যত তাকে ফরয ওয়াজিবের মর্যাদা দিতে থাকে তখন কিছুকালের জন্য তা ত্যাগ বা বন্ধ করা অনিবার্য হয়ে পড়ে। এ উপায়ে গর্হিত কর্মের ব্যাপকতায় সংকীর্ণতা আনয়ন করা হয়। অনুরূপভাবে কোন ভালো কাজের দিক থেকে যদি জনগণের দৃষ্টি সম্পূর্ণ সরে যায় তাহলে তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে এবং কিছুটা জোর তৎপরতা চালান যায়। এ উপায়ে হিতকর কর্মে উদাসীনতা (ضيق-সংকীর্ণতা) দূর করে তাতে ব্যাপক সচেতনা (اتساع। ব্যাপকতা) আনয়ন করা হয়।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনেক আহকাম থেকে এই নীতির উৎপত্তি প্রমাণিত হয়। এ প্রসংগে সম্পত্তির বণ্টন, গনীমত (غنيمة = যুদ্ধলব্ধ সম্পদ)-এর বণ্টন, ফায় (فئ-বিনা যুদ্ধে লব্ধ শত্রু-পরিত্যক্ত সম্পদ)-এর ব্যবস্থা, খায়বার বিজয়ের পর তথাকার ইয়াহুদীদের জমি বাগানগুলোর ব্যবস্থা ইত্যাদি।

এই একই নীতির প্রেক্ষিতে ধর্মপ্রাণ মুসলিম সেনাপতি-শাসকগণ বিজিত দেশসমূহের অধিবাসীদের ওপর চাপান উৎপীড়নমূলক ভূমিকর, বাণিজ্যে শুল্ক ইত্যাদি হ্রাস করেছেন, ভূমি-দাস প্রথা উচ্ছেদ করেছেন, ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করেছেন, সেচ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছেন, অরাজকতা, অশ্লীলতা ইত্যাদি বন্ধ করেছেন। সেনাপতি-শাসকবর্গ এসব কাজ করেছেন নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি বিবেচনা সম্মত উপায়ে। প্রয়োজনে তাঁরা খলীফার অনুমোদন চাইতেন খলীফা অনুমতি দিতেন নিজ ইখতিয়ারে, শুভ বুদ্ধির আলোকে যাতে অশুভ ضيق এবং اتساع। দুই-ই রুদ্ধ হয়। আব্বাসী আমলে খলীফা হারূনুর রশীদের প্রধান বিচারপতি হযরত ইমাম আবূ ইউসুফ-এর একটি উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

তিনি বলেন–

وارجو ان يكون ذالك موسعا عليه فكيف ماشاء من ذالك فعل ـ

"আমি আশা করি এ ব্যাপারে খলীফার যে সুপ্রশস্ত ইখতিয়ার রয়েছে তাকে তিনি যেভাবে ইচ্ছা (জনকল্যাণে) প্রয়োগ করবেন।"[২৩১]

তিনি আরো বলেছেন ঃ

واعمل بما ترى انه اصلح للمسلمين واعم نفعا لخا صتهم وعامتهم واسلم لك فى دينك ـ

"মুসলিমদের জন্য তোমার (হারূনুর রশীদের) বিবেচনায় যা সব চাইতে বেশি কল্যাণকর, যাতে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং সাধারণ লোকদের ব্যাপক উপকার রয়েছে, এবং যা তোমার দীনের হেফাযতের জন্য সব চাইতে প্রকৃষ্ট তাই তুমি করো।"[২৩২]

ফলকথা, মুসলিম শাসকগণ কল্যাণ রাষ্ট্ররূপে দেশ শাসনের বেলায় উপরোক্ত নীতির অনুসরণ ব্যাপারে ব্যাপক ইখতিয়ার রাখেন।

ওয়াক্‌ফ-এর ব্যাপারে ফকীহদের মত এই নীতির আর একটি উদাহরণ ঃ

يجوز له مخالفة الشرط اذا كان غالب جهات الوقف قوى ومزارع فيعمل بامره وان غاير شرط الوقف لان اصلها لبيت المال ـ

"ওয়াকফের অধিকাংশই যখন গ্রামীণ ও কৃষি জমি হয় তখন খলীফা (বা তাঁর প্রতিনিধি) তাঁর হুকুম অনুযায়ী ব্যবস্থা করবেন, এমন কি তাতে যদি ওয়াকফের শর্তসমূহের বিরোধিতাও হয়; কারণ নীতিগতভাবে এইরূপ ওয়াকফ সম্পত্তি বাইতুল মালের সম্পদের সদৃশ (যার ওপর খলীফার পূর্ণ ইখতিয়ার রয়েছে)।[২৩৩]

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কর্মপদ্ধতি

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিশেষ কয়েকটি কর্মকে এড়িয়ে যাওয়া হয় যে, ঐগুলি তাঁর خصوصية বা খাস ব্যাপার (সুতরাং ঐ গুলি সাধারণ আইনের নিয়মের আওতায় আসে না)। আসলে একটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, সেগুলি থেকে উল্লেখিত নীতির প্রতি সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন,

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে আরয করেন, আমি অপরাধ করেছি (শরাব পান করেছি)। আমাকে শাস্তি দিন। তিনি বলেন, "তুমি না এখনি আমাদের সাথে নামায পড়লে?"

---

২৩১. কিতাবুল খারাজ, আবূ ইউসুফ, ৫৯ ও ৬০ পৃষ্ঠা; 'ইসলাম কা যারঈ নিযাম' কিতাব থেকে গৃহীত।

২৩২. ঐ।

২৩৩. দররুল মখতার, ১ম খণ্ড, 'ইসলাম কা যারঈ নিযাম' থেকে।

সে জবাব দেয়, "জ্বি হাঁ।"

তিনি বলেন, "যাও, আল্লাহ্ তোমার গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন।"

এই ক্ষমার প্রভাব সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ওপর এমনভাবে পড়ে যে, এরপর থেকে সে চিরকালের জন্য শরাব পান করা থেকে তাওবা করে। একটি রেওয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, সেই ব্যক্তি বললো, "আপনার কোড়া অর্থাৎ চাবুকের (শরাব পানের সাজা) ভয়ে শরাব পান ত্যাগ করাকে আমি নিজের জন্য অবমাননাকর মনে করছিলাম। কিন্তু এখন যখন আপনি আমাকে মাফ করে দিলেন তখন, আল্লাহ্‌র কসম, আমি ঐ অভিশপ্ত জিনিসটি আর কখনো স্পর্শ করবো না।"[২৩৪] অপরাধ করে তা স্বেচ্ছা প্রণোদিতভাবে স্বীকার করা এবং শাস্তির আবেদন করা– এ থেকে রাসূল (সা)-তার অন্তরে গভীর এবং খাঁটি অনুশোচনা বা তাওবা আঁচ করতে পেরেছিলেন বলে শারী'আতের বিধান মাওকুফ করে দিলেন। ফল হল অতীব সন্তোষজনক। একটি ঘটনায় অপরাধীর পরিবর্তে নিরপরাধ (যিনি অপরাধীকে বাঁচাবার জন্য এসেছিলেন) পাকড়াও হয়ে যান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে শাস্তির হুকুমও শুনিয়ে দেন। এ অবস্থা দেখে অপরাধি নিজেই এগিয়ে এসে নিজের অপরাধ স্বীকার করে নেয় এবং দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তি অপরাধমুক্ত ঘোষণা করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উভয়ের শাস্তি মাফ করে দেন। ধৃত ব্যক্তিকে এজন্য মাফ করেন যে, তিনি আসলে অপরাধী ছিলেন না। আর অপরাধীকে এজন্য যে, তিনি নিরপরাধ ব্যক্তির জান বাঁচাবার তথা তার অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় নিজের অপরাধ স্বীকার করে নেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) অপরাধীকে বললেন, তুমি খাঁটি তাওবা করেছো। হযরত উমর (রা)-এর মনে খটকা ঠেকলো যে, অপরাধ স্বীকারের পর অপরাধীকে শাস্তি না দেয়া তাকে শাস্তি প্রদানের প্রয়োজনীয়তার প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।[২৩৫] কিন্তু দূরদর্শী রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর মতে, অবিচল রইলেন। এই অপরাধীর অপরাধ স্বীকারের মধ্যে তার সাচ্চা তাওবার যে দেদিপ্যমান প্রকাশ হয়েছিল, শাস্তি দিলে তা হয়ত হতো না। সুতরাং তিনি তার Prerogative ব্যবস্থা করলেন। খালাস দেওয়ার পক্ষে– ضيق-এর মোকাবিলায় তিনি اتساع-এর পথ ধরলেন। মুসলিম শাসক এবং বিচারককে শরী'আত অবস্থা বিশেষে এ রূপ ইখতিয়ার দিয়েছে। তবে এই ইখতিয়ার ব্যতিক্রমধর্মী, সাধারণত ফৌজদারী মামলায় তা প্রয়োগ করা যায়। যদি কারীনা (قرينة বহুবচনে قرائن ইংগিত) বা অবস্থা দৃষ্টে শুভ পরিণতি প্রত্যাশা করা যায়।

প্রবচন ঃ ১২

الاحكام الظاهرة تابعة للادلة الظاهرة ـ

---

২৩৪. আলামুল মূকিঈন।

২৩৫. নাসায়ী।

"প্রকাশ্য আহকাম প্রকাশ্য দলীল-প্রমাণের অনুবর্তী হবে"। অর্থাৎ প্রকাশ্যভাবে যা দলীল প্রমাণ পাওয়া যাবে, মামলার রায় হবে তারই ভিত্তিতে; আমরা মানুষ, যা দৃশ্য বা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য (ظهر) তাই আমরা জানতে পারি, অদৃশ্য বা باطن এর খবর রাখেন আল্লাহ্।

এই ظاهر -এর ভিত্তিতেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) উক্ত ব্যক্তিকে শাস্তির হুকুম দেন যদিও সে আসলে অপরাধী ছিল না। কিন্তু প্রকাশ্য সাক্ষ্য-প্রমাণ তাকেই অপরাধী সাব্যস্ত করেছিল।

প্রবচন ঃ ১৩

تَصرُّفُ الامامِ على الرعية منوط بالمصلحة ـ

"জনগণের ব্যাপারে ইমামের ইখতিয়ার কল্যাণ নির্ভর হতে হবে।" ইসলামী শরী'আতে আইন প্রয়োগকারী শক্তি ডিকটেটর বা একনায়ক রাজশক্তির পর্যায়ভুক্ত নয়। জনগণের সাথে তার সম্পর্ক প্রভু ও গোলামের মতো নয়। বরং তার অবস্থান "আমানতদার" (امين)-এর, যেমন কুরআনে বলা হয়েছে–

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوْا الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ـ (النساء : ٥٨)

"আবশ্যি আল্লাহ্ তোমাদের হুকুম দেন, আমানতসমূহকে তাদের প্রাপকদের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে, আর যখন তোমরা লোকদের বিচার-আচার করবে তখন আদল (عدل = ইনসাফ)-এর ভিত্তিতে ফায়সালা করবে।"

'আমানত' সাধারণভাবে আমরা বুঝি কারো কাছে কিছু অর্থ বা সম্পদ গচ্ছিত রাখা। কিন্তু -এর অর্থ খুবই ব্যাপক। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস্‌উদ (রা), হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) প্রমুখ বিপুল মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবীগণের ব্যাখ্যার আলোকে মুফাস্‌সিরগণ বলেন ঃ

ان الامانات جمع امانة يعم الحقوق المتعلقة بذمتهم من حقوق الله تعالى وحقوق العباد ـ

"আয়াতে উল্লেখিত امانات শব্দটি امانة -এর বহুবচন; তাদের (আমানতদারদের) দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত আল্লাহ্‌র সমস্ত অধিকার এবং বান্দাদের যাবতীয় অধিকার সমভাবে এই শব্দের অর্থের শামিল।"[২৩৬]

---

২৩৬. ইসলাম কা যার'ঈ নিযাম, ২৯১ পৃষ্ঠা।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত যায়দ ইব্‌ন আসলাম (রা) বলেন ঃ

ان هذا الخطاب لولاة الامر ان يقوموا برعاية الرعاية وحملهم على موجب الدين والشريعة وعدوا من ذلك تولية المناصب مستحقيها ـ

এই আয়াতে يامركم বলে শাসকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, তারা যেন তাদের কর্তৃত্বাধীন সব মানুষের অধিকার সংরক্ষণ করে তাদেরকে দীন ও শরী'আতের চাহিদা পূরণে অভ্যস্ত করে, রাষ্ট্রের দায়িত্বপূর্ণ পদগুলোতে যোগ্য লোকদের নিয়োগও এই আমানত শব্দের অর্থের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হয়।[২৩৭]

আইন প্রয়োগকারী অর্থাৎ শাসন কর্তৃপক্ষের সমস্ত ক্ষমতা ও ইখতিয়ার মানুষের কল্যাণে পরিচালিত হতে হবে, ব্যক্তিগত স্বার্থ অথবা স্বজনপ্রীতি ইত্যাদির শরী'আতে কোন অবকাশ নেই। ফিক্‌হ গ্রন্থগুলিতে আরো বলা হয়েছে ঃ

ويجب على الامام ان يتق الله ويصف الى كل مستحق قدر حاجته من غير زيادة فان قصر فى ذالك كان الله حسيبا ـ

"ইমামের কর্তব্য আল্লাহ্‌কে ভয় করা এবং প্রত্যেক হকদারের জন্য তার প্রয়োজন মত বখরা নির্ধারণ করা যেন তার অধিক না হয়। যদি ইমাম ত্রুটি করে তবে নিকেশ করবার জন্য আল্লাহ্ রয়েছেন।[২৩৮]

অতএব দেখা যায়, আইন প্রয়োগকারী সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়। যদি সে শারী'আতের খেলাফ রায় দেয় তাহলে, ফকীহগণ বলেন ঃ

لم ينفذ امره شرعا الا اذا وافقه فان خالفه لم ينفذ তাহলে তার রায় আইনত কার্যকরী হবে না। শরী'আত সম্মত হলেই কার্যকরী হবে, শরী'আত বিরুদ্ধ হলে হবে না।[২৩৯] দৃশ্যত কল্যাণকর অথচ পরিণামে অকল্যাণ বা অসুবিধাজনক কাজের আদেশ দেয়ার অধিকারও তার নেই। যথা এমন জায়গায় মসজিদ নির্ধারণের বা মসজিদের পরিসর বৃদ্ধি করার অনুমতি দেয়া জায়েয নয়, যে জায়গার সাথে জনগণের স্বার্থ জড়িত থাকে এবং যার ফলে ব্যবসায়ে কষ্ট হয়।

ওয়াকফ (وقف) এবং য়াতীমদের ব্যাপারে এ নীতির প্রয়োগ

ফকীহগণ বলেন ঃ

تصرف القاضى فى اموال اليتامى والتركات والا وقاف مقيد بالمصلحة فان لم يكن مبنيا عليها لم يصح ـ

---

২৩৭. ইসলাম কা যার'ঈ নিযাম, ২৯১ পৃষ্ঠা।

২৩৮. যাইলা'ঈ আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর থেকে।

২৩৯. যাইলা'ঈ আলা ইশবাহ ওয়ান নাযাইর থেকে, পৃষ্ঠা ঃ ৮৮।

"য়াতীমের সম্পদ, মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি ও ওয়াকফকৃত সম্পত্তির ব্যাপারে কাযীর অধিকার শর্ত সাপেক্ষ মাস্‌লাহাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত না হলে তা শুদ্ধ (কার্যকর) হবে না।"২৪০

মাস্‌লাহাতের ব্যাপারে ফকীহগণের সতর্কতার একটি উদাহরণ হচ্ছে; তাঁদের মতে ওয়াক্‌ফের আয় থেকে মসজিদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবার জন্য মাইনে করা লোক নিয়োগ জায়েয নয়, যদি বিনা পরিশ্রমিকে কেউ এ কাজে এগিয়ে আসার সম্ভাবনা থাকে। অবশ্য যদি ওয়াকিফ (واقف যিনি ওয়াক্‌ফ করেন)-এর শর্তাবলীতে এই খবর অন্তর্ভুক্ত থাকে কিংবা স্বেচ্ছাসেবী না পাওয়া যায় তবে জায়েয হবে। ফকীহগণ আরো বলেন ঃ

ان من القضاء الباطل القضاء بخلاف شرط الواقف لان مخالفته كمخالفة النص ـ

"ওয়াকিফের শর্তাবলীর প্রতিকূলে বিচারকের ফায়সালা বাতিল গণ্য হবে। কারণ ওয়াকিফের বিরোধিতা নাস (কুরআন হাদীস)-এর বিরোধিতার মতো।"২৪১

তবে ওয়াকফকৃত সম্পদের বৃদ্ধি ও উন্নতির ব্যবস্থা বা সম্পত্তির মুতাওয়াল্লী (متولى) বা তত্ত্বাবধায়ক (منتظم) যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বা চরিত্র দোষে সম্পদের ক্ষতি সাধন করে, তাকে বরখাস্ত করার অধিকার কাযী বা কর্তৃপক্ষের অবশ্যই থাকবে।২৪২

এ নীতির আওতায় ফকীহগণ বলেন ঃ

لايملك القاضى التصرف فى مال اليتيم مع وجود وصية ولو كان منصوبه ـ

"য়াতীমের(وصى)২৪৩ বর্তমান থাকতে কাযী (শাসক) য়াতীমের সম্পদে হস্তক্ষেপ করার অধিকার রাখে না। কাযী নিজেই وصى নিযুক্ত করলেও না।"

অনুরূপভাবে মুতাওয়াল্লীর অধিকার সম্বন্ধে ফকীগণের নীতি হচ্ছে ঃ

ان القاضى لايملك عزل القيم على الوقف من جهة الواقف الا عند ظهور الخيانة منه ـ

---

২৪০. আল আশবাহ ওয়ান নাযা-ইর, ৮৮পৃষ্ঠা।

২৪১. ঐ, ৮৯ পৃষ্ঠা।

২৪২. রদ্দুল মুহতার, ৩য় খণ্ড।

২৪৩. ওয়াসী (وصى) অর্থ মনোনীত অভিভাবক (troustee বা executor) যাকে প্রকৃত অভিভাবক (যথা বাপ বা দাদা) জীবদ্দশায় তাহার অন্তিম ইচ্ছা (وصية) রূপে মনোনয়ন দান করেন, যাতে সে য়াতীম ছেলে-মেয়ের ও সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করতে পারে।

কাযীর অধিকার নেই ওয়াকিফ কর্তৃক নিয়োজিত قيم (administatar বা মুতাওয়াল্লী)-কে বরখাস্ত করার, যে পর্যন্ত খিয়ানত (خيانة) প্রমাণিত না হয়। তাঁরা আরো বলেন ঃ

لا يملك القاضى التصرف فى مال الوقف مع وجود ناظره ولو من قبله -

"ওয়াকফের ব্যবস্থাপকের উপস্থিতিতে কাযী বা শাসক ওয়াকফের সম্পত্তিতে কোন ইখতিয়ার খাটাতে পারবে না, এমন কি যদি কাযী কর্তৃক ব্যবস্থাপক নিযুক্ত হয়।"২৪৪

এ নীতির আওতায় কতিপয় বিধানের উদাহরণ নিম্নরূপ ঃ

১. অভিভাবক (ولى)২৪৫-এর উপস্থিতিতে কাযী বা শাসক নিজ ইখতিয়ারে য়াতীম ছেলের ও য়াতীম মেয়ের বিয়ে দিতে পারেন না।

২. নিহত ব্যক্তির ولى চাইলে হত্যাকারী থেকে কিসাস (প্রাণের বদলে প্রাণ) নিতে পারে, دية বা শোণিত পণ আদায় করে আপোষ করতে পারে অথবা তাকে মাফ করে দিতে পারে। কিন্তু মাফ করে দেয়ার অধিকার নেই।

ولى বর্তমান না থাকলে অথবা ولى-এর খিয়ানত প্রমাণিত হলে (যথা ولى ধনের লোভে ছেলে বা মেয়ের স্বার্থ উপেক্ষা করে অসঙ্গত জায়গায় বিয়ে দিতে উদ্যত হলে) কাযী বিয়ের ব্যাপারে অভিভাবকত্ব লাভ করবে। নিঃসন্দেহে এমন অবস্থায় ولى-এর অভিভাবকত্ব বাতিল হয়ে যাবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অভিভাবকত্বের ব্যাপারে স্তরভেদ এবং ইখতিয়ারের প্রভেদ রয়েছে। যেমন ঃ

১. পর্যায়ক্রমে য়াতীমের বাপ ও দাদা উভয়েই অর্থ ও বিয়ে উভয় ব্যাপারে অভিভাবকত্ব লাভ করবে। এরা দু'জন নিজেদের এই অধিকার থেকে অব্যাহতি চাইলেও তারা অব্যাহতি পাবে না।

২. য়াতীমের মা, ভাই, চাচা, চাচাতো ভাই ইত্যাদি কতিপয় আত্মীয় পর্যায়ক্রমে অভিভাবকত্ব লাভ করতে পারে, তারা বিয়ের অভিবাবকত্ব লাভ করবে, সম্পদের অভিভাবকক্ত লাভ করবে না।

৩. অনাত্মীয় অছি (وصى) শুধুমাত্র সম্পদের অভিভাবকত্ব লাভ করবে, বিয়ের অভিভাবকত্ব লাভ করবে না।

---

২৪৪. আল আশ্‌বাহ ওয়ান নাযা-ইর, ১১৫ পৃষ্ঠা।

২৪৫. ولى (বহুবচন اولياء) হচ্ছে এমন নিকট আত্মীয় (রক্ত সম্পর্কে) যে, কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর শারীআত অনুযায়ী তাহার য়াতীম ছেলে-মেয়ের অভিভাবকত্ব (ولاية) প্রাপ্ত হয়।

প্রবচন ঃ ১৪

الامور بمقاصدها

"উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে কাজের বিচার হবে।"

এই মূলনীতির আওতায় প্রদত্ত বিধানের কয়েকটি উদাহরণ নিম্নরূপ ঃ

১. মদ তৈরী করার উদ্দেশ্যে না হয়ে যদি সিরকা বানাবার বা বিক্রির উদ্দেশ্যে আঙ্গুর ইত্যাদি ফলের রস নিংড়ানো হয় তাহলে তা বৈধ।

২. কারোর সাথে সম্পর্ক তিন দিনের বেশি ছিন্ন রাখা জায়েয নয়। কিন্তু উদ্দেশ্য যদি মূলত সম্পর্ক ছিন্ন করা না হয়ে থাকে বরং তাতে শারীআত সম্মত কোন উদ্দেশ্য থাকে তাহলে তিন দিনের বেশিতে কোন ক্ষতি নেই।

৩. স্বামীর মৃত্যু ছাড়া আর কারোর মৃত্যুতে স্ত্রীর জন্য তিন দিনের বেশি শোক প্রকাশ করা জায়েয নয়। কিন্তু যদি শোক প্রকাশ করা উদ্দেশ্য না হয়ে থাকে তাহলে তিন দিনের বেশি সময় সাজসজ্জা (শোক প্রকাশের একটি পদ্ধতি) ইত্যাদি পরিত্যাগ করায় কোন ক্ষতি নেই।

৪. শত্রু যদি মুসলিমদের এবং তাদের স্ত্রী ও শিশু সন্তানদের যুদ্ধের ময়দানে মুসলিমদের সামনে ঠেলে দেয়, জবাবী হামলায় যদি তাদের হত্যা করা উদ্দেশ্য না হয়ে থাকে বরং শত্রুর কাছে পৌঁছে যাওয়াই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এবং এছাড়া আর দ্বিতীয় কোন পথ না থেকে থাকে, তাহলে মুসলিমদের ওপর আক্রমণ করায় কোন ক্ষতি নেই।

৫. নামাযের উদ্দেশ্য পাল্টে যায়, নামাযে রত অবস্থায় এমন কাজ করলে নামায বাতিল (باطل) হয়ে যায়, যথা ঃ কোন ব্যক্তির কথার জবাবে কুরআন মজীদের কোন আয়াত তিলাওয়াত করা; সুখবর শুনে 'আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ' বলে ফেলা; অপ্রীতিকর কোন কথা শুনে 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলা; মৃত্যুর খবর শুনে 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়ে ফেলা।

৬. প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা বা বজায় রাখার জন্য কুফরীর ফতওয়া দেওয়া শারীআত বিরুদ্ধ কর্ম; বিশেষত এই জন্য যে এ জাতের উদ্দেশ্যমূলক কুফরী ফাতওয়া মুসলিম জনগণের ঐক্য বিনষ্ট করে।

৭. নিত্যকার অভ্যাস অনুযায়ী নয়, নিছক লোভের বশবর্তী হয়ে ক্ষুধা নিবারণের প্রয়োজনের চাইতে বেশি করে খাওয়া হারাম। কিন্তু রোযা রাখার উদ্দেশ্যে বা নিমন্ত্রণকারীর আবদারে কিছু অতিরিক্ত আহার জায়েয।

৮. যে সিন্দুকে বা গাঁঠরীতে কুরআন মজীদ রাখা আছে যদি তার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে অথবা তাকে অবমাননার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তার ওপর বসা যায়, তাহলে তাতে কোন ক্ষতি নেই; সাধারণ অবস্থায় তা নাজায়েয।

প্রবচন ঃ ১৫

اليقين لايزول بالشك

"বিশ্বাস বা নিঃসন্দেহ অবস্থা সন্দেহের দ্বারা অপসারিত হয় না।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথায় এ প্রবচনের সূত্র পাওয়া যায় ঃ

اذا وجد احدكم فى بطنه فاشكل عليه اخرج منه شئ ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا ـ

"যদি কেউ পেটে এমন কিছু অনুভব করে যাতে তার পক্ষে, পেট থেকে [অযূ (وضوء) ভঙ্গকারী] কোন জিনিস বেরুলো কি-না বোঝা মুশকিল হয়, তাহলে সে অবশ্যই মসজিদ থেকে বেরোবে না (অযূ করবার জন্য), যতক্ষণ না সে (বায়ু নিঃসরণের) শব্দ শোনে বা গন্ধ পায়।"[২৪৯]

কারণ প্রথম অবস্থাটি অর্থাৎ তার পবিত্রতার (طهارة) কথাটি ছিল নিঃসংশয়, এখন সন্দেহ হচ্ছে অযূ ভেঙ্গে গেল নাকি। এই সন্দেহ পূর্ববর্তী নিঃসংশয় অবস্থার অবসান ঘটাবে না।

অন্য কথায় একই প্রবচনের রূপ

الاصل بقاء ما كان على ما كان

"নীতি হচ্ছে (সন্দেহের অবস্থায়) যে অবস্থা আগে ছিল তার স্থিতি।

হাদাছ (حدث অযূ ভঙ্গের অবস্থা) হয়েছে বলে সন্দেহে ফের অযূ করতে হবে না, তেমনি হাদাছ হয়েছিল জানা সত্ত্বেও মনে হচ্ছে হয়তোবা অযূ আছে তাহলে অযূ করতে হবে।

অদ্রূপ কোন স্থানের মাটি বা ধূলা, কাদা ইত্যাদিকে পাক মনে করা হবে যতক্ষণ তার সম্পর্কে নাপাক হওয়ার নেঃসন্দেহ প্রমাণ না পাওয়া যাবে অথবা নাপাক সম্বন্ধে প্রবলতর ধারণা (ظن غالب) না হবে (সে মাটির নামায পড়া বা তা দিয়ে তায়াম্মুম করা চলবে)।

কোন ব্যক্তি সুবহে সাদিক (صبح صادق-উষা)-এর আগমন হয়নি বলে মনে করে যদি সাহ্‌রী খায় এ অবস্থায় তার রোযা হয়ে যাবে। কারণ পূর্ববর্তী অবস্থার (রাত) বাকি থাকাই হচ্ছে আসল। কিন্তু উত্তম হচ্ছে, এমন অবস্থায় সাহ্‌রী না খাওয়া। বিশেষ করে যখন আকাশে মেঘ থাকে বা চাঁদনী রাতের কারণে সময়ের সঠিক নির্ধারণ সম্ভব না হয়। বিপরীত পক্ষে যদি সূর্য ডোবার ব্যাপারে সন্দেহ থাকে তাহলে ইফতার জায়েয হবে না।

---

২৪৯. মুসলিম শরীফ।

প্রবচন ঃ ১৬

من شك فعل شيئا ام لا فالاصل انه لم يفعل ـ

"যার কোন কাজ করার ও না করার ব্যাপারে সন্দেহ হয় তবে না করাই আসল বলে মেনে নেয়া হবে।" অনুরূপভাবে–

من تيقن الفعل وشك فى القليل والكثير فعلى القليل ـ

"যদি কোন কাজ করার ব্যাপারে নিশ্চিত থাকে কিন্তু তার মধ্যে কমবেশি হবার ব্যাপারে সন্দেহ হয়, তাহলে কমের ওপর আমল করা হবে।"

প্রথম অবস্থায় না করা নিশ্চিত ধরতে হবে এবং দ্বিতীয় অবস্থায় কাজ করা নিশ্চিত জ্ঞান করতে হবে। আর যেমন ফিক্‌হে বলা হয় ঃ

ماثبت بيقين لايرتفع الا باليقين ـ

"যে কথা প্রত্যয় (يقين) দ্বারা প্রমাণিত তাকে প্রত্যয়ই খতম করতে পারে।"

ফকীহদের ব্যবহৃত চারটি শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ লক্ষণীয় ঃ

১. يقين = ظن غالب অর্থাৎ প্রবল ধারণা;

২. ظن = ترجيح جهة الصواب অর্থাৎ صواب (সত্যতা)-র দিককে অগ্রগণ্য করা (ترجيح)

৩. الوهم = رجحان جهة الخطاء অর্থাৎ خطاء (ভুল)-এর দিকটি অগ্রগণ্য হওয়া;

৪. الشك = تساوى الطرفين সন্দেহ বলতে উভয় দিকের সমান সম্ভাবনা বুঝতে হবে।

ফকীহগণের মতে شك অর্থাৎ সন্দেহযুক্ত অবস্থায় যদি কোন একদিকে পাল্লা ভারী (ظن غالب) না হয় তাহলে হুকুম বা বিধান شك এর ভিত্তিতে হবে, যাতে করে شك উন্নীত হয় يقين-এর পর্যায়ে, যেমন–

১. তালাক দেওয়া হয়েছে কি হয়নি বলে যে ব্যক্তির মনে সন্দেহ হয়, বিধান হবে তালাক দেয়া হয়নি। যদি সন্দেহ হয় দুই তালাক দেয়া হয়েছে না তিন তালাক, তাহলে দুই তালাক ধরা হবে।

২. নামায পড়ার বা না পড়ার ব্যাপারে যার মনে সন্দেহ হয় তাকে পুনর্বার নামায পড়তে হবে। আর যদি রাকআতের সংখ্যার ব্যাপারে সন্দেহ থাকে (যথা দু'রাকআত কি তিন রাকআত) তাহলে কম সংখ্যাটাই সঠিক বলে হুকুম দেয়া হবে।

৩. যদি ইমাম ও মুকতাদী (مقتدى)দের মধ্যে রাকআতের সংখ্যা নিয়ে মতবিরোধ হয় এবং ইমামের নিজের কথার ওপর তাঁর প্রত্যয় (يقين) থাকে,

এক্ষেত্রে নামায আবার পড়ার দরকার নেই। আর যদি প্রত্যয় না থাকে, তাহলে আবার পড়া জরুরী।

৪. যুহর (ظهر)-এর নামাযের নিয়ত বেঁধেছে। এক রাকআত পড়ার পর তার সন্দেহ হয়, সে আসর (عصر)-এর নামায পড়ছে, তৃতীয় রাকআতে সন্দেহ হয়, সে নফল (نفل) পড়ছে, চতুর্থ রাকআতে সন্দেহ হয়, সে যুহরের নামাযই পড়ছে। এ অবস্থায় সন্দেহের কোন মূল্য বা প্রভাব থাকবে না এবং যুহরের নামায হয়ে যাবে।

কম ও বেশি এই সংক্রান্ত নীতি থেকে নিচের কয়েকটি অবস্থা ব্যতিক্রম গণ্য হবে। এগুলি সাধারণত অন্যের হক (حق) বা অধিকারের সাথে সম্পর্কিত। যেমন

১. এক ব্যক্তির কাছে কয়েক ধরনের সম্পদ আছে এবং সবগুলির ওপর যাকাত (زكوة) ওয়াজিব হয়। কিন্তু সন্দেহ হল, যত রকমের সম্পদ আছে সবগুলি তার মালিকানায় পূর্ণ একটি বছর রয়েছে কিনা। এক্ষেত্রে সমগ্রের উপর যাকাত দিতে হবে, কারণ এতে দুঃস্থজনের অধিকার সংশ্লিষ্ট।

২. যদি ধরে নেয়া যায় যে, তালাক ও মৃত্যুর ইদ্দত (عدة)-এর মধ্যে সন্দেহ দেখা দিয়েছে,এক্ষেত্রে দীর্ঘতর অর্থাৎ মৃত্যুর ইদ্দত চার মাস দশ দিন পালন করতে হবে।

প্রবচন ঃ ১৭

الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته ـ

"নীতিগতভাবে নতুন ঘটনার সম্পর্ক হবে নিকটবর্তী সময়ের সাথে।"

১. তালাকপ্রাপ্ত মহিলার দাবি হচ্ছে, স্বামী মৃত্যু-রোগের সময় তাকে তালাক দিয়েছিল, কাজেই সে পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকার (ميراث)-এর দাবিদার। অন্যদিকে ওয়ারিস (وارث)-গণ বলছে, অন্তিম রোগে আক্রান্ত হবার আগেই তালাক দিয়েছিল, কাজেই মীরাসে তার হক নেই। কোন পক্ষই কিন্তু তাদের দাবি প্রমাণ করতে পারছে না। এ অবস্থায় উল্লেখিত নীতির পরিপ্রেক্ষিতে মহিলার কথা গ্রাহ্য হবে। কারণ তার দাবি নিকটতর সময়ের সাথে সম্পৃক্ত।

২. এক ব্যক্তির কাপড়ে নাজাসাত (نجاسة = নাপাক জিনিস) লেগেছে; যখন সে নামায পড়ছিল ঠিক কখন লেগেছিল তা সম্যক নিরূপন সম্ভব নয়। এ অবস্থায় নিকটবর্তী সময়ের সাথে নাজাসাত লাগা সম্পর্কিত হবে। ফলে সে সময়ের পূর্বে সম্পাদিত নামায নয়, কেবলমাত্র শেষ দিকের নামাযই পুনর্বার পড়তে হবে। অবশ্য সম্পূর্ণ নামায পুনঃরায় পড়া উত্তম।

৩. পানির কূয়ায় মরা ইঁদুর পাওয়া গেল। কবে থেকে ইঁদুরটি মৃত অবস্থায় কূয়ায় পড়ে ছিল তা জানা গেল না। এক্ষেত্রে ইমাম আবূ য়ূসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ

(র)-এর নীতির প্রেক্ষিতে যখন থেকে কূয়ার পানির নাপাক অবস্থা জানা গেছে তখন থেকেই তাকে নাপাক ঘোষণা করা হতে পারে। ফলে সে সময়ের আগে যারা কুয়ার প্যানিতে অজু করেছে তাদের নামায শুদ্ধ। আর ইমাম আবূ হানীফা (র) তিন রাতের নামায পুনর্বার পড়া জরুরী গণ্য করেন। উল্লেখ্য, এ নীতির প্রয়োগ সব সময় হয় না, খুঁটিনাটি (جزئات) দলীলের ভিত্তিতে এই নীতির বিপরীত বিধান দেয়া হয়। ফিকাহর কিতাবগুলিতে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

প্রবচন ঃ ১৮

الاصل فى الاشياء الاباحة ـ

"মূলতঃ সব বস্তুই মুবাহ (مباح) অর্থাৎ জায়েয।"

শরীআতে যেসব জিনিসি সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট বিধান নেই কেবলমাত্র সেগুলির সাথেই এই নীতির সম্পর্ক রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما امور مشتبهات ـ

"হালাল সুস্পষ্ট এবং হারাম সুস্পষ্ট, এই দুয়ের মাঝেখানে কিছু বিষয় আছে যেগুলি সন্দেহযুক্ত (অর্থাৎ যেগুলি সম্পর্কে কোন হুকুম নেই)।"[২৪৭]

কাজেই যেসব বিষয়ের হালাল ও হারাম হওয়ার সুস্পষ্ট হুকুম রয়েছে সেগুলির ব্যাপারে কোন হুকুম নেই এবং কিয়াস ইসতিহসান ইত্যাদির সাহায্যে কোন দলীলের ভিত্তিতেও কোন একটি দিককে প্রাধান্য দেয়া যায় না, সেগুলির ক্ষেত্রে উপরোক্ত নীতি প্রযোজ্য অর্থাৎ তাদেরকে মুবাহ হওয়ার হুকুম দেয়া হবে।

ফকীহগণ অত্যন্ত সতর্কতা সহকারে এ নীতিটি ব্যবহার করেছেন। এমনকি কেউ কেউ এ নীতির বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত মত প্রকাশ করেছেন ঃ

الاصل فى الاشياء التحريم ـ

(উপরোক্ত প্রকার) সব বস্তুই মূলত হারাম।"

কিন্তু কুরআনের প্রখ্যাত তাফসীরকার আবূ বকর জাস্‌সাম অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন ঃ

ان الاشياء على الاباحة مما لا يحظره العقل فلا يحرم شئ الا ماقام دليله ـ[২৪৮]

---

২৪৭. বুখারী।

২৪৮. আহ্‌কামুল কুরআন, ১ম খণ্ড, ৩০ পৃষ্ঠা।

সুস্থবুদ্ধি যে জিনিসে বাধা দেয় না তা সবই মুবাহ; যেগুলির হারাম হবার ব্যাপারে দলীল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলি ব্যতীত কোন জিনিসই হারাম নয়।

মোটকথা এ নীতির যথার্থ প্রয়োগের জন্য চাই গভীর ও সূক্ষ্ম বুদ্ধিবৃত্তি এবং ব্যাপক তথ্যানুশীলন।

কিন্তু কোন নারীর ব্যাপারে হারাম বা হালাল হওয়া সন্দেহযুক্ত হলে নীতি হচ্ছে تحريم বা হারাম-এর হুকুম দেয়া, যেমন ফকীহগণ বলেন ঃ

الاصل فى الابضاع التحريم

উদাহরণ ঃ এক ব্যক্তি তার কয়েকজন স্ত্রীর মধ্যে একজনকে তালাক দিল, কিন্তু কাকে তালাক দিয়েছে তা আর মনে থাকলো না। এ অবস্থায় কাউকে স্ত্রী হিসাবে ব্যবহার করা জায়েয হবে না। আরণ প্রত্যেকের ব্যাপারে সন্দেহ রয়ে গেছে এবং তালাক দত্তাকে চিহ্নিত করার উপায়ও নেই। তদ্রূপ এক ব্যক্তি তার এক স্ত্রীকে রেখে বাকি সব স্ত্রীকে তালাক দিল। যদি তালাকদত্তা স্ত্রীকে চিহ্নিত করার উপায় না থাকে তবে সব স্ত্রীই হারাম হয়ে যাবে।

স্তন্যপানের বয়সে কোন ছেলে এবং মেয়ে একই নারীর স্তন্যপান করলে তাদের মধ্যে বিবাহ হারাম। স্তন্যপান ব্যাপারে সন্দেহ উপস্থিত হলে, সন্দেহের ভিত্তিতে হুকুম হবে না, হুকুম হবে يقين (প্রত্যয়)-এর ভিত্তিতে অর্থাৎ যতক্ষণ পেটে দুধ পৌঁছে গেছে বলে প্রমাণ হবে না ততক্ষণ শুধু স্তন শিশুর মুখে ধরে দিলেই হুরমত (حرمة বিবাহ হারাম হওয়া) প্রতিষ্ঠিত হবে না। কারণ অনেক সময় মেয়েরা শিশুদেরকে ভুলাবার জন্য এমনটি করে থাকে, অথচ স্তনে দুধ থাকে না। যদি কোন মহিলা বলে, আমার স্তনে আদৌ দুধ ছিল না, অমুক মেয়েকে/ছেলেকে ভুলাবার জন্য আমি তার মুখে আমার স্তন ধরেছিলাম মাত্র, তাহলে মহিলাটির কথা মেনে নেয়া হবে এবং তার গর্ভজাত সন্তানদের সাথে ঐ ছেলে/মেয়ের বিবাহ হারাম হবে না।

যদি কোন ছেলে ও মেয়ের মধ্যে দুধ-সম্পর্কের সন্দেহ হয় অথচ প্রমাণ করা সম্ভব না হয়, তবে তাদের বিয়ে জায়েয হবে।

প্রবচন ঃ ১৯

الحدود تندرئ بالشبهات -

"সন্দেহের কারণে হুদূদ (حد-এর বহুবচন حدود কতিপয় পাপের শারীআত নির্ধারিত শাস্তি) মুছে যায়।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

ادرءو الحدود والقتل عن عباد الله ما استطعتم -

"হুদূদ ও হত্যা মুছে (হটিয়ে) দাও যতদূর সম্ভব আল্লাহ্‌র বান্দাদের ওপর থেকে"

অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فان الامام ان يخطئ فى العفو خير من ان يخطئ فى العقوبة ـ

"যতদূর সম্ভব মুসলিমদেরকে হুদূদ থেকে রক্ষা করো। যদি কোন মুসলিমের জন্য বেরিয়ে যাবার পথ খুঁজে পাও তাহলে তার পথ ছেড়ে দাও। বিচারকের পক্ষে ভুল করে খালাস দেয়া ভুল করে শাস্তি দেয়ার চাইতে উত্তম।"

উপরোক্ত প্রবচনটি উল্লেখিত হাদীসের ভিত্তিতে প্রণীত। চুরি, ব্যভিচারের অপরাধ ইত্যাদি কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত শাস্তিগুলি প্রদানের বেলায় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছেন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এবং তাঁর সাহাবীগণ (রা)। অভিযুক্ত ব্যক্তি benefit of doubt অর্থাৎ সন্দেহ তথা অকাট্য প্রমাণের অভাবের সুবিধা পাবে।

সন্দেহের সংজ্ঞা ও তার প্রকারভেদ

الشبهة مايشبه بثابت وليس بثابت ـ

"সন্দেহ হচ্ছে, যা বাস্তব বা প্রতিষ্ঠিত নয়, তাকে বাস্তব বলে ধারণা করা বা প্রতিষ্ঠিত বলে মনে উদয় হওয়া।"

এইরূপ সন্দেহের বশে কোন পাপ কাজ করে ফেললে তার শাস্তি হতে পারে, কিন্তু শারীআতে নির্ধারিত হুদূদযোগ্য অপরপধ না হলে সে হাদ্‌দ জারী হবে না।

উদাহরণ ঃ এক ব্যক্তি কোন মেয়েকে বিয়ে করলো কিন্তু বিয়ে শারীআত সম্মত হলো না, যেমন ধরা যাক, সাক্ষী ছিল না বা মেয়েটি তার জন্য হালাল ছিল না। এসব অবস্থায় যদি সে মেয়েটির সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে এই বিশ্বাসে যে, বিয়ে ঠিকই হয়েছে এবং মেয়েটি তার জন্য হালাল হয়ে গেছে তাহলে তাকে ব্যভিচারের জন্য শাস্তি দেয়া হবে না। তার অজ্ঞতা বা অসাবধানতার জন্য ভিন্নতর শাস্তি হতে পারে। যদি হারাম মনে করা সত্ত্বেও এমনটি করে তাহলে হাদ্‌দ জারী করতে হবে।

প্রবচন ঃ ২০

القصاص كالحدود فى الدفع بالشبهة فلا يثبت الا بما تثبت به الحدود ـ

"কিসাস (قصاص = হত্যার শাস্তি) হাদ্‌দ-এর মত সন্দেহের দরুন (মুছে) রহিত হয়ে যায়। হাদ্‌দ এর প্রমাণের মত প্রমাণ না হলে কিসাস প্রমাণ হয় না।"

উদাহরণ ঃ ১. ঘুমন্ত অবস্থায় কাউকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত করলে অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি বলে, মৃত অবস্থায় সে লোকটিকে যবাহ করেছে, এ অবস্থায় কিসাস হবে না বরং 'দিয়ত' (শোণিত পণ) দিতে হবে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশদেরকে, যদি হত্যার অকাট্য প্রমাণ না থাকে।

২. কিসাসের হুকুম শোনার পর হত্যাকারী যদি পাগল হয়ে যায় তাহলে সন্দেহ উপস্থিত হবে, সে হত্যার সময় সুস্থবুদ্ধি ছিল কিনা। সুতরাং তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে না, বরং তার সম্পদ থেকে শোণিত পণ আদায় করা যাবে।

৩. এক ব্যক্তি অন্যজনকে বলে, তুই আমাকে হত্যা কর। এতে সে তাকে হত্যা করে। এ অবস্থায়ও কিসাস অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ড ওয়াজিব হবে না কিন্তু হত্যাকারী অপরাধী গণ্য হবে।

ফকীহগণ কয়েকটি বিষয়ে কিসাসকে হাদ্‌দ-এর সমপর্যায়ে গণ্য করেন না। উদাহরণ ঃ

১. হাদ্‌দ (حد) মাফ করা যেতে পারে না। বরং প্রমাণ পাওয়ার পর হাদ্‌দ জারী করা জরুরী। কিন্তু কিসাসের ক্ষেত্রে যদি নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা নিজেরাই মাফ করে দেয় তাহলে তা মাফ হয়ে যাবে।

২. সরকার অর্থাৎ বিচারক ব্যক্তিগত জ্ঞানের ভিত্তিতে কিসাসের ফায়সালা করতে পারে। কিন্তু হাদ্‌দ-এর ফায়সালা এভাবে করা জায়েয নয়।

৩. হাদ্‌দের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারীদের দাবীর কোন আলাদা মর্যাদা নেই অর্থাৎ তারা দাবীদার হলো বলেই হাদ্‌দ জারী হবে না, যদি নির্দিষ্ট সংখ্যক সাক্ষী না পাওয়া যায়। কিন্তু কিসাসের দাবিদার হয় উত্তরাধিকারীরাই। কারণ এক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তি হাযির থাকে না।

৪. হত্যার ব্যাপারটি অনেক দিন পুরোনো হলেও তার কিসাসের দাবি রহিত হয় না। কিন্তু হাদ্‌দের ক্ষেত্রে বিষয়টি পুরোনো হয়ে গেলে অন্য দাবি খতম হয়ে যায়। তবে হাদ্‌দ কাযাফ (قذف = ব্যভিচারের অপবাদ দেয়ার শাস্তি)-এর দাবি দীর্ঘকাল অতিবাহিত হবার পরও সচল থাকে।

৫. বোবারা ইশারায় ব্যক্ত করলে বা লিখে দিলে কিসাস প্রমাণিত হয়ে যায়। কিন্তু হাদ্‌দ এভাবে প্রমাণিত হয় না।

৬. হাদ্‌দের ব্যাপারে কোন প্রকার সুপারিশ কবূল করা যায় না। কিন্তু কিসাসের ক্ষেত্রে ওয়ারিসদের সুপারিশ গ্রহণযোগ্য। পূর্বেই বলা হয়েছে, তারা মাফ করে দিলে কিসাস মাফ হয়ে যাবে।

৭. হাদ্‌দের (অপবাদের শাস্তি ছাড়া অন্য শাস্তির) ব্যাপারটি প্রতিপক্ষের দাবির ওপর নির্ভরশীল নয়, প্রমাণিত হলেই হল, অন্যদিকে কিসাস দাবির ওপর নির্ভরশীল।

প্রবচন ঃ ২১

التعزير يثبت مع الشبهة يثبت مايثبت به المال والكفارات ثبت معها ايضا ـ

"সন্দেহ থাকলেও تعزير [২৪৯] প্রতিষ্ঠিত হয়। যেরূপ প্রমাণে সম্পদের দাবি প্রমাণিত হয়। যেমন দুইজন সাক্ষী) তাতে تعزير ও প্রমাণিত হয়।

কাফ্‌ফারা ঃ (যেসব কসমের কাফ্‌ফারা) সন্দেহ সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠিত হয়।

তবে রমযানের রোযার কাফ্‌ফারা আবার এই নীতির বাইরে। কেননা তা সন্দেহের ভিত্তিতে বাতিল হয়ে যায়, যেমন বিস্মৃতি ও ভুল ত্রুটির ফলে কাফ্‌ফারা বাতিল হয়ে যায়।

প্রবচন ঃ ২২

اذا اجتمع امران من جنس واحد ولم يختلف مقصود هما دخل احدهما فى الاخر غالبا ـ

"একই শ্রেণীর দু'টি বিষয় যখন একত্র হয়ে যাবে এবং উভয়ের উদ্দেশ্যও হবে এক, তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি অন্যটির মধ্যে প্রবেশ করার (বিলীন হওয়ার) হুকুম দেয়া হবে।" উদাহরণ ঃ

১. গোসল ওয়াজিব হয়েছে দু'টি কারণে। এ অবস্থায় প্রত্যেক কারণের প্রেক্ষিতে ভিন্ন গোসল করতে হবে না। একবার করা যথেষ্ট হবে।

২. মসজিদে প্রবেশ করে এক ব্যক্তি দু'রাকআত নামায পড়লো, তা সুন্নত হোক বা ফরয, যা-ই হোক, তাতে দু'টো উদ্দেশ্য পূর্ণ হল, এক, মস্‌জিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন (تحية المسجد), দুই. শারীআতের সংশ্লিষ্ট হুকুমটি পালন। সুতরাং আলাদাভাবে তাহিয়্যাতুল মসজিদ-এর নিয়্যতে কোন নামায পড়ার আবশ্যকতা নেই।

৩. নামাযের মধ্যে একাধিকবার এমন ভুল হয়ে গেছে যাতে সেজদা সাহো (سجدة السهو) ওয়াজিব হয়ে যায়। এমতাবস্থায় একাধিক ভুলের জন্য নামাযের শেষে একবারমাত্র সিজদা সাহো করা যথেষ্ট হবে।

---

২৪৯. تعزير অর্থ শাস্তি দেয়া। তবে এ শাস্তির প্রকৃতি ও পরিমাণ কুরআন ও হাদীসে নির্ধারিত নয়, যেমন حدود নির্ধারিত হয়েছে। এ শাস্তি حدود-এর চাইতে লঘুতর দেয়া হয় সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখা এবং জনগণের চরিত্র সংশোধনের প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয় দণ্ডবিধি (Penal code)-এর আওতায় বা বিচারকের ইখতিয়ার অনুযায়ী।

৪. একই হারাম কাজ যেমন ব্যভিচার বা মদ্যপান কয়েকবার করা হয়েছে। এজন্য একবার হাদ্‌দ জারী করলে যথেষ্ট হবে। [কিন্তু যদি হাদ্‌দ জারী করার পর পুনর্বার সেই একই অপরাধ করা হয়ে থাকে তাহলে পুনর্বার হাদ্‌দ জারী হবে। অথবা যদি বিভিন্ন ধরনের অপরাধ করা হয়ে থাকে এবং তাদের শাস্তিও ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয় তবে প্রত্যেক অপরাধের পৃথক পৃথক হাদ্দ জারী করা হবে। যদি কেহ কোন অবিবাহিত মহিলার সাথে অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে এবং তারপর তাকে হত্যা করে এ অবস্থায় ব্যভিচারের জন্য বেত্রদণ্ড জারী হবে এবং হত্যার জন্য (যদি প্রমাণে সন্দেহ থাকে) শোণিত পণ আদায় করা হবে।

প্রবচন ঃ ২৩

الخراج بالضمان

এটা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একটি হাদীস এবং বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এর অর্থ বুঝতে হলে প্রথমে خراج -এর সংজ্ঞা জানতে হবে।

ফকীহগণের কথায় ঃ

كل ماخرج من شئ فهو خراجه، فخراج الشجر ثمره وخراج الحيوان دره ونسله ـ

"কোন জিনিস থেকে যা বেরিয়ে আসে সেটিই তার খারাজ (উৎপাদিত লভ্য)। কাজেই গাছের খারাজ হচ্ছে তার ফল এবং পশুর খারাজ হচ্ছে তার দুধ ও শাবক।"

তাই হাদীসের অর্থ হচ্ছে লভ্যের মালিক হবে সে-ই যে বস্তুর যামিন (ضامن দায়িত্ব বহনকারী) বা মালিক হবে। যেমন, একটি পশুর ক্রেতা তার মালিকানার সময়ে যে দুধ বা লোম লভ্য রূপে পেয়েছে সে তার প্রকৃত মালিক। কোন দোষ-ত্রুটি ধরা পড়লে যদি পশুটিকে বিক্রেতার নিকট ফেরৎ দিতে হয় তাহলে প্রাপ্ত দুধ বা লোম ফেরৎ দিতে বা তার মূল্য আদায় করতে হবে না।

প্রবচন ঃ ২৪

ماحرم اخذه حرم اعطائه ـ

"যা নেওয়া হারাম তা দেওয়াও হারাম।"

যেমন সুদ, গণতকারের পারিশ্রমিক, ঘুষ ইত্যাদি। তবে কয়েকটি অবস্থায় এর ব্যতিক্রমও জায়েয ঃ

১. যদি অনাহার চলতে থাকে এবং সুদে ঋণ নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায়ই না থাকে তাহলে প্রয়োজন মাফিক সুদী ঋণ নেওয়া যেতে পারে।

২. যদি প্রাণ ও সম্পদ নষ্ট হবার জোর আশংকা থাকে, তাহলে ঘুষ দিয়ে প্রাণ ও সম্পদ রক্ষা করা জায়েয।

৩. বিনা দোষে যদি কারা যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় তাহলে ঘুষ দিয়ে মুক্তি লাভ করা জায়েয।

৪. সম্পদের ব্যবস্থাপক বা অভিভাবক (অছি = وصى) তার কাছ থেকে সম্পদকে জবরদস্তি ছিনিয়ে নেওয়া ও অন্যায়ভাবে হস্তগত করার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য ঘুষ দিতে পারে।

প্রবচন ঃ ২৫

من استعجل الشئ قبل اوانه عوقب بحرمانه ـ

"যে ব্যক্তি সময়ের পূর্বে কোন জিনিস হাসিল করার ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করে তাকে বঞ্চনার শাস্তি দেয়া হবে।"

হত্যাকারী এ কারণেই উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

প্রবচন ঃ ২৬

من اخرج الشئ بعد اوانه فليتأمل فى الحكم ـ

"যে ব্যক্তি সময়ের পরে কোন জিনিসকে পিছিয়ে দিয়েছে তার হুকুমের (ফায়সালা) ব্যাপারে চিন্তা–ভাবনা করা উচিত।"

যেমন, কোন ব্যক্তি মৃত্যু রোগে আক্রান্ত হবার পর নিজের স্ত্রীকে মীরাস থেকে বঞ্চিত করার জন্য তিন তালাক দিয়ে দেয়, এর ফলে স্ত্রী পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে না। বরং আইনত তার যা পাওনা হয় সে তার হকদার হবে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, যদি মহর (مهر) অনাদায়ী থাকে তবে অন্য ঋণের মত মহরের ঋণও পরিশোধ করতে হবে। ঋণ আদায়ের পরই উত্তরাধিকার বণ্টন হবে।

প্রবচন ঃ ২৭

لا عبرة بالظن البين خطائه ـ

"যে অনুমানের ভুল হওয়া সুস্পষ্ট, তার বিবেচেনা হবে না।"

১. যে ব্যক্তির 'ইশা'র নামায ফাউত (فوت) হয়ে গিয়েছিল সে ফজরের নামায আদায় করলো এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, সময়ের মধ্যে উভয় নামাযের অবকাশ নেই। কিন্তু পরে দেখা গেল, সময়ের মধ্যে অবকাশ ছিল। এ অবস্থায় ফজরের নামায

বাতিল হয়ে যাবে। যদি উভয় নামাযের এখনো অবকাশ থেকে থাকে তাহলে প্রথমে ইশা ও পরে ফজরের নামায পড়ে নিতে হবে। আর যদি উভয়ের অবকাশ না থেকে থাকে তাহলে ফজরের নামায পুনর্বার পড়ে নিতে হবে।

হুকুমটি এমন ব্যক্তির জন্য, যে তরতীবের অধিকারী (صاحب الترتيب) অর্থাৎ নামায যার উপর ফরয হবার পর থেকে কোন দিন পরপর পাঁচ ওয়াক্তের নামায কাযা হয়নি। আর যদি কখনো কাযা হয়েও থাকে তাহলে তা সে পরবর্তীতে ঠিকমত পড়েও নিয়েছে।

২. যে ব্যক্তি পানিকে নাপাক মনে করে তা দিয়ে অযূ করেছে, পরে জানতে পেরেছে যে, পানি পাক ছিল, এ অবস্থায় তার অযূ জায়েয হবে।

৩. কোন ব্যক্তিকে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যাকাত দেয়া হয়েছে যে, সে হকদার নয়; পরে জানা গেছে, সে হকদার ছিল। এ অবস্থায় যাকাত আদায় হয়ে গেছে।

এ নীতির ব্যতিক্রমও আছে। যেমন.

১. কোন ব্যক্তিকে যাকাতের হকদার মনে করেই যাকাত দেয়া হয়েছে; তারপর জানা গেছে, সে বিত্তবান ছিল অথবা তার পুত্র বিত্তবান ছিল, এ অবস্থায় ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মদের (র) মতে যাকাত আদায় হবে না। অন্যদিকে ইমাম আবূ য়ূসূফের (র) মতে আদায় হয়ে যাবে।

২. কাপড় নাপাক মনে করেই তাতে নামায পড়ে নিয়েছে; কিন্তু পরে জানা গেছে, কাপড় পাক ছিল; এ অবস্থায় পুনর্বার নামায পড়ে নিতে হবে।

৩. অযূ ছাড়াই নামায পড়া হয়েছিল, পরে মনে হয়েছে তার অযূ ছিল; এ অবস্থায় আবার নামায পড়তে হবে।

৪. সময় হবার আগেই নামায পড়া হয়েছিল। তারপর জানা গেল আসলে তখন সময় হয়ে গিয়েছিল; এ অবস্থায় পুনর্বার সামায পড়তে হবে ইত্যাদি।

ফকীহগণ বিধান উদ্ভাবন করার সময় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শুধুমাত্র একটি দিক দেখার পক্ষপাতি নন; বরং তাদের মতে তার সমস্ত দিক চোখের সামনে থাকা উচিত। অনেক সময় একদিক দিয়ে একটি হুকুম প্রমাণিত হয় আবার অন্যান্য বিভিন্ন দিক তার বিরোধী হুকুম দাবি করে। এ অবস্থায় প্রমাণের প্রাবল্য বিচারে হুকুম দিতে হবে।

প্রবচন ঃ ২৮

ذكر مالا يتجزى كذكر كله -

"যে জিনিসের কোন খণ্ড হতে পারে না, তার কোন অংশের উল্লেখ করলে

যেমন 'অর্ধেক তালাক' বা 'স্ত্রীর অর্ধেককে তালাক' -এর কথা বললে পূর্ণ এক তালাক হবে। কারণ তালাক খণ্ডিত হতে পারে না এবং স্ত্রীও খণ্ডিত হয় না।

প্রবচন ঃ ২৯

اذا اجتمع المباشر والمتسبب اضيف الحكم الى المباشر ـ

"যখন কোন কাজের কারক (مباشر) এবং কাজটির কারণ (مسبب) অর্থাৎ উৎসাহ-প্রেরণা -ইঙ্গিত-আদেশ ইত্যাদি দাতা একসাথে থাকে তখন কাজটি সম্পর্কিত হবে কারকের সাথে, কারণের সাথে নয়।"

১. এক ব্যক্তি লোক চলাচলের পথে কূয়া খনন (مسبب) করলো। দ্বিতীয় ব্যক্তি একজনকে কূয়ার মধ্যে নিক্ষেপ করলো। এ অবস্থায় নিক্ষেপেকারী (مباشر) প্রাণনাশের খেসারত দেবে।

২. এক ব্যক্তি চোরকে পথ দেখালো এবং চোর চুরি করলো। এক্ষেত্রে চোর চুরি অপরাধের দণ্ডপ্রাপ্ত হবে। তবে যদি চোরকে এমন সম্পদের ব্যাপারে পথ দেখায়, যা পথ প্রদর্শকের কাছে আমানত ছিল এবং চোর সে সম্পদ চুরি করলো তাহলে এক্ষেত্রে পথ প্রদর্শনকারীও দণ্ডপ্রাপ্ত হবে। কেননা সে আমানতের হিফাযতে ত্রুটি দেখিয়েছে।

প্রবচন ঃ ৩০

العادة محكمه ـ

আদত (عادة) বা প্রচলিত রীতিই বিধায়ক রূপে স্বীকৃত।

'ফিকহের উৎস' অধ্যায়ে আদত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এ অধ্যায়ে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উল্লেখ করা হোল। ফকীহগণ দুই প্রকার عادة -এর বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

১. عادة كلية বা ব্যাপক (কায়েমী) আদত

২. عادة غير كلية বা অ-ব্যাপক (অ-কায়েমী) আদত

১. عادة كلية -এর বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

العوائد العامة لاتختلف بحسب الاعصار و الامصار والاحوال كالاكل والشرب والفرح والحزن والنوم واليقظة والميل الى الملائم والنفور عن المنافر وتناول الطيبات والمستلذات واجتناب المولمات والخبائث وماشبه ذالك ـ

"এমন ধরনের সাধারণ রীতি যা কোন যুগে, কোন স্থানে কোন অবস্থায় বদলানো যায় না, যেমন খাওয়া, পান করা, আনন্দ, দুঃখ, নিদ্রা, জাগরণ, অনুকূলের প্রতি আকর্ষণ, প্রতিকূল এর প্রতি বিকর্ষণ, পবিত্র ও স্বাদযুক্ত বস্তু গ্রহণ, কষ্টদায়ক ও নাপাক জিনিস বর্জন এবং অনুরূপ সব জিনিস عادة كلية -র অন্তর্ভুক্ত।"২৪৯

وضعت عيها الدنيا وبما قامت مصالحها فى الخلق ـ

"সুতরাং عادة كلية-র ওপর দুনিয়া প্রতিষ্ঠিত এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্টিসমূহের কল্যাণ এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে।"২৫০

এই প্রকার عادة-এ কোন পরিবর্তন নেই এবং অবকাশও নেই।

২. عادة غير كلية -এর বর্ণনা হচ্ছে ঃ

العوائد التى تختلف باختلاف الاعصار والامصار والاحوال كهيات اللباس والمسكن والين فى الشدة والشدة فيه والبطئ والسرعة فى الامور والاناءة والاستعجال وما كان نحو ذالك ـ

"যে সব عادة কাল, স্থান ও অবস্থার প্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হতে থাকে, যেমন পোশাকের ধরন, বাসগৃহ গঠন, কঠিনতার মধ্যে কোমলতা, কোমরলতার মধ্যে কঠিনতা, কাজে বিশম্ভ বা দ্রুতগতি এবং অনুরূপ সব রীতি-এ সবই عادة غير كلية -র শামিল।"২৫১

এ বিষয়গুলির ওপর বস্তুগত ও নৈতিক পরিবেশ, আবহাওয়া, মওসূম ইত্যাদির যথেষ্ট প্রভাব পড়ে। তাই প্রতি যুগে, প্রতি দেশে ও প্রত্যেক অবস্থায় এর মধ্যে সাদৃশ্য পাওয়া যায় না এবং পাওয়া যেতেও পারে না। এহেন অবস্থায় যদি এসব ব্যাপারে একই কর্মপদ্ধতির অনুসৃতিকে অপরিহার্য গণ্য করা হয় তাহলে সংকট ও সংকীর্ণতা (حرج وضيق) দেখা দেবে। তাই ফকীগগণ অবস্থা, স্থান ও সময়ের প্রেক্ষিতে এদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রবচন ঃ ৩১

الاجتهاد لاينقض بالاجتهاد ـ

"এক ইজতিহাদ অন্য ইজতিহাদের দ্বারা ভেঙে পড়ে না অর্থাৎ বাতিল হয়ে যায় না।"

যেমন এক মুজতাহিদ ইজতিহাদের মাধ্যমে কোন হুকুম দিলেন, অন্য একজন মুজতাহিদও ইজতিহাদের ভিত্তিতে ভিন্ন বা প্রতিকূল হুকুম দিলেন। এই দ্বিতীয়

২৪৯. আল মাওয়াফিকাত, ২৯৭ পৃষ্ঠা।
২৫০. ঐ. ২৫১. ঐ

হুকুমের ফলে প্রথম হুকুমটি বাতিল হয়ে যাবে না। বরং স্বস্থানে উভয় হুকুম বহাল থাকতে পারে যদি অবস্থা ও মাসলাহাত ভিন্ন ভিন্ন হয়। হযরত উমর (রা) কোন কোন বিষয়ে ইজতিহাদের মাধ্যমে হযরত আবূ বকর (রা)-এর হুকুমের বিরুদ্ধে ফায়সালা দেন। কিন্তু তাঁর হুকুমকে বাতিল গণ্য করেন নি।

এক অনন্যোপায় ব্যক্তি নিজের চিন্তা-ভাবনা (تحرّى) অনুযায়ী কিবলা মনে করে একদিকে মুখ করে এক রাকআত নামায পড়লো। তারপর তার রায় বদলে গেল এবং দ্বিতীয় রাকাতটি সে অন্য দিকে মুখ করে পড়লো। তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাত দু'টিও এভাবে রায় পরিবর্তনের দরুন ভিন্ন ভিন্ন দিকে মুখ করে পড়লো, এভাবে সে চার রাকআত চারদিকে মুখ করেও যদি পড়ে তার নামায ঠিক হবে। কারণ, তার পরবর্তী রায় বা ইজতিহাদ পূর্ববর্তী রায় ও ইজতিহাদকে বাতিল করে দেবে না।

প্রবচন ঃ ৩২

التابع تابع -

"অনুগামী অনুগামীই থাকবে" অর্থাৎ সে স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা লাভ করবে না।

১. পশুর গর্ভস্থিত বাচ্চা পশুর কেনাবেচার মধ্যে শামিল হবে। পৃথকভাবে তার কেনাবেচা বা হেবা জায়েয নয়।

২. পথ ইত্যাদি সব কিছু জমির কেনাবেচার অন্তর্ভুক্ত হবে। সেগুলিকে বিক্রিত জমি থেকে পৃথক করে আলাদাভাবে লেনদেন করা ঠিক হবে না।

নিম্নোক্ত ধরনের বিষয়গুলো এই নীতির ব্যতিক্রম ঃ

যেমন, গর্ভস্থিত সন্তানের জন্য অসীয়ত (وصية) ও অঙ্গীকার করা সঠিক হবে যদিও সন্তান স্বতন্ত্র সত্তা লাভ করেনি।

প্রবচন ঃ ৩৩

التابع يسقط بسقوط المتبوع -

"যার অনুগমন করা হয় (কর্তা) তা বাতিল হয়ে গেলে অনুগামী (অধীন)ও বাতিল হয়ে যাবে।"

পাগলামীর কারণে যখন ফরয নামায মাফ হয়ে গেছে তখণ সুন্নাতও মাফ হয়ে যাবে। এর নিকটবর্তী প্রবচন হচ্ছে ঃ

يسقط الفرع اذا سقط الاصل -

"কাণ্ড (আসল) পড়ে (নাকচ হয়ে) গেলে শাখা পড়ে (নাকচ হয়ে) যায়।"

এ নীতির ভিত্তিতেই ফকীহগণ বলেন ঃ

اذا برء الاصيل برأ الكفيل -

"যখন মূল ব্যক্তি দায়িত্বমুক্ত হয়ে যায় তখন তার (নিয়োজিত) জামিনও দায়িত্বমুক্ত হয়ে থাকে।"

কিন্তু কখনো এর বিপরীতটাও হয়। যেমন, কোন ব্যক্তি বললো, খালেদের কাছে যায়েদ হাজার টাকা পায় এবং আমি খালিদের জামিন। কিন্তু খালেদ অস্বীকার করলো। সে বললো, যায়িদ-এর কোন পাওনা আমার ওপর নেই। এখন যদি যায়েদ টাকা দাবি করে যদিও তার কোন সাক্ষী নেই, তবে যে ব্যক্তি জামিনদার বলে স্বীকৃতি দিয়েছে তার ওপর বর্তায় এই ঋণ পরিশোধ করা। এক্ষেত্রে কথিত ঋণগ্রহণকারী রূপে খালিদ হচ্ছে صيل । আর তৃতীয় এক ব্যক্তি হচ্ছে স্বঘোষিত كفيل। খালিদ অস্বীকার করে গেল, কফীল ফেঁসে গেল।

প্রবচন ঃ ৩৪

الحر لايدخل تحت اليد -

"স্বাধীন ব্যক্তি কারোর হস্তগত (দাস) হবে না।"

প্রবচন ঃ ৩৫

لاينسب الى ساكت قول -

"যে ব্যক্তি নীরব থাকে তার প্রতি কোন কথা আরোপ করা যাবে না।"

১. কোন ব্যক্তি ভিন ব্যক্তিকে নিজের সম্পদে হস্তক্ষেপ করতে দেখে নীরব থাকলো, এ নীরবতাকে অনুমতি বলে ধরে নেয়া যাবে না এবং এ কথা ধরে নেয়া যাবে না যে, এই ব্যক্তি তার পক্ষ থেকে প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করছে, যে কারণে সে তার হস্তক্ষেপ দেখে নীরব রয়েছে।

২. শাসক বা বিচারক কোন ছোট ছেলেকে বা সম্পদে হস্তক্ষেপের (বেচাকেনা ইত্যাদি করা) অনুমতি নেই, এমন কোন ব্যক্তিকে বেচাকেনা করতে দেখে এবং নিশ্চুপ থাকে, এ অবস্থায় এ নিশ্চুপতাকে শাসকের পক্ষ থেকে অনুমতি বলে মনে করা হবে না।

প্রবচন ঃ ৩৬

بين الناس شركة عامة فى الكلأ والماء -

"ঘাস ও পানির মধ্যে সবার সমান অংশীদারীত্ব রয়েছে।"

(অবশ্য যদি সাধারণ্যের চারণভূমি বা জলাধার হয়। শক্তিমানরা যেন অন্যদের অধিকার খর্ব বা হরণ না করে)।

প্রবচন ঃ ৩৭

الانسان من جنس قوم ابيه لامن جنس قوم امه ـ

"মানুষকে তার বাপের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ধরা হবে, মায়ের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ধরা হবে না। (অর্থাৎ বংশধারা বাপের মাধ্যমেই চলবে)।

প্রবচন ঃ ৩৮

الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ـ

"প্রমাণের মাধ্যমে যা প্রতিষ্ঠিত হয় তা প্রত্যক্ষের মত।"

প্রবচন ঃ ৩৯

الولد يتبع خير الابوين دينا ـ

"পিতামাতার মধ্যে দীনের বিচারে যে শ্রেষ্ঠ হবে সন্তান তার (ধর্মের) অনুসারী হবে।"

প্রবচন ঃ৪০

شرط صحة الصدقة التمليك ـ

"যাকাত আদায় নির্ভুল হওয়ার শর্ত হচ্ছে যাকে দেয়া হচ্ছে তাকে যাকাতের মালের মালিক বানিয়ে দেয়া।"

প্রবচন ঃ ৪১

التبرع فى المرض وصية ـ

"মৃত্যুরোগে ইহ্‌সান (تبرّع দান, free gift) অসিয়তের পর্যায়ভুক্ত" (অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে)।

প্রবচন ঃ ৪২

خير الامور اوسطها ـ

"সব ব্যাপারে মধ্য পন্থাই উত্তম।"

প্রবচন ঃ ৪৩

الحق متى ثبت لايبطل بالتأخير و لابالكتمان -

"হক (অধিকার) যখন একবার প্রমাণিত হয়ে যায় তখন বিলম্ব করাতে যেমন সে অধিকার বাতিল হয় না, লুকিয়ে রাখলেও হবে না।

প্রবচন ঃ ৪৪

قول الواحد العدل في امر الدين مقبول كما يقبل في الاخبار عن طهارة الماء ونجاسته كما يقبل في هلال رمضان وكما يقبل في رواية الاخبار عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم -

"দীনের ব্যাপারে একজন ন্যায়নিষ্ঠ (عدل) ব্যক্তির খবর গ্রহণীয় হবে। যেমন হয় পানির পাক ও নাপাক হওয়া সম্পর্কে, রমযানের চাঁদ দেখার ব্যাপারে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস বর্ণনায়।"

এগুলি ছাড়া আরো বহু উপবিধি ফিকহ ও উসূলে ফিকহের কিতাবগুলোতে দেখা যায়, যার অনুধাবন একটি কঠিনতর এবং ব্যাখ্যা করতে গেলে পুস্তকের কলেবর বেড়ে যাবে বেসামালভাবে।

পঞ্চম অধ্যায়

ফিক্‌হী বিধানের লঘুকরণ

এই অধ্যায়ে যেসব বিধানের লঘুকরণের বর্ণনা হয়েছে তাদের প্রায় সবগুলি পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে বিভিন্ন উপলক্ষে বর্ণিত হয়েছে বিক্ষিপ্তভাবে।

এ অধ্যায়ে সেগুলোর পুনরাবৃত্তির অজুহাত হচ্ছে এই যে, পাঠক বিধানগুলো এক নজরে দেখতে পাবেন।

সফরের (سفر) কারণে বিধানের তাখফীফ (تخفيف হালকা করা), تسهيل সহজসাধ্য করা, (رخصة শিথিল করা)

সফর দুই ধরনের ঃ

(ক) শরী'আতের চাহিদায় সফর; যথা হজ্জ ও জিহাদের সফর। এটি কমপক্ষে ৪৮ মাইলের সফর হয়। মুসাফির এ সফরে বের হবার সময় থেকে (গন্তব্যে উপনীত হবার পূর্বেও) শরী'আত তাকে যে সব সুবিধা দেয় তা হচ্ছে ঃ চার রাকআতের পরিবর্তে দুই রাকাত নামাযের অনুমতি, সুন্নাতের বাধ্যবাধকতা না থাকা, রমযানের রোযা পরবর্তীতে রাখার অনুমতি, চামড়ার মোজার ওপর তিন দিন ও তিন রাত পর্যন্ত মাসাহ (مسح = ভেজা হাত বোলানো) করার অনুমতি, যদি মোজা পরিহিত হয়ে থাকে অর্থাৎ পা ধোয়া থেকে রেহাই পাওয়া; কুরবানীর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি (অবশ্য হাজ্জের দরুন যে কুরবানী ওয়াজিব হয় তা থেকে সফরের কারণে অব্যাহতি মিলে না) ইত্যাদি।

(খ) বৈষয়িক অর্থাৎ জাগতিক ব্যাপারে সফর ঃ এ সফর ৪৮ মাইল দূরত্বের শর্তে বাঁধা নয়। প্রতিদিনের কারবারের জন্য মানুষ স্বদেশ ও স্বএলাকা থেকে কিছু দূরে চলে যায় আবার তাড়াতাড়ি ফিরে আসে। এইরূপ সফরের রুখসাতের (رخصة) মধ্যে জুমুআর নামায, দুই ঈদের নামায ও জামাআত বাদ দিতে বাধ্য হলে তার অনুমতি আছে। তদুপরি পানি এক মাইল দূরে থাকলে তায়াম্মুম করে নামায পড়া এবং পশুর পিঠে সওয়ার থাকা অবস্থায় নফল নামায পড়া, কিবলা (قبلة)-র চিন্তা না করে যেদিকে চলেছে সে দিকে মুখ করে নফল নামায পড়া ইত্যাদির অনুমতি রয়েছে।

রোগের কারণে বিধানের তাখফীফ বা রুখসাত

রুগ্ন অবস্থায় রুখসাতের মধ্যে রয়েছে ঃ অযু ও গোসল করলে রোগ বেড়ে যাবার সম্ভাবনায় অথবা রোগ সারতে বিলম্বের আশংকায় তায়াম্মুম করে নামায আদায় করা; রোগগ্রস্ত অবস্থায় বসে, শুয়ে বা ইশারায় যেমন করে সুবিধা নামায পড়ে নেয়ার অনুমতি, রমযানের রোযা অন্য সময় রাখার অনুমতি; ই'তিকাফ (اعتكاف) অসম্পূর্ণ রেখে মসজিদ থেকে বের হয়ে আসা; হাজ্জের জন্য প্রতিনিধি পাঠিয়ে দেয়া; নাপাক জিনিস যথা শরাব ইত্যাদির সাহায্যে চিকিৎসা করা বা করানো; হলকুম (حلقوم= কণ্ঠাভ্যন্তর)-এ কোন জিনিস আটকে গেলে হারাম-হালাল যেকোন পানীয়ের মাধ্যমেই সম্ভব গলা পরিষ্কার করা, ডাক্তার ও ধাত্রীকে যথা প্রয়োজন গোপন অঙ্গ দেখতে দেয়া ইত্যাদি।

যবরদস্তী বা বল প্রয়োগ (اِكْرَاه)-এর ক্ষেত্রে রুখসাত

যবরদস্তীর প্রকারভেদ রয়েছে। যে ব্যক্তি যবরদস্তী করছে (مُكْرِه) তার আদেশ অমান্য করলে ঃ

১. যদি প্রাণনাশ বা অঙ্গচ্ছেদের আশঙ্কা থাকে; এ অবস্থায় মুকরাহ (مُكْرَه= যার ওপর যবরদস্তী করা হয়)-এর স্বাধীন ইচ্ছা বা ইখতিয়ার কিছুই থাকে না, যদি প্রাণ বা অঙ্গ বাঁচাতে হয়;

২. যদি প্রাণনাশ বা অঙ্গচ্ছেদের আশংকা না থাকে, কিন্তু দীর্ঘ বন্দীদশার আশংকা দেখা দেয়; এ অবস্থায়ও মেনে নিতে কেউ রাযী হয় না ঠিকই, তবে তার ইখতিয়ার অবশ্যি থাকে, প্রথমোক্ত অবস্থার মত মুকরাহ একেবারে অনন্যোপায় নয়।

৩. যদি ব্যক্তিগত কোন ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকে কিন্তু পিতা, পুত্র বা নিকট আত্মীয়দের ক্ষতির প্রশ্ন দেখা দেয়; এটি তৃতীয় স্তরের ইকরাহ, এতে কেউ রাযী হবে না, কিন্তু ইখতিয়ার থাকে। অর্থাৎ যবরদস্তীমূলক আদেশ অমান্য করতে পারে।

যবরদস্তী বনাম তাকলীফ (تكليف = শরী'আতের বিধি-বিধান পালনের দায়িত্ব)

ফকীহগণের মতে নীতিগতভাবে কোন ধরনের যবরদস্তীর ফলে মানুষ আল্লাহ্‌র আহকাম মেনে চলার দায়িত্ব (تكليف তাকলীফ) থেকে একেবারে মুক্ত হয় না, যবরদস্তী যে পর্যায়েরই হউক না কেন, বিধানসমূহের মুকাল্লাফ (مكلف) থেকে যায়।

বে যবরদস্তীর দরুন কৃতকর্মের পরিণাম কে ভোগ করবে, তাতে কতটা রুখসাত পাওয়া যাবে তা নির্ভর করবে অবস্থা এবং যবরদস্তীর প্রকারভেদের ওপর।

যবরদস্তী (اكراه) হতে পারে ঃ

১. কোন কথা (قول) বলার জন্যে, কিংবা

২. কোন কাজ (فعل) করার জন্য অর্থাৎ মানুষকে কোন কথা বলতে বাধ্য করা অথবা কোন কাজ করতে বাধ্য করা। যেসব অবস্থায় কোন মানুষ অন্যের ক্রীড়নক হতে পারে যেমন কাউকে হত্যা বা কারো সম্পদ নষ্ট করার ব্যাপারে এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করতে পারে, এক্ষেত্রে অপরাধী হবে যবরদস্তীকারী (مُكْرِه); যার ওপর যরবদস্তী করা হলো (مُكْرَه) সে পরিত্রাণ পাবে। আসলে রাইফেলটা চালিয়েছে অথবা ঘরে আগুন লাগিয়েছে যবরদস্তীকারী, কিন্তু অপরের হাত দিয়ে যাকে সে অস্ত্র রূপে ব্যবহার করেছে। সুতরাং কিসাস বা দিয়াত হবে বলপ্রয়োগকারীর দায়িত্ব। অন্যপক্ষে যদি কেউ তার দাসকে ব্যভিচারে কিংবা তার দাসীকে দেহ ব্যবসায়ে বাধ্য করে তবে সে তার দাস বা দাসীকে হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করতে পারে না, কারণ ব্যভিচারে দাস ও দাসীর যৌন অঙ্গের ব্যবহার অপরিহার্য, যা অপরের হাতের হাতিয়ার হতে পারে না। [তদুপরি ব্যভিচারের দোসর আর এক নারী এবং পুরুষ এতে সম্পৃক্ত।] এরূপ ক্ষেত্রে যবরদস্তীকারী সরাসরি ব্যভিচারী নয়, ব্যভিচারের শাস্তিও তার প্রতি প্রযোজ্য নয়, অন্য শাস্তি (تعزير) দেশের আইনের আওতায় সে পাবে। সরাসরি ব্যভিচারের জন্য দায়ী যার ওপর যবরদস্তী করা হয়েছে সে। তবে সে রুখ্‌সাত পেতে পারে এবং আল্লাহ্‌ তাকে মাফ করতে পারেন।

কোন কথা বলতে যবরদস্তীর ব্যাপারে আর একটি বিবেচনার উল্লেখ করেছেন ফকীহ্‌ সম্প্রদায়। কথাটি যদি এমন পর্যায়ের হয়, যা শরীআতের দৃষ্টিতে বক্তার সম্মতির অপেক্ষা রাখে না, বরং শুধুমাত্র মুখে উচ্চারণেই বক্তব্য বাস্তবে পরিণত হয়, যে কথার পরিণাম (effect) কখনও বিলীন হয় না ,যেমন তালাক, ইতাক (عتاق= দাস-দাসীর মুক্তিদান) জোর-যবরদস্তীর কারণে তালাক এবং ইতাকসূচক বাক্য উচ্চারণ করলেই তালাক হয়ে যাবে বা দাস মুক্ত হয়ে যাবে। যিহার (ظهار), ঈলা (ايلاء) কাসম (قسم শপথ) ও এই পর্যায়ের অর্থাৎ উচ্চারণই যথেষ্ট, উচ্চারণকারীর সম্মতির উপর নির্ভরশীল নয়। তালাকের পর রাজআত [رجعة= প্রত্যাগমন অর্থাৎ নির্দিষ্ট মেয়াদ (عدة)-এর মধ্যে কথায় বা কাজে তালাক নাকচ করা] -এর ক্ষেত্রেও এই বিধান। এমনি যদি বলে "আমি আমার ছেলের হত্যার দণ্ড (قصاص) -এর দাবি ছেড়ে দিলাম, বা হত্যাকারীকে মাফ করে দিলাম" – উচ্চারণ মাত্রই হত্যাকারী মুক্ত হয়ে যাবে; যদিও যবরদস্তী কোন ওয়ালী বা ওয়ারিছ (وارث - ولى) -এর মুখ দিয়ে কথাগুলো বলান হয়। শরী'আত অনুযায়ী এ জাতীয় কথার ফাস্‌খ (فسخ = প্রত্যাহার করা) জায়েয নয়।

অন্যপক্ষে যবরদস্তী যে কথাটি বলানো হলো তা যদি এমন পর্যায়ের হয় যা শারী'আত অনুযায়ী ফাস্‌খ বা প্রত্যাহার করা চলে এবং যার পরিণতি বক্তার সম্মতির ওপর নির্ভরশীল, যথা বিয়ের ঈজাব (ايجاب= প্রস্তাবনা বাক্য) ও কবূল (قبول=

প্রস্তাব গ্রহণসূচক বাক্য), বেচা-কেনার চুক্তিমূলক বাক্য ইত্যাদি যে চুক্তি বক্তার সম্মতি ব্যতীত প্রতিষ্ঠিত হয় না। যবরদস্তীর কারণে এ সব বাক্য উচ্চারণ করলেও বিবাহ, বেচা-কেনা, ভাড়া অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে ঠিকই কিন্তু তা ফাসিদ (فاسد= ত্রুটিযুক্ত) হবে; পরবর্তীতে যাদের ওপর যবরদস্তী করা হয়েছে (এক বা উভয় পক্ষ) তারা চাইলে চুক্তি অব্যাহত রাখতে পারে এবং না রাখতে চাইলে ফাসখ করে দিতে পারে।

রুখ্‌সাত পরিণামের প্রেক্ষিতে

যবরদস্তীর পরিণাম ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে সীমিত থাকলে সেক্ষেত্রে উদারভাবে রুখ্‌সাত দেয়া হয়, কিন্তু যদি যবরদস্তীর কারণে কৃত কর্মটির পরিণাম ব্যক্তির গণ্ডী অতিক্রম করে অপরাধের মধ্যে সম্প্রসারিত হয় সেক্ষেত্রে রুখসাতের ব্যাপারে কড়াকড়ি করা হয়, যেমন

১. কোন ব্যক্তিকে ব্যভিচার করতে বাধ্য করা হলেও শারী'আত তাকে এই কাজ করার অনুমতি দেয় না, কারণ এতে বংশ বিভ্রাট ঘটে এবং সম্ভাব্য শিশুর ভাগ্য বিড়ম্বনা বহু দূর গড়াতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে এ কাজটি 'হত্যা'র সম-পর্যায়ভুক্ত হয়ে দাঁড়ায়।

২. কোন ব্যক্তিকে হত্যা বা তার অঙ্গচ্ছেদ করতে বাধ্য করা হলেও শারী'আত তাকে এ কাজের অনুমতি দেয় না, কারণ এ কাজের অশুভ পরিণতি মৃত বা অঙ্গচ্ছেদিত ব্যক্তির পরিবারবর্গের ওপর, কোন কোন ক্ষেত্রে গোটা সমাজে পরিব্যাপ্ত হয়। অধিকন্তু শারীআত-ই-ইসলামে নিজের জান দিয়ে অপরের জান রক্ষার আদেশ রয়েছে, নীতিগতভবে এর বিপরীত কর্ম অনুমোদন করে না।

অন্যপক্ষে যেসব ক্ষেত্রে রুখসাত মিলে তার কতিপয় উদাহরণ নিম্নরূপ ঃ

১. মৃত ও হারাম জিনিস খাওয়ার ব্যাপারে জবরদস্তী করা হলে প্রাণ বাঁচাবার জন্য তা আহার করা জরুরী। না করে প্রাণ হারালে শরী'আত তাকে অপরাধী গণ্য করবে।

২. কুফরী কথা বলার জন্য জবরদস্তী করা হলে মুখে তা উচ্চারণ করার অনুমতি রয়েছে; কুরআন মজীদের স্পষ্ট বাক্য : (إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيْمَانِ। النحل - ١٠٦) অনুসারে যদি তার কাল্‌বে স্থির নিশ্চিত ঈমান বজায় থাকে। উল্লেখ্য, রুখসাত থাকা সত্ত্বেও যদি সে কুফরী কথা উচ্চারণ না করে এবং তাকে হত্যা করা হয় তবে সে আল্লাহ্‌র পুরস্কার পাবে। এই যে, প্রথম ক্ষেত্রে বল প্রয়োগের কারণে হারাম জিনিস খাওয়া মুবাহ (مباح= জায়েয) হয়ে গিয়েছিল। মুবাহ পরিত্যাগ করার দরুন জীবন বা অঙ্গহানি ঘটলে সে গুনাহগার হবে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ব্যাপার হলো, কূফর বা কুফরী কালাম কোন অবস্থাতেই মুবাহ হয় না। উচ্চারণ করলে সে

রুখসাত পাবে, উচ্চারণ না করে জান দিলে সে আযীমাত (عزيمة= রুখসাতের বিপরীত, যেমন ঈমানে অবিচল থাকা)-এর পর্যায়ে কাজ করলো, সুতরাং গুনাহগার হবে না, বরং পুরস্কারের হকদার হবে।

বিস্মৃতির কারণে রুখসাত

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

ان اللّه تعالى وضع عن امتى الخطاء والنسيان ـ

"আল্লাহ্ আমার উম্মতের ওপর থেকে ভুল ও বিস্মৃতি নামিয়ে দিয়েছেন"। অর্থাৎ ভুলক্রমে কোন কাজ করে ফেললে তাকে রুখসাত দেয়া হবে।

ফকীহদের মতে, ভুলে যাওয়া মানবের প্রকৃতিগত একটি অক্ষমতা হলেও শরী'আতের দৃষ্টিতে ভুলে যাওয়া নীতিগতভাবে এমন গ্রহণযোগ্য ওযর (عذر= অজুহাত) নয়, যাতে ভুলে যাওয়ার পরিণামে কারো ক্ষতি হয়ে গেলে তার ক্ষতিপুরণ থেকে রুখসাত পাবে না।

উদাহরণ ঃ ১. বিস্মৃতির ফলে কোন ব্যক্তি ফরয/ওয়াজিব নামায পড়তে ভুলে গেল অথবা রমযানের রোযা রাখতে বা কোন বৎসর যাকাত দিতে ভুলে গেল। এসব অবস্থায় কাযা (قضاء= পরবর্তীতে পালন) ওয়াজিব হবে। রুখসাত হলো, তার কোন গুনাহ হবে না যদি قضاء করে দেয়।

২. বিস্মৃতির ফলে কোন নিষিদ্ধ কাজ করে ফেললে যেমন কারো সম্পদ নষ্ট করলে রুখসাত এইটুকু যে, সত্যিকার বিস্মৃতি প্রমাণিত হলে সে শাস্তি থেকে রেহাই পাবে।

৩. কোন রুখসাত পাবে না যদি ভুলে স্ত্রীকে তালাক দেয় কিংবা দাসকে মুক্ত করে দেয়। কারণ যেমন যবরদস্তীর বেলায় বলা হয়েছে, এই জাতের কতিপয় ব্যাপারে মুখের উচ্চারণ যথেষ্ট, ফাসখ-এরও অবকাশ নেই–চাই কি ভুলেই উচ্চারণ করুক বা জেনেশুনে করুক।

৪. যদি কেউ বলে, নামাযের মধ্যে বে-খেয়ালে আমি পানাহার করেছি বা কারো সাথে কথা বলেছি, তার এ অজুহাত শারী'আতে গ্রহণযোগ্য হবে না, তার নামায বাতিল (باطل) হয়ে যাবে অর্থাৎ নুতন সূত্রে আদায় করতে হবে। কারণ নামাযের আনুষ্ঠানিক পরিবেশ এ জাতের ভুলের অবকাশ রাখে না। তাছাড়া নামাযী তাকবীরে তাহরীমা উচ্চারণ করে নামায ব্যতীত অন্য সব কর্ম/ কথা সজ্ঞানে হারাম করে নেয়। এ অবস্থায় আহার বা বাক্যের প্রবৃত্তি জাগা অস্বাভাবিক। সুতরাং সে কোন রুখসাত পাবে না। তবে প্রকৃতিগতভাবে যে স্থলে ভুলে যাওয়া স্বাভাবিক সেক্ষেত্রে রুখসাত পাওয়া যাবে।

এ কারণে রোযা পালনের অবস্থায় ভুলে কিছু পানাহার করে ফেললে রোযা বাতিল হয়ে যাবে না। যদি ইচ্ছাকৃতভাবে দিনের অবশিষ্ট সময়ে পানাহার না করে বা রোযা ভঙ্গের অন্য কারণ না ঘটে। অনুরূপভাবে যবাহ করার সময়ে বিসমিল্লাহ পড়তে ভুলে গেলে যবাহ (ذبح) করার সময় বিস্‌মিল্লাহ্ পড়তে ভুলে গেলে যবাহ্ করা প্রাণী হারাম হয়ে যাবে না। প্রাণী বধের আতংক বা তৎপ্রতি প্রবৃত্তিগত অনীহাও এমন ভুলের কারণ হতে পারে। ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর ব্যক্তির পক্ষে পানাহারের প্রতি আকর্ষণও অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। সুতরাং রুখসাতের ব্যবস্থা রয়েছে।

জাহল (جَهْل= না জানা বা অজ্ঞতা)-এর বেলায় রুখসাত

ফকীহগণ কয়েক প্রকারের জাহল-এর (অজ্ঞতা) বর্ণনা করেছেন এবং প্রয়োজনীয় তাখ্‌ফীফ বা রুখসাতের ব্যবস্থা করেছেন ঃ

১. ইসলামের মৌলিক শিক্ষা (তাওহীদ, রিসালাত ইত্যাদি) সম্পর্কে অজ্ঞতা পার্থিব ব্যাপারে ও আদালতে বিবেচিত হবে বটে; কিন্তু আখেরাতের জবাবদিহি থেকে সে রেহাই পেতে পারবে না। ফকীহদের মতে অমুসলিমগণও শরী'আত-এ ইসলামের مُكَلَّف অর্থাৎ দায়িত্বপ্রাপ্ত। সুতরাং ইসলাম সম্বন্ধে অজ্ঞতার অজুহাত আল্লাহ্ গ্রহণ করবেন না। [উল্লেখ্য, ইসলাম আদম (আ) থেকে শুরু হয়েছে] অমুসলিমদের বেলায় ইসলাম সম্বন্ধে অজ্ঞতা ওজর রূপে গৃহীত হবে দেশের আদালতে। কারণ আল্লাহ্‌র শরীআতে দীনের ব্যাপারে জোর-জবরের অবকাশ নেই। এর বিপরীত হচ্ছে দেশের আইন– এই আইন সম্বন্ধে অজ্ঞতা অজুহাত রূপে গৃহীত হয় না।

২. যে সব বিষয়ে ইজতিহাদের অবকাশ আছে, তেমন কোন বিষয় সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্ত জানা না থাকলে এমন অজ্ঞতা ওজর হিসেবে গৃহীত হবে। যেমন, কেউ মনে করলো, রক্ত মোক্ষণের জন্য সিংগা লাগালে রোযা নষ্ট হয়ে যায়। এই ধারণার কারণে ইচ্ছাকৃতভাবে পনাহার করলে রোযার কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে না, কাযা করতে হবে। কেননা কোন কোন ইমামের সুস্পষ্ট মতে রোযা ভঙ্গের উল্লেখ রয়েছে। ইমাম আওযাঈ এই মতের সমর্থক। তবে অধিকাংশের মতে সিংগা লাগালে রোযা নষ্ট হয় না।

আসল ولى অর্থাৎ অভিভাবক (বাপ ও দাদা)-কে না জানিয়ে অন্য কোন আত্মীয় একটি মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিল। জানার পর বিয়ে ভেঙে দেবার ইখতিয়ার ওলীর থাকবে। পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে, বাপ ও দাদা (আসল অভিভাবক) কোন মেয়ের বিয়ে দিলে মেয়ে যখন জানতে পারবে তখন সে বিয়ে ফাসখের দাবি করতে পারবে এবং জাহল গ্রহণযোগ্য অজুহাত হবে।

উস্‌র (عسر) ও উমূমুল বালওয়ার (عموم البلوى)-র দরুন রুখসাত

উস্‌র অর্থ সংকট ও কঠিন পরিস্থিতি। দৈনন্দিন জীবনে সবাইকে সাধারণভাবে যে সংকট বা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় এবং যার হাত থেকে নিস্কৃতি লাভ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায় তাকেই বলা হয় উমূমুল বালওয়া (সংকটের ব্যাপকতা)। এ দু'টি অবস্থায় আল্লাহ্‌র শরী'আতের বিধান হালকা ও সহজ হয়ে যায়। কারণ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا ـ (البقرة : ٢٨٦)

"আল্লাহ্‌ কারো ওপর তার ক্ষমতার বাইরে দায়িত্ব চাপান না।"

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَايُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ـ (البقرة : ١٨٥)

"আল্লাহ্‌ তোমাদের ব্যাপারে যা সহজ তাই চান, যা কঠিন তা চান না।"

ফকীহগণ এ ব্যাপারে যথেষ্ট ঔদার্য প্রদর্শন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ কতগুলি ইজতিহাদী বিধানের উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ

পাক না-পাক-এর ক্ষেত্রে নাজাসাত (نجاسة= অপবিত্র বা নাপাক বস্তু) -কে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে তথা নাজাসাত-এ-গলীযা (نجاسة غليظة= গাঢ় নাপাক বস্তু) যথা প্রস্রাব, বজঃস্রাব ইত্যাদি, এবং নাজাসাত-এ-খাফীফা ঃ (نجاسة خفيفة= হালকা নাপাক বস্তু) যথা মল, বিষ্ঠা ইত্যাদি।

এ দুই প্রকারের না-পাক বস্তুর গুরুত্ব-লঘুত্বের বিবেচনায় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের রুখসাত দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ গায়ে বা কাপড়ে সে পরিমাণ লেঘে গেলে তাতে অপবিত্র হবে না।

মশা ও ডাঁশের রক্ত, রাস্তার কাদা, কবুতর, চড়ুই ইত্যাদির বিষ্ঠা কাপড়ে বা শরীরে লেগে গেলে তাতে নাপাক হবে না। অনুরূপভাবে পেশাবের ছিঁটা যা অত্যন্ত সূক্ষ্ম যেমন সুঁইয়ের তীক্ষ্ণাগ্রের মত নগণ্য। নাপাক জিনিসের ধোঁয়া এবং এমন সব প্রাণীর পেশাব-পায়খানায়ও রুখসাত রয়েছে, যেগুলির শরীরে প্রবহমান রক্ত নেই।

ইঁদুরের এক-আধটা লেদী (বিষ্ঠা) দুধে পড়ে গেলে এবং ভেঙে যাবার আগেই তা বের করে নিলে সে দুধ নাপাক বিবেচিত হবে না। যদি নাপাক থাকে এবং তার গা ছুঁয়ে টপকানো সামান্য পানি লেগে যায়, ঘর বানাবার জন্য তৈরী এমন ধরনের কাদা যাতে নাপাক মাটি বা পানি মেশানো হয় এবং তার সামান্য লেগে যায়, ছিটানো পানি লেগে গা ভিজে যায় ইত্যাদি এবং এই ধরনের সামান্য রকমের না-পাকীতে রুখসাত দেওয়া হয়, কারণ মানুষ সাধারণত এ ধরনের না-পাক বাঁচিয়ে চলতে পারে না, বাঁচিয়ে চলা সহজসাধ্য নয়।

গৃহে অবস্থানকালেও চামড়ার মোজার ওপর মাসহ করার অনুমতি রয়েছে। কোন পানি পাক হওয়া সম্বন্ধে প্রবলতর ধারণা (ظن غالب)-র ভিত্তিতে তা দিয়ে অযূ গোসল করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। যদি সে পানিতে নাপাক হওয়ার কোন নিদর্শন না থাকে। প্রবল ধূলিঝড় কিংবা বৃষ্টির কারণে জামা'আত বাদ দেয়ার রুখসাত রয়েছে। মেয়েদের রজঃস্রাবের দিনগুলোর নামাযের কাযা নেই। একদিন ও এক রাতের বেশি সময় বেহুঁশ থাকলে নামায মাফ হয়ে যায়।

অভিভাবক, মুতাওয়াল্লী ও অছি (وصى) নিজেদের পরিশ্রমের হিসাবে য়াতীমের সম্পদ থেকে পারিশ্রমিক নেওয়া বৈধ গণ্য করা হয়েছে।

খোশ পাঁচড়ার/বেদনা লাঘবের জন্য অথবা যুদ্ধের সময় প্রয়োজন হলে পুরুষদের জন্য রেশম ব্যবহার করা জায়েয। বেচা-কেনার ব্যাপারে বিবাদ এবং ক্ষতি এড়াবার জন্য নানা প্রকারের খিয়ার (خيار= বিক্রয় বা লেনদেন নাকচ করার অধিকার)-এর ব্যবস্থা, যা ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে–এ সবই রুখসাতের শামিল।

(عدالة= সত্যনিষ্ঠ, দীনদার ইত্যাদি নির্ভরযোগ্যতার গুণাবলী)-এর খুব উঁচু মান নির্ধারণ করা হয়নি। কারণ এমন উঁচু দরের সাক্ষী সব সময় পাওয়া যায় না, দু'জন পুরুষ সাক্ষীর অভাবে একজন পুরুষ এর সাথে দু'জন মহিলার উপস্থিতিতে বিয়ে অনুষ্ঠিত হতে পারে। নেহায়েত অপ্রীতিকর বিয়ের অভিশাপ থেকে মুক্তি দানের জন্য 'শারী'আত তালাক, তাফবীয-এ-তালাক (تفويض طلاق= স্ত্রীকে তালাক দেয়ার অধিকার অর্পণ) ইত্যাদির ব্যবস্থা করেছে। মৃত্যু রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি তার সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের অসিয়ত (وصية) করতে পারে, এর বেশির অসিয়ত করলে উত্তরাধিকারীদের ক্ষতি। তাই এর বেশির অনুমতি নেই। মোটকথা, ফিক্‌হের বিরাট পরিমণ্ডলের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনের সাথে সম্পর্কিত বহুবিধ মাসায়েলে কষ্ট দূর করার ও উমূমুল বাল্‌ওয়ার প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়েছে।

نقص-এর ক্ষেত্রে রুখসাত

নাক্‌স (نقص) অর্থ ন্যূনতা, কমতি, হীনতা, যাতে অক্ষমতা সৃষ্টি হয়, নিবারণ করা অসাধ্য বা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। এই নাক্‌স শব্দের অর্থের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত যথ ঃ অক্ষমতা, যেমন হায়য (حيض= মাসিক), নিফাস (نفاس) প্রশবের পর স্রাব), মস্তিষ্ক বিকৃতি, সংজ্ঞা লোপ, অপ্রাপ্ত বয়স্কতা (না-বালিগ অবস্থা), সফর কালের নানা অসুবিধা, শারীরিক অসুস্থতা, ভ্রম, নিদ্রাবস্থা, উপায়হীনতা ইত্যাদি। ইত্যকার পরিস্থিতিতে শারীআত যেসব রুখসাতের ব্যবস্থা করেছে তা বিভিন্ন উপলক্ষে পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে বর্ণিত এবং পুনরুক্ত হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ফকীহগণের মতবিরোধের কারণ

বিরোধের দু'টি মৌলিক কারণ

আমরা যাদেরকে Jurisconsult বলি, ফকীহগণও ছিলেন তদ্রূপ ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা প্রদানকারী এবং বিধান উদ্ভাবনকারী। তাঁদের মধ্যে মতবিরোধের বহু কারণ রয়েছে এবং মানুষের ভুলভ্রান্তি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ফকীহদের মতবিরোধ খুঁটিনাটি (جزئيات) ব্যাপারে, মূলনীতির (كليات) ব্যাপারে নয়; সুতরাং তাতে দীনের কোন ক্ষতি অর্থাৎ মুসলিমের ঈমানের অঙ্গহানি হয় না। তাই ফকীহগণ পরস্পরের মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং তাঁদের অনুসারীগণ অর্থাৎ কোন মাযহাবের লোক অপর মাযহাবের লোককে হেয় জ্ঞান বা অমুসলিম মনে করে না। অবশ্য অত্যন্ত গোঁড়া দলীয় মতানুসারীদের কথা আলাদা; তেমন কিছু লোক প্রত্যেক দলেই থাকে, চাই কি দলটি রাজনৈতিক দল হোক বা অর্থনৈতিক বা ধর্মীয়।

ফকীহদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বিখ্যাত মুহাদ্দিস, এমন কি মুফাসসিরও। মুহাদ্দিসদের মধ্যে যাঁরা تفقه في الدين অর্থাৎ দীনের ব্যাপারে সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন, তাঁরাই মুসলিম জগতে ফকীহরূপে ব্যাপক খ্যতি রাভ করেছেন এবং এঁদের নামানুসারে কয়েকটি মাযহারেব উৎপত্তি হয়েছ। এই মাযহাবগুলোর মধ্যে চারটির অনুসারীর সংখ্যা খুব বেশি, যারা ইসলামী দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ছাড়িয়ে আছে। অপর মাযহাবগুলো প্রায় বিলুপ্ত, কারণ প্রতিষ্ঠাতা ফকীহদের মতামত ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করেনি। ইসলামী দুনিয়ার বিভিন্ন কেন্দ্র যেমন মদীনা, দামিশক, কূফা, বসরা, বাগদাদ, কায়রো, মরক্কো, আন্দালুস ইত্যাদিতে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন বিভিন্ন ফকীহ। খ্যাতির ভিত্তিতে ইসলামী দুনিয়ার জ্ঞান পিয়াসীরা এসে জড় হতো তাদের আস্তানায় বা শিক্ষাঙ্গণে –তাঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে। প্রসিদ্ধ ফকীহদের নামযাদা শাগরিদদের মধ্যে অনেকেই ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। শুধু ফিকহ নয়, অনেক ইসলামী জ্ঞানবিজ্ঞান সংক্রান্ত বিভিন্ন কালজয়ী কিতাব রচনা করেছেন এই ফকীহ এবং তাঁদের শাগরিদরা।

অন্যপক্ষে মুহাদ্দিসগণের মধ্যে সবই কিন্তু ফকীহ ছিলেন না। অন্যতম প্রধান সাহাবী হযরত আবূ হুরায়রা (রা) রাসূল (সা)-এর অনেক হাদীস শুনেছিলেন এবং রিওয়ায়েত করেছেন, কিন্তু কারো কারো মতে তিনি ফকীহ অর্থাৎ দীনের ব্যাপারে সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন না। রেওয়ায়েতের সংখ্যা হযরত আবূ হুরায়রা (রা) অপেক্ষা কম হলেও হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস প্রমুখ সাহাবা ফিকহের ক্ষেত্রে অগ্রহণ্য ছিলেন।

সাহাবী তাবিঈ কিংবা তাব্‌ই তাবিঈ যাই হোন না কেন, ফকীহ বলতে আমরা বুঝি এমন ব্যক্তি, যিনি কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইজতিহাদ করে উদ্ভূত প্রশ্নসমূহের জবাব দিতে সক্ষম–বিধান উদ্ভাবন করতে পারেন। সুতরাং মুহাদ্দিস আর ফকীহ ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর লোক নন। জিহাদ, প্রচার ইত্যাদি দায়িত্ব পালনের জন্যে এঁরা মুসলিম সাম্রাজ্যের দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। যদিও প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁরা প্রায় সবাই মদীনাতে অবস্থান করতেন। তৎকালে যোগাযোগ ব্যবস্থাও বর্তমানের মত ছিল না। মুদ্রণ যন্ত্রের ব্যাপক প্রচলনের পূর্ব পর্যন্ত তাঁরা হস্তলিখিত কুরআনের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। হাদীস এবং ফিকহের সংকলন তৈরী হল অনেক কাল পরে–যদিও বিভিন্ন কেন্দ্রে হাদীস-ফিকহের দার্‌স (درس = শিক্ষাদান) চলত, চর্চা হত সংকলন প্রকাশের বহু পূর্ব থেকে। মদীনাতে যেমন, তেমনি অন্যান্য কেন্দ্রেও নুতন কোন সমস্যা দেখা দিলে তার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য হাদীসের খোঁজ পড়ত, অনুরূপ ব্যাপারে রাসূল (সা) বা কোন সাহাবীর ফায়সালার কথা কারো জানা আছে কিনা তার খোঁজ হত, নাগালের মধ্যে সাহাবী, তাবিঈ বা তাব্‌ই তাবিঈ যাঁরা আছেন তাঁদের ডাক পড়তো। কুরআনে বা নির্ভরযোগ্য সহীহ্ হাদীসে বিধান না পাওয়া গেলে ইজতিহাদের ভিত্তিতে এককভাবে কোন ফকীহ বা সমষ্টিগতভাবে কয়েকজন মুজতাহিদ বিধান দিতেন। কিন্তু তাঁদের এ ইজতিহাদের ছিল সীমাবদ্ধতা, কারণ হস্তলিখিত কিতাবের সরবরাহ ছিল স্বভাবত সীমাবদ্ধ, সংগ্রহ ছিল ব্যক্তিগত পর্যায়ে, গ্রন্থাগারও ছিল প্রায় ব্যক্তিগত, বিদ্যোৎসাহী আমীর-ওমরার গৃহে। আজকালের মত সার্বজনীন গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব তখন ছিল না, মুদ্রণযন্ত্রের কল্যাণে গ্রন্থের প্রাচুর্যও ঘটেনি। শুধু তাই নয়, মুসলিম দেশসমূহে বহুদিন যাবৎ কুরআন মজীদ এবং ধর্মীয় পুস্তকবাদির মুদ্রণ সরকারিভাবে নিষিদ্ধ ছিল, কারণ উলামারা মুদ্রণের অনুমতি দিতেন না–দীনী কিতাবে সম্ভাব্য ভুল-ভ্রান্তির আশংকায়। একটি কিতাব নকল করে আনবার জন্য তখনকার দিনে দূর=দূরান্তরে সফর করতে বা কাতিব (كاتب = লিপিকার) পাঠাতে হত। কাতিবদের নকল নবীসী ব্যবসা ছিল জমজমাট। নকল পুস্তকের বেশ লাভজনক

ব্যবসাও গড়ে উঠেছিল। যথেষ্ট বিত্তশালী লোকের পক্ষেই তখন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কিতাবের সংগ্রহ গড়ে তোলা সম্ভব ছিল।

ফকীহদের মধ্যে ইখতিলাফ বা মতবিরোধের নানা কারণের মধ্যে এই সীমাবদ্ধতা ছিল অন্যতম। এবারে দেখা যাক মতবিরোধের প্রকারভেদ ঃ

কুরআন মজীদের কোন শব্দের ব্যাখ্যায় মতভেদ হতে পারে। উদাহরণ ঃ তালাকের ইদ্দত তিন হায়্য (حيض = স্রাব নিঃসরণ অবস্থা) হবে, না তিন তুহর (طهر= স্রাব নিঃসরণ বন্ধের পর পাক অবস্থা) হবে। ইমাম আবূ হানীফার মতে ইদ্দত তিন তুহর এবং ইমাম শাফিঈ-র মতে হবে তিনি হায়য পরিমাণ সময়। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ অর্থাৎ তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীগণ অবশ্যই তিন قُرُوْء (একবচন قُرْء আভিধানিক অর্থ সময়) পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। মতভেদ এই قرء শব্দের ব্যাখ্যায়।

কুরআন মজীদে কোন আয়াতের যথাযথ পঠন সম্বন্ধে ইখতিলাফ হতে পারে। উদাহরণ অযূ (وضوء)-তে পদদ্বয় ধৌত করা ফরয, না মাস্হ্ করলে চলবে ? কুরআন মজীদে রয়েছে ঃ وَامْسَحُوْا رُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ শিয়া সম্প্রদায় পড়ে وارجلكم, কারণ তাদের মতে পাঠ হবে ঃ وَامْسَحُوْا بِاَرْجُلِكُمْ প্রতিপক্ষ আহলু সুন্নাহ (সুন্নী) সম্প্রদায়ের মতে পাঠ হতে হবে فاغسلوا ..... وارجلكم

হাদীসের ব্যাখ্যায় মতভেদ হয়েছে বহুক্ষেত্রে। উদাহরণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাজ্জের অনুষ্ঠানাদি পালনের সম্পর্কে যে রেওয়ায়েত হাদীসে পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে কোন কোন ফকীহ মত প্রকাশ করেছেন যে, হযরত (সা)-এর হজ্জ ছিল হজ্জে কিরান (قران অর্থাৎ একই ইহরাম [احرام]-এ হাজ্জ এবং উমরাহ পালন; আবার অন্য ফকীহরা বলেছেন, তিনি হাজ্জে তামাত্তু (تمتع) পৃথক পৃথক ইহরামে হাজ্জে ইফরাদ (افراد = এক ইহ্রামে শুধু হাজ্জ পালন) করেছেন। হযরত (সা)-এর বর্ণিত এই فعل (কর্ম)টি দর্শকদের দৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। তাই ফকীহদের মধ্যে মতভেদ।

হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কোন কর্মের বর্ণনা (فعلى حديث)-এর ভিত্তিতে কেউ মনে করলেন কর্মটি ওয়াজিব, অন্যেরা ধারণা করলেন কর্মটি মুসতাহাব (مستحب) অর্থাৎ করলে সাওয়াব আছে, না করলে গুনাহ নেই–তবে চিরতরে বাদ দেয়া চলবে না। চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সহায়ক কোন দলীল আশু পাওয়া গেল না।

হাদীসে বর্ণনা পাওয়া যায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) হুনায়ন-এর যুদ্ধে সম্পদ (পশুপাল এবং রোপ্য) থেকে কিছু অতিরিক্ত বখরা দিয়েছিলেন আবূ সুফয়ান প্রমুখ নও-মুসলিমগণকে–যারা মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন–উদ্দেশ্য ছিল তাদের অন্তর জয় করে ঈমানকে দৃঢ় করা। কুরআন মজীদে সাদাকা (صدقة)-এর হকদারদের লিষ্টিতে এদের উল্লেখ রয়েছে والمؤلفة قلوبهم আখ্যায়। প্রশ্ন জাগলো ঃ নও-মুসলিমের মন জয়ের উদ্দেশ্যে এখনও কি তাদেরকে জাকাত (زكوة) সাদাকা (কোন দরিদ্র নও-মুসলিমের কথা আলাদা)-এর অর্থ দেয়া যাবে ? না কি সেই কালে এটি জায়েয ছিল, এখন তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে ? ফকীহদের মধ্যে এ বিষয়ে ইখতিলাফ রয়েছে।

হাদীস সংগ্রহ এবং লিপিবদ্ধ করার আদেশ দিয়েছেলেন হযরত উমর ইব্ন আবদুল আযীয (যিনি ফুলাফায়ে রাশিদীনের মধ্যে পঞ্চম রূপে সমাদৃত) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইনতিকাল এর প্রায় নব্বই বৎসর পরে, হাদীসের সংকলন তৈরী হয়েছিল আরও পরে। সুতরাং হাদীস সবখানে পৌছতে সময় লেগেছে অনেক। মুসলিম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে যে ফকীহগণ ছিলেন তাঁদের কাছে ছিল তাঁদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ–মুখস্থ হউক বা লিপিবদ্ধ। সুতরাং তাঁরা অনেক ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করেছেন। ধরুন, কূফার কোন ফকীহ একটি হাদীসের ভিত্তিতে যে বিধান দিয়েছেন, বসরায় কোন ফকীহ তার বিপরীত সিদ্ধান্ত দিয়েছেন ঐ হাদীসটি তাঁর অজানা ছিল বলে। [অবশ্য হাদীসটি জানার পর তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেছেন।]

কোন ফকীহ একটি হাদীসের সনদ এবং মতন-এ ত্রুটি দেখে তাকে পরিত্যাগ করেছেন। অপর ফকীহ হাদীসটিকে নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন এই কারণে যে, হাদীসটি অন্যান্য সূত্রে এবং ত্রুটিমুক্ত মতনে বর্ণিত। তিনি হাদীসটির ত্রুটি কেটে গেছে বলে তার ভিত্তিতে ফাতওয়া দিয়েছেন।

দুইটি হাদীসে বিরোধ দেখা গেল। যেমন ধরুন একটি হাদীসে নামাযের প্রত্যেক তাকবীর এ রাফ'ই য়াদায়ন (رفع يدين = দুই হাত ওঠানো)-এর কথা রয়েছে। অন্য হাদীসে কেবল পয়লা তাকবীরে হাত ওঠানোর কথা দেখা যায়। ফকীহদের কয়েকজন প্রথম হাদীসটি অধিকতর সবল এবং অন্যেরা দ্বিতীয়টিকে অধিকতর সবল মনে করেছেন এবং গ্রহণ করেছে রেওয়াতের দিক থেকে। এমনি 'আমীন' বলার ব্যাপার, ইমামের সূরা ফাতিহা পাঠান্তে আমীন সরবে না নীরবে বলতে হবে।

ঘটনাচক্রে কোন ফকীহ একটি প্রসিদ্ধ ব্যাপারে হযরত (সা)-এর সুপরিচিত কতেক হাদীস সম্বন্ধে অনবহিত ছিলেন। যেমন সুবিখ্যাত সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইব্ন

আব্বাস (রা) মুত্‌আ (مُتعة = মেয়াদী বিয়ে)-এর নিষেধাজ্ঞামূলক হাদীস সম্বন্ধে খবর রাখতেন না। বর্ণিত আছে যে, তিনি متعة জায়েয বলে উক্তি করেছেন। অবশ্য তাঁর একার উক্তিতে কোন ক্ষতি হয়নি– বহু সাহাবী মুতআর নিষেধাজ্ঞা সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। মুত্‌আ হারাম ঘোষিত হয়েছিল খায়বার যুদ্ধের দিনগুলির মধ্যে কোন একদিন। এই মর্মে যেমন হাদীস বর্ণিত আছে, তেমনি সহীহ হাদীসে মক্কা বিজয়ের দিন এ ঘোষণা জারী হয়েছিল বলে বর্ণনা পাওয়া যায়। কোন কোন সাহাবী খায়বরের ঘোষণা শোনেননি। অনেকেই শুনতে বা জানতে পেরেছিলেন। সুতরাং ঘোষণার তারিখ নিয়ে ইখতিলাফ রয়েছে। মুহাদ্দিসগণ দুই বর্ণনার মধ্যে মিলন ঘটিয়েছেন এবং বিরোধ মিটিয়েছেন। তাঁরা বলেন, আসলে খায়বারেই ঘোষণাটি দেয়া হয়েছিল, তবে গুরুত্ব বোধে তা পুনর্ঘোষিত হয়েছিল মক্কা বিজয়ের উপলক্ষে যাতে সবাই জানতে পারে। হাদীসে এমন ইখতিলাফ এবং তাত্‌বীক (تطبيق = মিলন ঘটানো, খাপ খাওয়ানো)-এর বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

যদি দুই বিপরীত হাদীসের তাত্‌বীক সম্ভব না হয় তবে তাঁরা তা'বীল (تأويل = ব্যাখ্যা করা, যাতে বৈপরীত্ব বোধগম্য হয়)-এর চেষ্টা করেন; যদি তারও অবকাশ না থাকে তবে তারজীহ (ترجيح = অধিকতর গ্রহণযোগ্যকে প্রাধান্য দান করা, Prefenence দেয়া) দিয়ে থাকেন। এসব ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ হতে পারে।

'ইল্লাত নির্ধারণ করতে গিয়ে ফকীহ ভ্রমে পতিত হতে পারেন। হযরত (সা) ছয়টি জিনিসের নাম করে বললেন, এদের বিনিময় হতে হবে হাতে হাতে (নগদ) এবং সমপরিমাণে, যেমন এক তোলা সোনার বিনিময়ে এক তোলা সোনা, এক কেজি গমের বিনিময়ে এক কেজি গম, অতিরিক্ত হবে বিরা (ربوا) যা হচ্ছে হারাম। যে ছয়টি জিনিসের নামকরা হল তার মধ্যে চারটি খাদ্য পণ্য, অপর দুটি অর্থাৎ সোনা এবং রূপা মূল্য (ثمن) নির্ধারণে ব্যবহৃত হয়। এক ইমাম সাহেব ইল্লাত বললেন ঃ খাদ্যপণ্য এবং মূল্য প্রদানের মাধ্যমে। তাঁর মতে এ দুই জাতের জিনিসের বিনিময় হতে হবে নগদ এবং সমপরিমাণে। নতুবা অতিরিক্ত (فضل) হবে রিবা। তাঁর মতে এক মণ লোহার বিনিময়ে ১ $\frac{১}{২}$ মণ লোহা নেয়া জায়েয হবে, কারণ লোহা খাদ্য পণ্য নয়, মূল্য পণ্যও নয়। অপর ইমাম বললেন, 'ইল্লাত হচ্ছে ঃ اتحاد الجنس والقدر। অর্থাৎ বিনিময় পণ্য এক জাতের হওয়া এক মাপের হওয়া– না হলে রিবা হবে। [একই জাতের দুটো জিনিসের মধ্যে গুণগত পার্থক্য থাকলে প্রত্যেকটির মূল্য সাব্যস্থ করে বিক্রি করলে রিবার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে– এটাই হযরত (সা)-এর নির্দেশ।]

এমনি কাল-পাত্র বিবেচনার বেলায় ভুলের দরুন ফকীহদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হতে পারে। ইস্‌তিহ্‌সান, ইস্‌তিসলাহ্‌ বিবেচনার ক্ষেত্রে মতপার্থক্য স্বাভাবিক। সব দেশের উচ্চ আদালতের বিজ্ঞ জাষ্টিসগণও সময় সময় একই আইনের ব্যাখ্যায় বা প্রয়োগে মতানৈক্যের ফাঁদে পড়তে দেখা যায়। ইজতিহাদে ভুল-ত্রুটি ক্ষমাযোগ্য। রাসূল (সা) বলেছেন, ইজতিহাদ প্রসূত সিদ্ধান্ত যদি সঠিক হয়, মুজতাহিদ দ্বিগুণ পুরস্কার পাবেন, আর যদি ভুল হয় তবে গবেষণার কষ্ট স্বীকার করা এবং নিষ্ঠার বদলে মুজতাহিদের পুরস্কার হবে একটি।

মোটমুটিভাবে উপরোক্ত কারণ ও অবস্থায় ফকীহ মুজতাহিদগণের মধ্যে جزئيات-এর ব্যাপারে মতভেদ হয়েছিল। তাঁদের ইজতিহাদের কল্যাণে ইসলামী শরী'আত বিবর্তনমূলকভাবে যুগোপযোগী রয়েছে এবং থাকবে। যাতায়াতে বিস্তর সুবিধা সৃষ্টির দরুন আজকের দিনে মুসলিম বিশ্বের গণ্যমান্য মুজতাহিদগণের বৈঠকে উদ্ভূত কোন প্রশ্নের সমাধানের ব্যাপারে اجماع বা ঐকমত্যও সংঘটিত হতে পারে।

সমাপ্ত

ইফাবা–২০০৩-২০০৪ /অঃ সঃ /৪০১২(উ) –৩২৫০

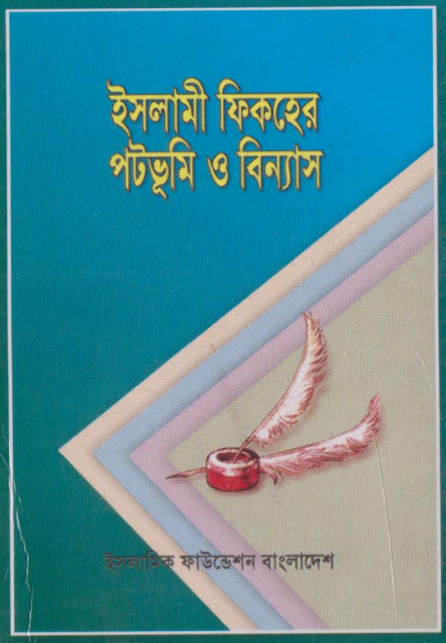

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ